আলোছায়াময়

প্রফুল্ল রায়

করুণা প্রকাশনী। কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ   মাঘ—১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
ধীরেন শাসমল

মুদ্রাকর
প্রিন্টেক্স
৯এ, রামধন মিত্র লেন
কলিকাতা-৪

শ্রীশান্তি চট্টোপাধ্যায়
প্রিয়বরেষু

লেখকের অন্যান্য বই :

পূর্বপার্বতী
দায়বন্ধ
ধর্মান্তর
রামচরিত্র
আমাকে দেখুন (১।২।৩)
নিজের সঙ্গে দেখা
আমার নাম বকুল
শঙ্খিনী
রৌদ্রঝলক
সুখের পাখি অনেক দূরে
শীর্ষবিন্দু
একাকী অরণ্যে
নয়না
আলোয় ফেরা
মহাযুদ্ধের ঘোড়া (১।২)
আকাশের নীচে মানুষ
স্বর্গের ছবি
সিন্ধুপারের পাখি
অন্ধকারে ফুলের গন্ধ
মানুষের জন্য
চতুর্দিক
বাঘবন্দী
সত্যমিথ্যা
মাটি আর নেই
মোহানার দিকে
নোনা জল মিঠে মাটি
প্রফুল্ল রায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প
তিন মূর্তির কীর্তি
সেনাপতি নিরুদ্দেশ
পাগল মামার চার ছেলে
দায়-দায়িত্ব
[illegible]য়ের প্রাণ

প্রথম তরঙ্গ

আমি মহাপুরুষ নই। আমার জীবন-চরিত কেউ লিখে রাখেনি, কোনোদিন যে লিখবে আদৌ তেমন সম্ভাবনা নেই।

যে স্মরণীয় পুরুষেরা তাঁদের কীর্তি দিয়ে মহিমা দিয়ে দেশকে গৌরবের সিংহাসনে বসিয়েছেন আমি তাঁদের কেউ নই। দেশ বা জাতির কোনো কাজেই আমি লাগিনি। দেশ তো দূরের কথা, আমাদের ছোট্ট সংসারটা পর্যন্ত আমার কাছে কিছুই পায়নি। একেবারে পায়নি বললে সঠিক বলা হয় না, কিছু পেয়েছে বৈকি। দাদু-দিদিমা-মা-ভাই-বোন, সবার মুখে তাল তাল পাঁক আমি মাখিয়ে দিয়েছি। সে পাঁকের তিলক এবং তার দুর্গন্ধ কোনোদিন মুছবার নয়। ঘৃণায়, লজ্জায় এবং ধিক্কারে তাঁরা কোথায় যে মুখ লুকাবেন ভেবে পান নি। শুধু কি দাদু-দিদিমা-মাকেই, আমার চারপাশ ঘিরে যারা ছিল তাদের সবাইকেই আমি পথের ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছি। অথচ আমার কাছে তাঁদের কি প্রত্যাশাই না ছিল!

দাদু-দিদিমা-ভাই-বোন-মা, সবার কথাই বললাম কিন্তু বাবার কথাটা বাদ রেখেছি। কেন, সে জবাব দিচ্ছি পরে।

আমার মত মানুষকে কেউ মনে করে রাখে না। ঘৃণা ছাড়া আমাকে কিছু করা উচিতও নয়। আমার জীবন কাহিনী কে লিখবে?

বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের আমি একজন। সাধারণ বিশেষণটা অবশ্য আমার সম্বন্ধে খাটে না। সাধারণদের সঙ্গে এক সারিতে বসতে গেলে তাদের মানহানিই ঘটবে।

আমার কাহিনী যে লেখা অনুচিত, আমার চাইতে কে আর তা ভাল জানে। তবু জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় একটু পেছন ফিরি। পঞ্চাশ বছর ধরে ফুসফুসে পৃথিবীর বাতাস টেনে আমি বেঁচে আছি। এতগুলো দিন কী করলাম, কী পেলাম তার একটা হিসেব নিতে ইচ্ছে হয়, অনেক উত্তর-না-পাওয়া প্রশ্নের জবাবদিহি করতেও। কেউ সহানুভূতি জানাক অথবা সমবেদনা প্রকাশ করুক সেজন্য আমি বিন্দুমাত্র লালায়িত নই। নিজের জীবনের কথা ভাবতে ভাবতে

কখনও রুষ্ট, কখনও ক্ষিপ্ত, কখনও বিমর্ষ আবার কখনও বা উন্মাদ হয়ে যেতে আমার ভাল লাগে। সেই জন্যেই আমার এই স্মৃতিচারণ।

এমন কেউ সূত্রধার নেই যে আমার জীবনের সব কথার সব ঘটনার খেই ধরিয়ে দিতে পারে। সুতরাং আমার কথা আমাকেই বলতে হবে।

নিজের কথা নিজে বলার মত বিড়ম্বনা নেই। কিন্তু আমি নিরুপায়।

প্রথমে পরিচয় দেওয়া যাক। আমার নাম চিরন্তন গঙ্গোপাধ্যায়। বাবা : মাধবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। মা : সুনয়নী দেবী। আমরা চার ভাই তিন বোন।

কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে আমার জন্ম। এ কালে 'ব্রাহ্মণ' শব্দটা জলুস হারিয়ে পুরনো ঘষা পয়সার মত ম্যাড়মেড়ে হয়ে গেছে। কিন্তু আমার কাহিনীটি চার যুগ আগের। লর্ড চেমসফোর্ড তখন এ দেশের ভাইসরয়। উনিশ শ উনিশ সালের গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট সবেমাত্র বিধিবদ্ধ হয়েছে। গান্ধীজী তখনও মহাত্মা হন নি। জালিয়ানওলার নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে জনচিত্ত তখন উদ্বেল, রবীন্দ্রনাথ ঘৃণা-ভরে নাইট খেতাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বলা যায়, এই শতকের তখন নাবালক দশা। নামেই বিংশ শতাব্দী, নইলে রুচিতে-আচারে-ব্যবহারে এবং সমাজ-ব্যবস্থায় বিগত শতকের প্রভাবটাই গভীরভাবে ছাপ ফেলে রেখেছে।

সে যুগে, এই শতাব্দীর সেই শৈশবে, দেবদ্বিজে মানুষের ভক্তি সবেমাত্র শিথিল হতে শুরু করেছে। তথাপি চতুর্বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হবার সুযোগে ব্রাহ্মণেরা সমাজের কাছ থেকে তাদের পাওনা ষোল আনার জায়গায় বাইশ আনা আদায় করে নিচ্ছে।

আমাদের আদি নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। গ্রামের নাম বজ্রযোগিনী। পিতৃভূমিতে আমরা কোনোদিন থাকিনি, থেকেছি সিরাজদীঘায়। সিরাজদীঘা আমার মামার বাড়ি।

পুরুষানুক্রমে মামাদের গুরুবংশ। গুরুগিরি ছাড়া সংস্কৃতের অধ্যাপনাও তাঁরা করতেন। এ-ই ছিল তাঁদের জীবিকা।

নামেই অবশ্য মামার বাড়ি। আমার মামা নেই। মা-ই দাদামশায়ের একমাত্র সন্তান। মামার বাড়িতে দাদামশায়, দিদিমা, মা, আমি আর দুটি ছোট ভাইবোন— এই নিয়ে ছিল আমাদের সংসার। আমরা ছিলাম দাদামশায়ের আশ্রিত।

সবার কথাই তো স্মরণ করছি কিন্তু হৃৎপিণ্ডে আর রক্তধারায় প্রতি মুহূর্তে যাঁর দেওয়া প্রাণ বহন করে চলেছি সেই বাবার কথা তো একবারও ভাবছি না। বাবার প্রসঙ্গ এখন নয়, পরে। তবে এটুকু বলা ভাল, যে মানুষটির সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক নিকটতম তাঁকে আমি বিশেষ দেখিনি। যাঁকে সব চাইতে বেশি করে চেনা

উচিত ছিল তিনিই আমাদের কাছে থেকে গেছেন প্রায় অপরিচিত। বাবার মত রহস্যময় মানুষ আমার অর্ধশতাব্দীর জীবনে আর কখনও দেখিনি।

দীর্ঘকাল ঢাকা জেলায় আমাদের থাকা হয়নি। আমার ছেলেবেলাতেই সিরাজ-দীঘা ছেড়ে কলকাতার কাছাকাছি বিবিবাজারে চলে এসেছিলাম। না এসে উপায় ছিল না।

গুরুগিরি এবং সংস্কৃতের অধ্যাপনায় সম্মান তখনও বজায় আছে ঠিকই কিন্তু ঐ মায়াবরণটুকু পর্যন্ত। নইলে নীলামে বিকিয়ে-যাওয়া সম্পত্তির দলিলের মত জীবিকাটা ক্রমশ অন্তঃসারহীন হয়ে যেতে শুরু করেছে। এ-সব থেকে দাদামশায়ের যা আয় হ'ত তাতে সংসার চলতে চাইত না।

গুরুগিরি থেকে উপার্জন তো কমে গিয়েছিলই, পণ্ডিতিও আর চলছিল না। এই শতকের গোড়া থেকেই ইংরেজি ভাষা প্রায় ঘোড়া ছুটিয়ে দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিল। দিকে দিকে তার রাজসূয়ের আয়োজন চলছিল আর তার তোপের মুখে নিরীহ সংস্কৃত আর স্মার্ত-নৈয়ায়িকের দল প্রায় উড়েই গেছে। ফিরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণের জন্যও 'ঘে 'ক্রুজেড' চালাবে সে শক্তি, সাহস বা প্রকৃতি—কোনোটাই তাদের ছিল না।

অতএব এতকাল যে নিয়মে দাদামশায়ের বংশের ধারাটা বয়ে আসছিল একালের সদরে এসে সেটা একেবারে মুখ থুবড়ে পড়েছে। তবু দেশের মাটি আঁকড়েই থাকতে চেয়েছিলেন দাদামশায়। সে জন্য না করেছেন কি? গুরুগিরি, পণ্ডিতির সঙ্গে ঘটকালি, জ্যোতিষ, এমন কি কবিরাজিরও মিলন ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু এতগুলো বৃত্তিতেও সংসারকে পুরোপুরি সচল রাখতে পারেন নি। অতএব একদিন আমাদের হাত ধরে নানা ঘাটে ভাসতে ভাসতে শেষ পর্যন্ত বিবিবাজারে এসে উঠেছিলেন।

ইংরেজ আমলের আরম্ভ থেকেই এ দেশের নগর-গমন শুরু হয়েছিল। বিশ শতকের উষাকাল থেকে সেই যাওয়াটা জলোচ্ছ্বাসের স্রোতের মত হয়ে উঠল। সে ঢল থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার সামর্থ্য দাদামশায়ের ছিল না।

ইংরেজ রাজত্বের যতগুলি অবদান আছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠটি হচ্ছে সমাজে নতুন এক বর্ণের সৃষ্টি। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ইত্যাদি তো ছিলই। পঞ্চমটি হল কেরানী। আমার দাদামশায়, গুরুবংশের কুলপ্রদীপ, চটকলের কেরানী হয়ে নব্য বর্ণে একাকার হয়ে গেলেন।

আপাতত আমাদের সংসারের সংক্ষিপ্ত একটু ভূমিকা করে রাখলাম। পরে বিস্তৃতভাবে তার পরিচয় দিতে হবে।

দুই

এবার আমার কথা।

আমার কথা কিভাবে কোথা থেকে শুরু করব ? নয়নতারার প্রসঙ্গ দিয়েই কি ? না নলিনীর ? কিংবা জেলখানায় যে আটটা বছর কাটিয়েছি সেখান থেকেই আরম্ভ করা উচিত ? বুঝতে পারছি না।

নিজের কথা ভাবতে বসে নয়নতারা বা নলিনীর কথা আসে কেন ? না এসে উপায়ই বা কি ! বিছিন্নভাবে একটি মানুষের অস্তিত্ব আর কতটুকু ? আপন-সৃষ্ট একটি জগতের মাঝখানে চারিদিকে দেওয়াল তুলে কেউ তো আর একা একা বাস করতে পারে না। কাজেই আমার কথা নলিনীদেরও কথা, আমার চারপাশে যারা ভিড় করে এসেছে তাদেব কথাও, যেমন তাদের কথা আমার।

না, নলিনী নয়, নয়নতারাও না—একেবারে শুরু থেকেই আরম্ভ করা যাক। সেই শুরুটুকুর ভেতর যা আছে তা বিবিবাজার, দাদামশায় দিদিমা-মা-ভাইবোনেরা, প্রক্ষিপ্তভাবে কিছুটা আমার বাবা এবং আমাব শৈশব।

বিবিবাজার আদ্যিকালের কোন নগর নয়, সে নতুন শহর।

উনিশ শতকের শেষ প্রহরে শিল্প বিপ্লবের যে হাওয়া এদেশের গায়ে লেগেছিল তার ফলেই বিবিবাজারের জন্ম। গোটা তিনেক চটকল, একটা কাগজকল, স্টীলের কারখানা, রঙের কারখানা, বিজলী পাখার কারখানা—এই সব ঘিরে শহরটার বিস্তার। কলকারখানায় যারা কাজ করে তাদের কোথাও তো থাকতে হবে। সেই প্রয়োজনের তাগিদেই বিবিবাজারেব সৃষ্টি।

এ শহরের অতীত নেই, ঐতিহ্য নেই, চমকপ্রদ কোনো ইতিহাসও নয়। তবে অত্যন্ত প্রবল আর বেগবান একটা বর্তমান আছে। কারখানার বাঁশি, ওভারটাইম, সপ্তাহান্তে কাঁচা পয়সা, ব্যস্ততা—ইত্যাদির চারিদিকে এই শহরটা অবিরাম প্রদক্ষিণ করে চলেছে। কোনোদিকে তার তাকাবার অবকাশ নেই ; ঊর্ধ্বশ্বাসে অর্থ নামে এক সোনার হরিণের পেছনে সে শুধু ছুটছে, ছুটছে আর ছুটছে। আর কারখানা-শহরের যে রীতি তাতে বর্তমান যে ছাঁচ তৈরি করে দেয় ভবিষ্যৎ তাতেই ঢালাই হয়ে যায়। সেদিক থেকে বিবিবাজার কোনো ব্যতিক্রম নয়। অনায়াসেই বলা যায়, উত্তেজক একটি বর্তমান ছাড়া এই অর্বাচীন শহরে আর কিছুই নেই।

বিবিবাজারে মিনার নেই, গম্বুজ নেই, কোন কীর্তিস্তম্ভও কেউ তুলে রেখে

যায়নি। শহরটার পশ্চিম প্রান্ত ঘেঁষে আছে দগদগে ক্ষতের মত বস্তির পর বস্তি, অর্ধপত্তগঠন কোন আদিম মানুষের ওগুলো যেন উপনিবেশ। ঘায়ের ওপর মাছির মত বস্তিগুলোর গায়ে দিশি মদের দোকান, কিলবিলে পোকার মত বেশ্যাদের চলাফেরা। ধোঁয়ায়-ধুলোয়-খিস্তিতে-চিৎকারে-আবর্জনায় আর দুর্গন্ধে বাতাস সেখানে ভারী, আকাশ সীসের মত বিষাক্ত। অবশ্য বিবিবাজারের আরেকটা দিক আছে। দক্ষিণ প্রান্ত ঘেঁষে যে পাড়াটা সেটা অনেকখানি ভব্য। বাড়িগুলো সেখানে পাকা। রাস্তাগুলো রীতিমত দরাজ, মিউনিসিপ্যালিটি সেগুলোর ওপর কিছু কিছু খোয়া ছড়িয়ে আর টিমটিমে তেলের বাতি জ্বালিয়ে কর্তব্য এবং দাক্ষিণ্য—দুই-ই দেখিয়েছে।

দক্ষিণ পাড়ার একটি ভাড়াটে বাড়িতে আমরা থাকতাম। আগেই বলেছি আমাদের সংসারে দাদামশায়, দিদিমা, মা আর ভাইবোনেরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। এবার দেখা যাক, সংসারের মানুষগুলো কেমন ছিল।

(বাবার কথা)

বাবার সঙ্গে আমার পরিচয় খুবই সামান্য। সারা জীবনে তাঁকে সাত আট বারের বেশি দেখেছি বলে মনে হয় না। আমাদের সঙ্গে তিনি থাকতেনও না। তবু সংসারের কথা ভাবতে গিয়ে প্রায় অপরিচিত এই রহস্যময় মানুষটির কথাই কিন্তু প্রথমে মনে পড়ছে।

ঢাকা জেলায় যখন ছিলাম তখনকার কথা জানি না, জীবনের অন্য মেরুতে এসে আমার স্মৃতি সুদূর-ধূসর সেই অতীত পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে না। তবে বিবিবাজারে যখন এসেছিলাম সেটাকে বলা যায় আমার চেতনার প্রত্যূষ। তখনকার কথা অবশ্য মনে করতে পারব।

রোজ সকালে দাদু আমাকে ডেকে তুলতেন। কিন্তু হঠাৎ একেক দিন একটি অপরিচিত কণ্ঠ ঘুমের মধ্যে কানে আসত, 'খোকা ওঠ্—'

ছেলেবেলাব যা অভ্যাস, কিছুতেই উঠতে চাইতাম না। হাঁটুদুটো বুকের কাছে জড়ো করে কুঁকড়ি-সুকড়ি দিয়ে পড়ে থাকতাম।

অচেনা স্বরটা আবার শোনা যেত, 'উঠে পড় খোকা। কত বেলা হয়ে গেল, রোদ উঠে গেছে।' স্বরটা ভারি স্নিগ্ধ, এবং মধুর।

বারকয়েক ডাকাডাকির পর চোখ মেলে যাঁকে দেখতাম আমার স্মৃতির কোথাও তাঁর ছবি ছিল না। এলোমেলো অবিন্যস্ত চুলে কিছু সাদা কলি ধরেছে। মুখময় কয়েকদিনের দাড়ি গোঁফ অঙ্কুরিত, চওড়া কপালে পেন্সিলের গভীর ক'টি টান,

গাঁট-বার-করা লম্বা আঙুল, ভাঙা গাল, ধারাল চিবুক, তীক্ষ্ণ নাক, গায়ের চামড়া অযত্নে আর রোদে তামাটে। দীর্ঘ কাঠামোটির সবই প্রায় হাড়, মাংস নেই বললেই চলে। একদা হয়ত সুপুরুষই ছিলেন, আমার সেই শৈশবে তাঁর শরীরময় ধ্বংসের স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই সাজানো ছিল না।

কিন্তু সব চাইতে আশ্চর্য তাঁর চোখ। হয়ত উদাসীন, হয়ত অন্যমনস্ক, হয়ত আত্মমগ্ন। সেই মগ্নতার মধ্যেও বোঝা যেত চোখ দুটি বিচিত্র উজ্জ্বল। প্রাণের ভেতর কোথাও বুঝি দীপাধার ছিল, সেখান থেকে তেল শুষে শুষে দৃষ্টিটা সর্বক্ষণ আলোকিত হয়ে থাকত।

অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। স্নেহকোমল মুখখানা নামিয়ে আনতেন তিনি, হেসে বলতেন, 'আমাকে চিনতে পারছিস না, খোকা?'

উত্তর দিতাম না, অচেনা আগন্তুকের দিকে নিমেষহীন তাকিয়ে থাকতাম।

এবার চৌকাঠের কাছ থেকে দিদিমার গলা শোনা যেত। মৃদু স্বরে তিনি বলতেন, 'তোর বাবা, প্রণাম কর।'

এই অপরিচিত মানুষটিই আমার বাবা। সেই ছেলেবেলার অনুভূতিতে কিসের শিহরণ বয়ে যেত, মনে নেই। যেটুকু মনে আছে তা এইরকম। দিদিমার নির্দেশমত বিছানা থেকে উঠে আসতাম। বাবার পায়ের দিকে ঝুঁকতে গিয়েই কিন্তু ধরা পড়ে যেতাম। দুই দীর্ঘ বাহু দিয়ে বাবা আমাকে বুকের মধ্যে বন্দী করে ফেলতেন। তাঁর বুকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে যেতে আমার রক্তের নিকটতম মানুষটির হৃদস্পন্দন অনুভব করতাম।

একেক দিন ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ যেমন বাবাকে দেখতাম তেমনি একেক দিন উঠে দেখতাম, তিনি চলে গেছেন। কোথায় গেছেন, কেউ জানে না। কাউকে কিছু না বলে, কোনো ঠিকানা না রেখে নিঃশব্দে বিদায় নিয়েছেন। ঠিকানা কেন, এমন কিছুই তিনি রেখে যান নি যে চিহ্ন ধরে ধরে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়। সেই বয়েসেই আমি বুঝতে শিখেছি, নিজে এসে ধরা না দিলে বাবাকে ধরা যায় না।

বড় হয়ে দাদামশায়ের কাছে বাবার কথা অনেক শুনেছি। শুনে অবাক হয়েছি যত, রোমাঞ্চিত হয়েছি তার হাজার গুণ।

বাবা সে আমলের ঢাকা য়ুনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট। দূর সম্পর্কের কিছু আত্মীয়-স্বজন ছাড়া তাঁর কেউ ছিল না। না বলতে কেউ না। না বাবা, না মা, না কোনো ভাইবোন। আত্মীয়রা তাদের উপযুক্ত কাজই করেছিল, ফাঁকি দিয়ে তাঁর পৈতৃক জমি-জমা-বাড়ি-পুকুর সমস্ত লিখিয়ে নিয়েছিল।

বাবা ছিলেন অসাধারণ কৃতী ছাত্র। স্কুল-কলেজে কোথাও তাঁর মাইনে লাগেনি। স্কুল জীবনে একজন সহৃদয় হেডমাস্টার পেয়েছিলেন। তিনিই বাবার সব দায়িত্ব নিয়েছেন। নিজের বাড়িতে রেখে ঘরের ছেলের মত তাঁকে মানুষ করেছেন। কলেজ সম্পর্কে অবশ্য দুশ্চিন্তা ছিল। সেখানে কি হেড-মাস্টার মশায়ের মত এমন হৃদয়বান কেউ আছে? তা ছাড়া গ্রাম থেকে অনেক দূরে ঢাকা শহরে গিয়েও থাকতে হবে।

দুর্ভাবনাটা অবশ্য স্থায়ী হয়নি। এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পর হেডমাস্টার মশায়ই বাবাকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকার কলেজে ভর্তি করে দিয়ে এসেছেন, নিজের কৃতিত্বের জোরে স্কলারশিপ তো পেয়েইছেন বাবা, হেডমাস্টার মশায়ের সামান্য তদ্বিরে কলেজ-হস্টেলেও ফ্রীতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল।

অনায়াসেই বি এ পাশ করেছিলেন বাবা, এবং বেশ কৃতিত্বের সঙ্গেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছাপ তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তা ভাঙিয়ে সে আমলে সহজেই জীবনের উঁচু স্তরে পৌঁছুতে পারতেন। কিন্তু জ্ঞানকে অর্থকরী কাজে লাগাবার মত বুদ্ধি অথবা মানসিক গঠন কোনটাই তাঁর ছিল না।

জীবন সম্পর্কে বাবার নিজস্ব কিছু জিজ্ঞাসা বোধ হয় ছিল। বি. এ. পাশ করার পর তিনি চাকরি করতে যান নি, ব্যবসা করতেও না। যা করলে জীবনকে আরামে, বিলাসে, ভোগে পরিতৃপ্ত করা যায় সে পথে তাঁর পদক্ষেপের সম্ভাবনা ছিল না।

সে যুগের পক্ষে বিদ্যার যে মূলধন তাঁর হাতে ছিল তা পর্যাপ্তই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেটগুলো ভাঙিয়ে নগদ নগদ ফললাভ না করে বাবা বেরিয়ে পড়েছিলেন। এই বিশাল পৃথিবীর বিপুল জলধি আছে, অসীম প্রান্তর আছে, গহন বনানী আছে, দূর বিস্তৃত আকাশ আছে, অন্তহীন গিরিমালা আছে। সবার ওপরে যা আছে তা হল বিচিত্র মানুষের অরণ্য। এদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে কিসের যেন সন্ধান করে ফিরতেন বাবা।

তাঁর রক্তের মধ্যে অদ্ভুত এক যাযাবরবৃত্তি ছিল। খাওয়া-দাওয়া-ঘুম-বিশ্রাম, কোনো কিছুর স্থিরতা থাকত না। কিছু পেলে খেতেন, না পেলে ক্ষোভ নেই। ক্লান্তি বোধ করলে গাছতলায় কি কারো ঘরের দাওয়ায় খানিক ঘুমিয়ে নিতেন। নইলে মাথার ওপর সীমাহীন আকাশ নিয়ে রোদ-বৃষ্টি-ঝড়-জল অগ্রাহ্য করে অবিরত হাঁটতেন, হাঁটতেন আর হাঁটতেন। যৌবনের মাঝামাঝি থেকেই মানুষটি পদাতিক। হাঁটতে হাঁটতে কবে ঋতুবদল হয়ে গেল, কবে যে একটা বছর পূর্ণ হয়ে নতুন বছর এসে গেছে—কোনোদিকেই তাঁর খেয়াল থাকত না।

বাবা ছিলেন মানস-সরোবরের বুনো হাঁসটি। ঘুরতে ঘুরতে একদিন মাথার

বাড়ির গ্রামে অর্থাৎ সিরাজদীঘায় এসেছিলেন। এসেছিলেন অসুস্থ অবস্থায়—গায়ে ছিল প্রবল জ্বর। গ্রামে ঢুকে একটা বটগাছের তলায় শুয়ে পড়ে ছিলেন।

খবর পেয়ে দাদামশায় ছুটে গেছেন। গাছতলা থেকে বাবাকে তুলে এনেছেন নিজের বাড়িতে। তারপর রুগ্ণ প্রায়-বেহুঁশ মানুষটির সমস্ত দায়িত্ব সঁপে দিয়েছেন আমার মায়ের হাতে।

আমার মা তখন সপ্তদশী। সতেরও পা দিয়েও কুমারী। (সে আমলে কুমারী থাকার পক্ষে ঐ বয়েসটা দৃষ্টিশোভন নিশ্চয়ই নয়।) যাই হোক, আমার তরুণী মা অক্লান্ত সেবায় বাবাকে সুস্থ করে তুলেছিলেন।

জ্বর ছাড়ার পরই বাবা চলে যেতে চিয়েছিলেন। দাদামশায় ছাড়েন নি, একরকম জোর করেই ধরে রেখেছেন। অসুখের জের সম্পূর্ণ কেটে গেলে এবং শরীর সবল হলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাবার সব কথা জেনেছেন। সমস্ত শুনে স্তম্ভিত হয়েছেন যত, তার চাইতে অনেক বেশি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। একটি সুশিক্ষিত সুদর্শন যুবক এমন লক্ষ্যহীন উদ্‌ভ্রান্তের মত যে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে পারে, দাদামশায়ের কাছে তা যেন পরম অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয়। বিমূঢ়ের, মত বলেছেন, 'এভাবে জীবনটাকে নষ্ট করছ কেন?'

বাবা বলেছেন, 'কে বললে নষ্ট করছি!' মানুষ আর নিসর্গ সারা ভুবন জুড়ে যে বিচিত্র প্রদর্শনী সাজিয়ে রেখেছে তার ভেতর মুগ্ধ আগন্তুকের মত পা ফেলে ফেলে জীবনের রহস্যকে জানবার চেষ্টা করছেন তিনি। এই কথাটাই দাদামশায়কে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

যে যাযাবর স্বপ্নরাজ্যে বাবার সঞ্চরণ তা দাদামশায়ের নাগালের বাইরে। লেখাপড়া শিখে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কা নিয়ে ছেলেরা রোজগার করবে—মোটামুটি এই হিসেবটাই তিনি বোঝেন। গাছতলা থেকে তুলে এনে সুস্থ করার জন্য সম্ভবত বাবার ওপর খানিকটা দাবিই জন্মে থাকবে। তা ছাড়া লক্ষ্য করেছেন, এই ছন্নছাড়া দূরমনস্ক বোহেমিয়ান ছেলেটা তাঁর সপ্তদশী মেয়ের প্রাণে গাঢ় রঙে গভীর রেখায় কিছু একটা এঁকে দিয়েছে। ছেলেটির দিকে তাকিয়ে মেয়ের মুখে যেভাবে আলো নাচে, চোখের তারা যেভাবে মুগ্ধ হয়ে যায়—এসবের অর্থ যে কি হতে পারে, সংস্কৃত নাটক আর কাব্য নিয়ে যিনি জীবন কাটিয়েছেন সেই দাদামশায়ের পক্ষে তা নিশ্চয়ই দুর্বোধ্য ধাঁধা নয়। সব চাইতে বড় খবর হচ্ছে, ছেলেটি স্বজাতের এবং পাল্টা ঘরের। অতএব দাদামশায় তাঁর বিক্ষিপ্ত, বিশৃঙ্খল, দিগ্বিদিকে-ছড়ানো জীবনটাকে গুছিয়ে পায়ে বেড়ি দেবার জন্য কোমর বেঁধেছিলেন। প্রথমে নারায়ণ-গঞ্জে নিয়ে একে-ওকে ধরে আর, এস, এন কোম্পানিতে একটা চাকরি জোগাড়

করে দিয়েছিলেন। মাইনে পঁচাত্তর টাকা। সে আমলের পক্ষে অঙ্কটা রীতিমত ঈর্ষার। চাকরির পর এক শুভদিনে নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়েও দিয়েছিলেন দাদু।

অবশ্য বিয়ে এবং চাকরি—একসঙ্গে দু-দুটো শেকল খুব নির্বিবাদে যে মেনে নিয়েছিলেন বাবা, এমন মনে হয় না। তবে নতুন এক অভিজ্ঞতা হিসেবে কিঞ্চিৎ কৌতুকের সঙ্গেই সম্ভবত ও দুটো মাথা পেতে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ দেখাই যাক না, এই শৃঙ্খলিত জীবনের স্বাদ কেমন! তা ছাড়া ঘুরে ঘুরে হয়ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন বাবা, কোন বনানীর স্নিগ্ধ ছায়ায় একটু বিশ্রাম করে নেবার জন্য লালায়িত হয়ে থাকবেন। সেই ছায়াটা এসেছিল দাদামশায়-দিদিমার স্নেহ হয়ে, এসেছিল আমার সপ্তদশী মায়ের অনিঃশেষ প্রেম হয়ে।

ছেলেবেলায় বাপ-মা হারিয়ে স্নেহের দিকের অভিজ্ঞতাটা ছিল তাঁর শূন্য। দাদামশায়-দিদিমার স্নেহ এবং মায়ের প্রেম—দুই একাকার হয়ে বাবাকে বিগলিত আচ্ছন্নতার মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

নেশার ঘোরেই যেন নারায়ণগঞ্জে রিভার স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর চাকরিটা চুটিয়ে করে যাচ্ছিলেন বাবা, মা অবশ্য দাদামশায়ের কাছে সিরাজদীঘাতেই থাকতেন; ছুটি ছাটায় বাবা সেখানে আসতেন, দু-চারদিন থেকে আবার নারায়ণগঞ্জে ফিরে যেতেন।

কিন্তু বাবার এই আচ্ছন্নতার আয়ু মাত্র চারটে মাস। সংসার হোক, চাকরি হোক, স্ত্রী হোক বা ছেলেমেয়েই হোক—কোন একটি কেন্দ্রবিন্দুর চারপাশে আজীবন ঘুরপাক খাওয়া তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। যে জীবন এতকাল দূর দিগন্তে, আকাশের অসীম নীলিমায়, সুবিশাল প্রান্তরে ছড়িয়ে ছিল তাকে তিনি একটি ছোট্ট বৃত্তের মধ্যে চারমাস ধরে গুটিয়ে রেখেছিলেন। সেই সংহত সঙ্কুচিত সত্তা হঠাৎ একদিন বিদ্রোহ করে বসল। রক্তের মধ্য থেকে বোহেমিয়ানা আবার কথা কয়ে উঠল। দূর দিগন্ত, অজানা নদীর উৎস কিংবা অচেনা জলধি আবার তাঁকে হাতছানি দিল। সেই আহ্বান উপেক্ষা করার শক্তি বাবার ছিল না। দাদামশায় সযত্নে সুকৌশলে যে সোনার পিঞ্জরটা তাঁর জন্য বানিয়েছিলেন একদিন সেটা ভেঙে বাবা পালালেন। যাবার আগে কাউকে কিছু বললেন না পর্যন্ত।

চারমাস চাকরি করেছিলেন বাবা, মাইনে পেয়েছিলেন চার গুণ পঁচাত্তর অর্থাৎ তিন শ' টাকা। শুনেছি সারা জীবনে চাকরির মেয়াদ ঐ ক'টা মাস, আর উপার্জন ঐ তিন শ' টাকা।

একটি মানুষ সমস্ত জীবনে সাকুল্যে তিন শ'টি টাকা রোজগার করেছেন ভাবতেই যেন কেমন লাগে। যাই হোক, সেই যে বাবা পালালেন তারপর এলেন পাঁচ

বছর পর। দিন সাতেক থেকে আবার উধাও। আবার এলেন তিন বছর পর। বাবা আসতেন কিন্তু দিন দশেকের বেশি থাকতেন না। তাঁর এই ক্ষণ-দাম্পত্যের স্মৃতিচিহ্ন হয়ে একে একে আমরা ভাইবোনেরা পৃথিবীতে এসেছি। জ্ঞান হবার পর বাবার এই আসা-যাওয়ার খেলা নিজের চোখেই দেখেছি। তাও খুব বেশি নয়, সাত-আট বার মাত্র।

মোটামুটি এই হচ্ছে আমার বাবার রেখাচিত্র। সাধারণ চোখে নিতান্ত অপদার্থ, দায়িত্বজ্ঞানহীন, নির্বোধ। হয়ত উন্মাদও। কিন্তু ক'টি ঘটনা কিংবা চিবাচরিত সামাজিক ধারণা দিয়ে তাঁকে বোধ হয় সম্পূর্ণ ধরা যায় না। বাবাকে পুরোপুরি বুঝতে হলে আরো ব্যাপকভাবে তাঁর জীবনের চালচিত্র আঁকতে হবে। সে প্রসঙ্গ পরে।

(মায়ের কথা)

আমার মায়ের নাম সুনয়নী দেবী। নামের সঙ্গে রূপের মিল বড় একটা ঘটে না, ঐ দুটোর মধ্যে চিরদিনের আড়ি। কিন্তু মায়ের বেলা নামটা শুধু সার্থকই হয়নি, সব অর্থ ছাপিয়ে আরো কিছু মহিমা বুঝি তাঁকে দিয়েছিল। মায়ের চোখ দুটি ছিল ঘন পালকে-ঘেরা এবং বিশাল, তাতে ছিল দীঘল টান। মণি দুটো কুচকুচে কালো। কারো দিকে যখন তাকাতেন, মনে হত, দৃষ্টিটা হৃৎপিণ্ডে বিদ্ধ হয়ে গেছে।

চোখের মতই মায়ের সর্বাঙ্গে ছিল দীঘল ছাঁদ। মুখখানা ডিমের মত ; কোঁক-ড়ানো ঘন চুল পিঠময় ছড়িয়ে থাকত। গায়ের রং পাকা ধানের উপমা, তার ওপর উজ্জ্বল পালিশ লাগানো। বাঙালী মেয়েদের তুলনায় মা অনেক বেশি লম্বা। হঠাৎ দেখলে বিদেশিনী মনে হত।

ঐ রূপ নিয়ে মা অনায়াসেই কবির ধ্যান হতে পারতেন অথবা শিল্পীর হৃদয়েশ্বরী। কিন্তু জ্ঞান হবার পর থেকে কোনোদিন মাকে সাজতে দেখিনি। অত সুন্দর চুল, নিবিড় আর ঘন, অজস্র এবং কুঞ্চিত—ভুলেও খোঁপা বাঁধতেন না। বিনা তেলে, বিনা চিরুনিতে, অযত্নে আর অবহেলায়, সেগুলো এলোমেলো হয়ে জট পাকিয়ে থাকত। দু-হাতে দু-গাছি সাদা শাঁখা ছাড়া সারা গায়ে ধাতুর চিহ্নমাত্র ছিল না। নাকের পাটায় ছিল নাকছাবির বদলে কাঠি বেঁধানো, কানের লতিতে সুতো বাঁধা। অথচ বিয়ের সময় দাদামশায় সবই তো দিয়েছিলেন, হার-কানপাশা-চুড়ি-রুলি-নাক-ছাবি। সে-সব বাক্সে তুলে রেখেছিলেন মা।

লাল কি নীল পাড় মিলের শাড়ি আর মোটা লংক্লথের জামা ছাড়া কিছু পরতেন না। শীতের দিনে মোটা খদ্দরের একটা চাদর তার ওপর জড়িয়ে নিতেন। তবে

খুব বড় করে, আগেকার তামার পয়সার মত, কপালে সিঁদুরের টিপ দিতেন আর চওড়া রেখায় সিঁথি ধরে একেবারে মাথার মাঝখান পর্যন্ত সিঁদুর টানতেন।

কথা বলতেন মা খুব কম। হাসতে তাঁকে কদাচিৎ দেখেছি। সর্বক্ষণ মনে হত, একটা ধূসর কুয়াশাময় বিষণ্ণ জগতে তিনি রয়েছেন। কিংবা তাঁর চারপাশে রয়েছে চিক ফেলা, ফলে স্পষ্ট তাঁকে বোঝা যেত না।

বাবা দূরে থাকতেন বলে অপরিচিত। মা কাছে থেকেও অচেনা।

তাকালেই দেখতে পেতাম, মায়ের ঠোঁট শক্তবদ্ধ, চোখ ছায়াচ্ছন্ন। অবিরাম তিনি খাটতেন। রান্নাবান্না, ধোযামোছা, ঘষামাজা—সংসারের যাবতীয় কাজ তিনি একা হাতে করতেন। দিদিমা কিছু করতে গেলে রেগে উঠতেন। হঠাৎ দেখলে মনে হত, তিনি দাদামশায়ের একমাত্র মেয়ে নন। যেন ছেলেমেয়ে নিয়ে কোনো অনাত্মীয়ের বাড়ি বোঝা হয়ে আছেন এবং অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে তাঁদের খুশি করে এখানে থাকার অধিকার পেয়েছেন।

সারাদিন ছুটে ছুটে ঝড়ের গতিতে কাজ করতেন মা আর তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য রাখতেন আমি ঠিকমত পড়াশোনা করছি কিনা। বই থেকে মনোযোগ একটু শিথিল হলেই পিঠের ওপর পাখার ডাঁটি এসে পড়ত। শুধু লেখাপড়ার জন্যেই নয়, যখন-তখন কারণে-অকারণে মা আমাকে এবং ভাইবোনদের নিষ্ঠুরভাবে মারতেন। মার খেতে খেতে কতবার যে রক্তারক্তি ঘটে গেছে তার হিসেব নেই।

মনে পড়ে, মার খাওয়াটা আমাদের পক্ষে হয়ে দাঁড়িয়েছিল নিয়মিত এবং দৈনন্দিন। দাদামশায় কি দিদিমা মারের সময় ছাড়াতে এলে মা ক্ষেপে যেতেন, যা মুখে আসত তাঁদের তাই বলতেন। মা বুঝিয়ে দিতেন তাঁর ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে কারো কথা বলার অধিকার নেই। আমাদের তিনি মারবেন, কাটবেন, যা খুশি করবেন। কেউ আল্‌গা আদর দেখাতে এলে সহ্য করবেন না।

ছেলেবেলায় বুঝিনি, বড় হয়ে ভেবে দেখেছি, আমাদের প্রতি মায়ের নিষ্ঠুরতার অন্য কোন মানে ছিল। জ্ঞানশূন্যের মত আমাদের মেরে মা যেন অদৃশ্য কারো ওপর আক্রোশ মিটিয়ে নিতেন।

লক্ষ্য করেছি বাড়িতে ভাল খাবার হলে মা তার প্রায় সবটুকুই দাদামশায় দিদিমাকে খাইয়ে দিতেন। দাদুরা আপত্তি করলে শুনতেন না, চিৎকার শুরু করে দিতেন। আমাদের ভাইবোনদের ভাগে জুটত প্রতিদিন একই খাদ্য—ডাল, ভাত অথবা তার ওপর কদাচিৎ একটা তরকারি। নিতান্তই মামুলি এবং রোজ খেয়ে খেয়ে একঘেয়ে। মনে পড়ে খুব কম দিনই মা আমাদের পেট পুরে খেতে দিতেন।

ফলে আমাদের শরীরে পুষ্টি ছিল না, বাড় ছিল না। আমরা ছিলাম রুগ্ণ, দুর্বল, কৃশ, করুণ।

মায়ের নিষ্ঠুরতা শুধু আমাদের প্রতিই ছিল না, তাঁর নিজের সম্বন্ধেও ছিল। নিজেকে এমন অনাদর আর অযত্ন করতে পঞ্চাশ বছরের জীবনে আর কাউকে দেখিনি। আগেই বলেছি তিনি চুলে তেল দিতেন না, চিরুনি ব্যবহার করতেন না। 'সাজসজ্জা' শব্দটা তাঁর কাছে নিতান্তই অপরিচিত। আমার সেই মা মাত্র একবেলা ভাত খেতেন, রাত্রে চাট্টি মুড়ি বা একমুঠো ভাত রুটি মুখে দিয়ে জল খেয়ে শুয়ে পড়তেন। আশ্চর্য এততেও শরীর তাঁর ভাঙেনি।

আমার ছেলেবেলায় মাকে দেখলে যোগিনী মনে হত, কিংবা সন্ন্যাসিনী। সিঁথির দিকে না তাকালে হয়ত বিধবা। কিন্তু আমরা জানি, ওসবের তিনি কোনটাই নন। এই আত্মপীড়নের অন্য অর্থ ছিল। সে কথা পরে।

মনে পড়ে মায়ের বন্ধু ছিল না, সখি ছিল না। জীবনের অনেকগুলো বছরই তো বিবিবাজারে থেকেছি কিন্তু কোনোদিন মাকে বাড়ির বার হতে দেখিনি। সারাদিন বাড়িতে নিজেকে তিনি বন্দী করে রাখতেন। নিজে তো বাড়িতে থাকতেনই, আমাদেরও বেরুতে দিতেন না। খোলাধুলো সবই ছিল আমাদের বন্ধ।

মা সারা বাড়িতে একটা ভারী, গুমোট, শ্বাসরুদ্ধ আবহাওয়া তৈরি করে রাখতেন।

মনে আছে, জ্ঞান হবার পর থেকে মা বার বার আমাকে একটি কথা বলতেন, 'দশটা বছর সময় দিলাম। এর ভেতর ম্যাট্রিক পাশ করে চাকরি নিতে হবে। চাকরি হলে একদিনও আমি আর এ বাড়িতে থাকব না। আলাদা বাড়ি ভাড়া করে চলে যাব।'

মায়ের এই কথাটা উঠতে-বসতে-চলতে-ফিরতে কতবার যে শুনতে হ'ত, তার হিসেব নেই। শুনতে শুনতে এমন হয়েছিল, মা না বললেও মনে হ'ত, কানের কাছে অবিরত বেজে চলেছে। মায়ের সেই কথাগুলোকে অলঙ্ঘ্য আদেশ বলেই জানতাম।

দাদামশায়ের সংসারটার ওপর মায়ের এমন পাহাড়-প্রমাণ বিতৃষ্ণা যে কেন সেই বয়সে বুঝিনি। বুঝেছিলাম অনেক পরে।

ছেলেবেলায় মাকে আমার নিষ্ঠুর, প্রবল আর ব্যক্তিত্বময়ী মনে হত। মনে হ'ত, অনেকগুলো পরস্পরবিরোধী স্রোত তাঁর ভেতর যেন নিয়ত ছোটাছুটি করছে। ছেলেবেলার অস্ফুট অপরিণত চেতনায় যেটুকু ধরতে পেরেছি তাতে নিষ্ঠুরতার মলাটের তলায় আমার রাগী মাকে তখন যেন খুবই অসুখী মনে হত।

মাকে আমরা ভয় করতাম। শুধু আমিই না, দাদু দিদিমাও ভয় করতেন।

পারতপক্ষে তাঁর কাছাকাছি থাকতাম না। ভয় করলেও মায়ের সম্বন্ধে আমার কচি প্রাণে যা ছিল তার নাম দুর্বার কৌতূহল।

(দাদুর কথা)

আমার দাদু অর্থাৎ দাদামশায়ের নাম রমণীমোহন স্মৃতিতীর্থ। বিবিবাজারে আসার পর স্মৃতিতীর্থ উপাধিটা বর্জন করে নামের শেষে কুলপদবী বন্দ্যোপাধ্যায় জুড়ে নিয়েছিলেন তিনি। টোল নেই, চতুষ্পাঠী নেই, যজন-যাজন বা অধ্যাপনা কোনটাই নেই। অতএব স্মৃতিতীর্থ তো একটা নিষ্ফলা শব্দ মাত্র, নেহাতই কথার কথা। কারখানা শহরে স্মৃতিতীর্থের স্মৃতির জের টানা নিতান্তই অহেতুক মনে হয়েছে তাঁর।

দাদু মানুষটি ছিলেন রসে-হাস্যে সমুজ্জ্বল, যেন টুসটুসে নোনা ফলটি। পাকা নোনা ফলের উপমা ছেলেবেলায় কেন যে আমার মনে এসেছিল বলতে পারব না। বড হয়েও দাদুর সম্বন্ধে ঐ উপমা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারিনি।

দাদুর প্রাণটা ছিল রসিকতার সোনার খনি। কথায় কথায় তাঁর হাসি, কথায় কথায় পরিহাস। বুকের ভেতর কোথায় যেন একটা রসের ফোয়ারা সবসময় উচ্ছ্বসিত হয়ে থাকত। একটু আস্কারা পাবার অপেক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে সেটা বেরিয়ে পডত।

দাদুর পরিহাসের বারো আনাই তাঁর নিজেকে ঘিরে, নিজেকে ঘিরেই বোধ হয় একদিন রসিকতার হাতেখড়ি শুরু হয়েছিল তাঁর।

মামার বাড়ির বংশটাই ছিল রূপের জন্য বিখ্যাত। আমার নিজের মামা ছিল না কিন্তু মাকে তো দেখেছি। মায়ের খুড়তুতো জেঠতুতো অন্য ভাইদেরও দেখেছি। সব মিলিয়ে রূপের হাট বসান যেন। বংশের ছেলেমেয়েরাই শুধু নয়, অন্য কুল থেকে যারা এ বাড়িতে বউ হয়ে আসত রূপের বিচারে তারা পাকা সোনা। বাপের টাকার জোরে বা অন্য কোনো খাতিরে এখানে কুলবধূ হওয়া যেত না। এখানে আসার একটি মাত্র মাপকাঠি ছিল, তার নাম রূপ।

বংশের ধারা অনুসরণ করেই দাদু ছিলেন রূপবান, সুপুরুষ। দেহবর্ণ আমার মায়ের মতই, তবে বয়েস তাতে কিছু মলিনতা এনে দিয়েছিল। দীর্ঘ উজ্জ্বল চোখ, ধারাল চিবুক, তীক্ষ্ণ নাসা—প্রতিটি প্রত্যঙ্গে সৌন্দর্য আর সুষমা।

দাদুর প্রথম রসিকতা ছিল তাঁর রূপ নিয়ে। বলতেন, 'চেহারাখানা দেখেছিস তো, একেবারে মকরকেতন ময়ূরবাহন। একবার যে দেখবে সে-ই মজবে। মজবে এবং ভজবে। আমার বয়েস কত হল বল তো? ষাট? উঁহু-উঁহু—পুরো চৌষট্টি কিন্তু তোকে কি বলব দাদাভাই যুবতীরা এখনও যেভাবে আমার দিকে

তাকায় তাতে কি মনে হয় জানিস? মনে হয় কণ্ঠিবদল করবার জন্যে আঁকুপাঁকু করছে।'

দাদুর দ্বিতীয় রসিকতা ছিল নিজের নাম নিয়ে। বলতেন, 'আমার নাম রমণী-মোহন তো? আসলে কি হওয়া উচিত ছিল? উচিত ছিল রমণীহরণ। জানিস দাদাভাই, যে রমণীটি আমার ঘরে আছে, ঐ যাকে তোরা দিদিমা বলিস, আমি তার হৃদয়ই হরণ করিনি, একদিন তাকে বৈজ্ঞাগাঁ থেকে কেড়েও নিয়ে এসেছিলাম।'

দাদুর বিয়ের কথা বড় হয়ে শুনেছি। সে আমলের পক্ষে অর্থাৎ উনিশ শতকের আটের দশকে তেমন বিয়ে বিপ্লবের মতই। দাদুর বিয়ের কথা এখানে নয়।

এক আমলে দাদু মানুষটা গুরুগিরি করেছেন, টোল চালিয়েছেন কিন্তু গুরু বলতে টুলো পণ্ডিত বলতে যে ছবিখানা চোখের সামনে ফুটে ওঠে দাদুর সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র মিল নেই। হৈ-চৈ-হুল্লোড় করে চারদিকে একটা রঙীন উৎসব বাধিয়ে দিন কাটানোর মধ্যেই ছিল তাঁর আনন্দ। অবশ্য বিবিবাজারের বিস্তীর্ণ জীবনে নিজেকে তিনি ছড়িয়ে দেননি। যার যেমন মন—নিজের ছোট্ট সংসার, স্ত্রী-মেয়ে-নাতি-নাতনী, এদের নিয়েই তিনি উজ্জ্বল হতে চেয়েছেন, পুষ্পিত হতে চেয়েছেন. হাসিতে-পরিহাসে সবাইকে মাতিয়ে রাখতে চেয়েছেন।

দাদুকে আমার কোনোদিন বয়স্ক মনে হ'ত না। অবশ্য নাতি আর দাদুর বয়েস চিরদিনই সমান। নাতি-নাতনীদের কাছে না হয় বয়েসের হিসেব থাকে না কিন্তু জগতের সবার সঙ্গেই দাদু সমবয়সী হয়ে যেতেন। মুখটা ছিল ভীষণ আলগা, কিছুই তাঁর জিভে বাধত না। প্রাণে যা আসত তাই বলতেন, তাঁর রসিকতার প্রায় সবটুকুই আদিরসের প্রান্তঘেঁষা।

সব চাইতে যা আমাকে মুগ্ধ করেছিল তা হচ্ছে দিদিমার সঙ্গে দাদুর সম্পর্কের গভীরতা। বিবাহিত জীবনের প্রায় চল্লিশটা বছর কাটিয়ে দেবার পরও দিদিমা সম্বন্ধে তাঁর আকর্ষণ বিন্দুমাত্র আলগা হয়নি। বরং যত দিন যাচ্ছিল ততই সেটা তীব্র হচ্ছিল, প্রবল হচ্ছিল।

মনে পড়ে, অফিসের সময়টুকু বাদ দিলে সারাদিনই প্রায় দিদিমার পেছনে ঘুর ঘুর করে বেড়াতেন দাদু। কথায় কথায় ছিল তাঁর হাসি, কথায় কথায় খুনসুটি। মুহূর্তে ছিল ভাব, মুহূর্তে আড়ি। ক্ষণে মেঘ ক্ষণে রোদের খেলায় দাদু-দিদিমা সর্বক্ষণ মেতে থাকতেন।

সকালবেলার দিকটা অবশ্য তেমন সময় পাওয়া যেত না। কিন্তু অফিসটি যেই ছুটি হল, দাদু আর এক মুহূর্তও বাইরে থাকতেন না। বাড়ি ফিরে প্রথমে নাতি-নাতনীদের পেছনে লাগতেন। কিছুক্ষণ আমাদের জ্বালাপালা করে দিদিমাকে নিয়ে

পড়তেন। নিজের চোখে দেখেছি, দাদু দিদিমার চুল বেঁধে দিতেন, মুখোমুখি বসে লুডো অথবা দাবা খেলতেন। আর এই চুল বাঁধা এবং খেলা নিয়ে তাঁদের মধ্যে ঝগড়ার খেলা যে কত দেখেছি, তার হিসেব নেই। এই ঝগড়ার-সবটুকুই যে মিথ্যে, বরং ভালবাসারই যে সেটা আরেক রূপ আমার চাইতে তা আর কে ভাল জানে! রাত্রিবেলা শুয়ে শুয়ে মেঘদূত অথবা কুমারসম্ভব থেকে বাছা বাছা পদগুলি গুনগুনিয়ে দিদিমাকে শোনাতেন দাদু।

শুনেছি কিশোর বয়েসেই বিয়ে করেছিলেন দাদু। এবং বিয়েটা ছিল ভালবাসার। বিয়ের পর তিন যুগের ওপর পাড়ি দিয়ে জীবনের বিপরীত মেরুতে পৌঁছে গিয়েছিলেন দাদু কিন্তু তাঁর প্রেমের বয়েস বাড়ছিল না। প্রৌঢ়ত্বের সীমান্তে এসেও কিশোর-প্রেমের অমল মধুর স্নিগ্ধতার ভেতর তিনি যেন আচ্ছন্ন হয়েছিলেন।

এমন যে প্রাণোচ্ছল রসিক প্রেমিক দাদামশায়, মায়ের সামনা-সামনি পড়লে একেবারে বিষণ্ণ ম্রিয়মাণ হয়ে যেতেন। আমাদের নিয়ে তাঁর যত পরিহাস, দিদিমাকে নিয়ে যত খুনসুটির খেলা—এ সবই ছিল মায়ের আড়ালে, মায়ের চোখকে ফাঁকি দিয়ে। এই লুকোচুরির রহস্য ছেলেবেলায় বুঝিনি, বুঝেছি অনেক পরে, বড় হয়ে। কিন্তু সে কথা যথা সময়ে।

(দিদিমার কথা)

দিদিমা সম্বন্ধে আলাদা করে বলার কিছু নেই। তাঁর নিজস্ব কোন মত ছিল না, ভাবনা ছিল না, বুঝিবা সত্তাও। দাদুর মতই তাঁর মত, দাদুর ভাবনাই তাঁর ভাবনা, দাদুর অস্তিত্বই তাঁর অস্তিত্ব। দাদুর প্রতিটি কথায়, প্রতিটি খুনসুটিতে, প্রতিটি ঝগড়ায় তাল দিয়ে বেজে উঠতেন দিদিমা। মনে হত, দাদুর জন্যে তাঁর মনের মতটি হয়ে দিদিমার সৃষ্টি হয়েছিল। মোট কথা, একটি অখণ্ড সত্তাকে দু-ভাগে ভাগ করলে একটি যদি দাদু হন অন্যটি তবে দিদিমা।

একটা জায়গায় স্বামী-স্ত্রীর একটু অমিল ছিল। দাদু হাসতেন খুব জোরে জোরে। মনে হত, ঝড় বয়ে যাচ্ছে। দিদিমার হাসি খুব মৃদু, সুরেলা। মনে হত, ধীরে-ধীরে কোমল লয়ে জলতরঙ্গ বেজে যাচ্ছে।

তিন

সংসারের সবগুলি মানুষের মোটামুটি রেখাচিত্র তো আঁকলাম। এবার আমার কথা।

কোন ঘটনা দিয়ে আমার কথা শুরু করব? এই মুহূর্তে স্কুলে ভর্তি হবার দিন-

টিই সব চাইতে আগে মনে পড়ছে। দিনটা আমার কাছে অনেক দিক থেকেই স্মরণীয়। কেননা, সেই দিনটিতেই বাড়ির বাইরের বিস্তীর্ণ জগতে আমার প্রথম পা বাড়ানো, সেই দিনটিতেই প্রথম বন্ধু পাওয়া। আর নলিনীও সেই দিনই জীবনের দিগন্তে নিঃশব্দ পায়ে প্রথম এসে দাঁড়িয়েছিল।

সেই ছেলেবেলায় মায়ের জন্যে 'বাহির' বলে আমার কিছুই ছিল না। সারাদিনই বাড়ির মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতাম। মনে পড়ে সেদিনে স্কুলে ভর্তি হব বলে, বাড়ির বাইরে পা দেব বলে খুব ভোরে উঠে পড়েছিলাম। উত্তেজনায় আগের রাত্রে ভাল ঘুমোতে পারিনি।

দাদু আমাকে ভর্তি করাতে নিয়ে যাবেন। সেজন্যে সেদিনটা অফিস থেকে ছুটি নিয়েছিলেন। ন'টার মধ্যে চান সেরে ভাত খেয়ে দাদুর হাত ধরে বেরিয়ে পড়েছিলাম। যাবার আগে দিদিমা বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে একটা কামড় দিয়ে কপালে চুমু খেয়েছিলেন আর মা আড়ালে ডেকে নিয়ে চোখে চোখ রেখে বলেছিলেন, 'আজ থেকে দশটা বছর সময় দিলাম। একটা একটা করে দিন আমি গুনতে থাকব। দশ বছর যেই হবে আর কোন কথা শুনব না। চাকরি যোগাড় করে আলাদা বাড়ি ভাড়া নিতে হবে। মনে থাকবে তো?'

সেই বয়েসে কিছু না বুঝে মায়ের দৃষ্টির সামনে সম্মোহিত আমি শুধু মাথা নেড়েছিলাম।

মনে আছে, হীরু আর আমি একই দিনে একই স্কুলে ক্লাস টু-তে ভর্তি হয়েছিলাম। আমি তো গিয়েছিলাম ঠাকুরদার হাত ধরে, হীরু এসেছিল ফীটনে চড়ে তার বাবার সঙ্গে।

একই পাড়ায় আমাদের বাড়ি। হীরুদের লালরঙের বিশাল তেতলা বাড়িটা পুব দিকের শেষ প্রান্তে, আমাদেরটা বিপরীত দিকে অর্থাৎ পশ্চিম প্রান্তে। আমাদের একতলা ভাড়াটে বাড়ির ছাদে উঠলে ওদের বাড়ির বিশাল চৌহদ্দির খানিকটা চোখে পড়ত। এতদূর থেকে সবটা তো বুঝতে পারতাম না, তাই কেমন যেন রহস্যময় মনে হত।

বিবিবাজার নামে এই অর্বাচীন নবীন নগরে বাড়ি-ঘর পথঘাট সবই তো প্রায় নতুন, বয়স খুব বেশি হলে দু-তিন দশকের মত হবে। কিন্তু কলকারখানার হাওয়া লাগার আগে বিবিবাজার যখন নিতান্ত গ্রাম মাত্র তখন থেকে হীরুদের ঐ বাড়িটা আছে। হীরুদের বাড়ি বিবিবাজারের অন্য সবার চাইতে পুরনো, বয়স্ক এবং বিশাল।

ভর্তি হবার পর হীরুই আমার সঙ্গে প্রথম আলাপ করেছিল, 'তোমার নাম কি ভাই—'

মায়ের জন্য চিরদিনই আমি ভীরু, কুণ্ঠিত, লাজুক। আমার স্বভাবের অনেক-খানি অংশই তাঁর জন্য বিকশিত হতে পারেনি। দাদুর হাত শক্ত মুঠোয় চেপে জড়ানো গলায় নাম বলেছিলাম।

হীরু কিন্তু খুবই স্বচ্ছন্দ। তার স্বভাবের কোন দিকেই বোধ হয় বিন্দুমাত্র সঙ্কোচের অবকাশ নেই। বলেছিল, 'আমার নাম হীরু, ওটা ডাক নাম। ভাল নাম, শ্রীহিরণ্যকুমার চট্টোপাধ্যায়। আমরা দু'জনে একসঙ্গে পড়ব, তুমি কিন্তু ভাই আমার বন্ধু হলে। কেমন ?'

আমি উত্তর দিইনি। শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে ভীতু চোখে হীরুকে দেখছিলাম। তার দামী গরম প্যান্ট, চকচকে বেল্ট, সিল্কের শার্ট, ঢোলা সোয়েটার, সযত্নলালিত চমৎকার চেহারা আর সুন্দর স্বাস্থ্যের পাশাপাশি তুলনামূলকভাবে আমার দড়ি-বাঁধা ইজের, শস্তা ছিটের শার্ট, অযত্নে আর অবহেলায় বর্ধিত কর্কশ রুক্ষ শ্রীবর্জিত দেহটা বার বার মনে পড়ে যাচ্ছিল। আমি আরো সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছিলাম, অদ্ভুত এক স্পর্শকাতরতা আমাকে যেন এ-টুকু করে ফেলছিল।

হীরু আবাব বলেছিল, 'আজ তো স্কুলে পড়তে হবে না। চল না আমাদের বাড়ি।'

আমি উত্তর দিই নি।

হীরু এবার লোভ দেখিয়েছিল, 'আমার অনেক ছবির বই আছে, খেলনা আছে, বল আছে—' বলে খপ করে আমার একটা হাত ধরেছিল।

সেই ছেলে বয়সে আমি তো আর লোভমোহজয়ী নই। এখনও হতে পেরেছি কি ? এবার আমি দাদুর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। অর্থাৎ হীরুদের বাড়ি যাওয়া সম্বন্ধে তাঁর মতামত কী ? তাঁর মাথা একদিকে হেললে আমি হয়ত হীরুর সঙ্গে যেতেও পারি।

দাদুকে কিন্তু চিন্তিত দেখিয়েছে। আস্তে আস্তে তিনি বলেছিলেন, 'তাই তো, ও এত করে বলছে। না যাওয়াটা খারাপ দেখায়। কিন্তু তোর মা ?'

ছবির বই, খেলনা, বল—ইত্যাদি দিয়ে যে চমৎকার লোভনীয় ছবিখানা চোখের সামনে হীরু ঝুলিয়ে দিয়েছিল নিমেষে সেটা অদৃশ্য। মা—মায়ের বিনা অনুমতিতে কোথাও যাওয়া আমার নিষিদ্ধ। এমন কি স্বয়ং দাদুর পক্ষেও মায়ের ইচ্ছা অনিচ্ছা নাকচ করার সাহস ছিল না।

এদিকে হীরু জেদ ধরেছিল। জোরে জোরে প্রবলবেগে মাথা নেড়ে সমানে বলে যাচ্ছিল, 'চল না, চল না, চল না—'

হীরুর বাবা তার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এগিয়ে এসে মৃদু হেসে দাদুকে বলেছিলেন, 'ছেলেটা আমার বড্ড জেদী। একবার যখন জেদ ধরেছে তখন ওকে বাড়ি না নিয়ে ছাড়বে না। আপনার কী হয়?'

দাদু বলেছিলেন, 'নাতি।'

'আমাদের সঙ্গে ওকে বরং নিয়েই যাই। খেলাধুলো করে বিকেলবেলা ফিরে আসবে। আমিই দিয়ে যাব।'

হীরুর জেদের খাতিরে আর হীরুর বাবার কাছে ভদ্রতার খাতিরে নিদারুণ এক পরিণামের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে দাদুকে অগত্যা বলতে হয়েছিল, 'আচ্ছা, নিয়েই যান।'

হীরুর বাবা এবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনাদের বাড়িটা কোথায়?'

দাদু ঠিকানা বলে হীরুর হাতে আমাকে সঁপে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

স্কুল-কম্পাউণ্ডের ভেতরে ডালপালাওলা ঝাঁকড়া সিরু গাছের তলায় একটা মস্ত ফীটন দাঁড়িয়ে ছিল। হীরুর মুঠোয় আমার একটা হাত ধরা ছিল। টানতে টানতে সে আমাকে ফীটনে নিয়ে তুলেছিল।

এই ফীটনটা আগেও দেখেছি। পাগড়ি-পরা হিন্দুস্থানী একটা কোচোয়ান চাবুক হাঁকিয়ে সেটা চালাত। বাদামী রঙের আরবী ঘোড়াটা কেশর দুলিয়ে টগবগ করে যখন ছুটত, বিবিবাজারের আঁকাবাঁকা অন্ত্যজ রাস্তাগুলো হঠাৎ যেন অত্যন্ত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হয়ে উঠত।

মাঝে মাঝে নিজেদের ছাদে উঠে ওই ফীটনটায় করে হীরুদের বেড়াতে দেখেছি। কিন্তু কোনদিন ওটায় চড়ার সৌভাগ্য হবে, এ ছিল আমার সুদূর কল্পনা এবং স্বপ্নেরও বাইরে।

ফীটনটার মধ্যে হীরুর পাশাপাশি বসে ঘেমে উঠছিলাম। হীরুর বাবা উল্টোদিকের সীটে বসে জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিলেন।

তড়বড় করে খুব দ্রুত অনেক কথা বলে যাচ্ছিল হীরু। কিছুই যেন বুঝতে পাচ্ছিলাম না, শুনতে পাচ্ছিলাম না। দুরন্ত আকর্ষণে হীরুর সঙ্গে চলে এসেছিলাম ঠিকই কিন্তু ফীটনে উঠবার পর অহেতুক এক ভয়ে আড়ষ্টও হয়ে যাচ্ছিলাম।

নিজেদের একতলা ছোট্ট বাড়িটার সীমানা পেরিয়ে এর আগে কদাচিৎ বেরিয়েছি। না বেরিয়ে বেরিয়ে বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে আমার প্রাণে এক ধরনের ভীতি ছিল।

যদিও খুবই কাছাকাছি এবং একই পাড়ার এ-মাথায় ও-মাথায়, আমরা থাকি

তবু মা-বাবা-ভাই-বোনদের ছেড়ে অন্ত কোথাও যাবার অভিজ্ঞতা আমার সেই প্রথম। আমার দুয়ারে হীরুই প্রথম 'বাহির'কে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

একসময় বিবিবাজারের রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে উড়িয়ে ফীটনটা হীরুদের বাড়ি এসে পড়েছিল। আগেই জানতাম, হীরুরা বড়লোক। দাদু অথবা অন্ত কারো মুখে হয়ত একথা শুনেছিলাম। কিংবা শুনিনি, দূর থেকে ওদের বিশাল বাড়িখানা আর খোয়ার রাস্তায় চমৎকার ফীটন, ঝুঁটি-ঝোলানো আরবী ঘোড়া দেখে এমন ধারণা করে নিয়েছিলাম।

হীরুদের বাড়িতে ঢুকে ভারি ভাল লেগে গিয়েছিল। তাদের অবস্থা ভাল, এটুকুই শুধু জানা ছিল। অবশ্য বিবিবাজারে তাদের চাইতে হাজার গুণ বড়লোক আরো ছিল। যেমন কলকারখানার মালিক নতুন গুজরাটিরা, পার্শীরা, বিলিতি সাহেবরা। কেউ কেউ বাঙলো বানিয়ে এখানেই থাকত।

বড়লোক অনেক ছিল কিন্তু হীরুর বাবার মত সৌখিন মানুষ সেই শহরটায় দ্বিতীয় কেউ ছিল না। বাড়িটার সর্বাঙ্গে ছিল তাঁর নানা শখ আর সৌখিনতার ছাপ। অন্তমনস্ক চোখেও সে-সব ধরা পড়ে যেত।

হীরুদের বাড়িটা পুরনো আমলের হলেও পটে-আঁকা ছবির মতই দেখাত। মনে আছে, যেদিন প্রথম গেলাম তার কিছুদিন আগে তার কলি ফেরানো হয়েছিল।

উঁচু পাঁচীল দিয়ে সমস্ত চৌহদ্দি ঘেরা। ভেতরে, বাড়িটার ঠিক সামনের দিকে চমৎকার একখানা বাগান। গোলাপ, গন্ধরাজ, কাঁঠালী চাঁপা—এসব পরিচিতের ভিড়ে দুর্লভ অপরিচিত কিছু ফুলের সমারোহও ছিল। আর ছিল ঝাউয়ের বন। ঝাউবনের ফাঁকে ফাঁকে লাল সিমেন্টের বেদীতে বসবার ব্যবস্থা। বাড়িটার পেছন দিকে পুকুর এবং ফলের বাগান। অধিকাংশই দেশী ফল—আম, জামরুল, আতা, নোনা, পেয়ারা, সবেদা। পুকুরের চারদিক ঘিরে সারি-বদ্ধভাবে সুপুরি আর নারকেল গাছের জটলা। (বাড়ির পেছন দিকের খবর সেই মুহূর্তে আমার জানা ছিল না, জেনেছিলাম অনেক পরে।)

ঝাউবনের কাছে ফীটনটা এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে নেমে পড়েছিল হীরু। ছুটে বাড়ির ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কয়েকটা মাত্র মুহূর্ত। তারপরেই ফিরে এসে হাত ধরে টানতে টানতে তার মাকে নিয়ে এসেছিল।

হীরুর মা বলেছিলেন, 'আরে বাপু, ছাড়্—ছাড়্। আমি তো আসছিই।'

হীরু কোন কথা শোনেনি। একেবারে ফীটনের কাছে তাঁকে নিয়ে এসে তবে ছেড়েছিল। আমাকে দেখিয়ে বলেছিল, 'ঐ যে আমার বন্ধু।'

হীরুর মা আমার দিকে তাকিয়ে সস্নেহে বলেছিলেন, 'এসো, নেমে এসো।'

হীরুর বাবা তখনও ফীটনে বসে ছিলেন। দরজা খুলে নামতে নামতে বলেছিলেন, 'ছেলেটি আজই হীরুর ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। রাস্তার শেষ মাথায় যে বাড়িটা আছে সেখানে থাকে। হীরু জেদ ধরলে, ওকে নিয়ে আসবে। ছেলে কেমন জেদী জানো তো। কি আর করি, নিয়েই এলাম।'

'জেদী আবার হবে না! তোমারই ছেলে তো।' স্বামীর দিকে তাকিয়ে চোখের কোণে কেমন করে যেন হেসেছিলেন হীরুর মা। তারপর বলেছিলেন, 'এনেছে, বেশ করেছে।'

হীরুর বাবা এবার কিছু বলেন নি, তিনিও হেসেছিলেন।

হীরুর মা এবার আমার দিকে ফিরে তাড়া দিয়ে উঠেছিলেন, 'এই ছেলে, এখনও বসে রয়েছ। এসো, তাড়াতাড়ি নেমে পড।'

আমি নামি নি, ভারি লজ্জা লাগছিল। চুপচাপ মুখ নিচু করে বসে ছিলাম।

আর ঠিক সেই সময় হীরুর মায়ের পাশ থেকে কচি গলায় কে যেন বলে উঠেছিল, 'দাদার বন্ধুটা কি রে! মুখ তোলে না, গাড়ি থেকে নামেও না।'

হীরু, হীরুর মা এবং বাবা—সবাই জোরে হেসে উঠেছিলেন। আর চোখ তুলে চকিতে একবার দেখে নিয়েছিলাম, হীরুর মায়ের পাশ ঘেঁসে বছর পাঁচেকের একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। বড় বড় টানা চোখ, থোকা থোকা এক মাথা চুল, ফর্সা রঙ, বুলবুলির মত লাল টুকটুকে পাতলা দুটি ঠোঁট। চিবুকের তলাটি খাঁজ-খাওয়া, বাঁ গালে মসুর ডালের মত গোলাপী একটা জড়ুল। সমস্ত শরীরটাই যেন মোম দিয়ে গড়া। ছোট্ট একটা জাপানী পুতুল বুঝি। সর্বাঙ্গের সঙ্গে ছাঁদ মিলিয়ে গায়ে হলুদ রঙের ফ্রক আর পায়ে চীনা ঘাসের হলুদ চটি।

একবার দেখেই চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। ঘাড় ভেঙে অনেকখানি ঝুঁকে পড়েছিল। তখন কি জানতাম, সেই মুহূর্তটিতেই আমার জীবনের দিগন্তে অদৃশ্য হাতের একটা রেখা পড়ে গিয়েছিল।

হীরুর মা এবার এগিয়ে এসে ফীটনের দরজা খুলে আমাকে নামিয়ে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'ছেলের তো দেখছি ভারি লজ্জা।'

সেই মেয়েটি আবার বলে উঠেছিল, 'লজ্জা না গো মা, তোমার আদরের জন্যে অমন চুপটি করে বসে ছিল।'

মেয়েটির কথা শেষ হতে না হতেই হাসি আবার উথলে উঠেছিল।

মনে পড়ে, সেদিন সারা দুপুর হীরুদের বাড়ি কাটিয়ে এসেছিলাম। আর এই

একটা দুপুরের মধ্যেই ও বাড়ির কিছু কিছু খবর জানা হয়ে গিয়েছিল। হীরুরা দু'টি মাত্র ভাইবোন। হীরু আর সেই মোমে গড়া জাপানী পুতুলের মত মেয়েটা, ডাক নাম যার ঝুলন, পোশাকী নাম নলিনী—কুমারী নলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐ সামান্য সময়টুকুর ভেতর আরো একটা ব্যাপার আমার চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিল। সেটা হীরুর বাবা এবং মায়ের মধ্যেকার বিচিত্র একটা খেলা। কিন্তু সে কথা এখন নয়, পরে। বিস্তৃতভাবে তা বলতে হবে। তবে এটুকু বলা দরকার ও বাড়িতে প্রথম পা দেবার দিনটিতেই সেই খেলাটা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। আর বার বার তাঁদের পাশাপাশি আমার নিজের মা-বাবার কথাই মনে পড়ে যাচ্ছিল। সেই সঙ্গে কষ্টদায়ক এক আবেগ ক্রমশঃ স্ফীত হয়ে আমার শ্বাসটাকে আটকে আটকে আনছিল।

সেদিন দুপুরবেলাটা কিভাবে কেটেছে, সব খুঁটিনাটি এতকাল পর আর মনে পড়ে না, তবে এটুকু মনে আছে, সারা দুপুর আমরা লুডো খেলেছিলাম, কেরম খেলেছিলাম। (লুডো, কেরম আগে আর কখনও খেলিনি। হীরু আমার হাতেখড়ি দিয়েছিল।) হীরু তার সব ঐশ্বর্য—এয়ার গান, মার্বেল গুলির বাক্স, কাঠের ঘোড়া, হাতী, টিনের মোটর, ছবি আর ছড়ার বই ইত্যাদি ইত্যাদি—আমার সামনে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিল। চাই কি, একখানা ছবির বই পরম উদারতায় আমাকে হয়ত উপহারও দিয়ে থাকবে।

কিন্তু হীরু যতখানি উদার, যতখানি খোলামেলা, ঝুলন—যার ভাল নাম নলিনী—ততখানি নয়। ফীটন থেকে নামার সময় যা দু-চার কথা সে বলেছে। তা-ও আমার সঙ্গে নয়। তার বাবা এবং মায়ের সঙ্গে। আমরা অর্থাৎ হীরু আর আমি যখন লুডো খেলছিলাম, কেরম খেলছিলাম, ছবি বই দেখছিলাম, ছড়ার বই পড়ছিলাম—ঝুলন ঘুরে ঘুরে এসে আমাদের দেখে যাচ্ছিল। আমাদের ঠিক নয়, আমাকে। তার নাকের পাটা ছিল ফোলানো, দু-চোখে গোয়েন্দার দৃষ্টি। অর্থাৎ কিনা দাদার বন্ধুটার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যায় কিনা, সেটাই তখন তার ভাবনার বিষয়। তার চোখমুখের ভাবখানা, দাদাকে যতখানি সোজা-সহজ ভাল মানুষ পেয়েছ, আমি তা নই। অত তাড়াতাড়ি নিজেকে মেলে ধরছি না। আগে যাচাই করব, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাজিয়ে দেখব, তুমি লোকখানা কেমন। তারপর তো আলাপের প্রশ্ন। বন্ধুত্ব তো অথৈ জলে।

দুপুরটা স্বপ্নের ঘোরে কেটে গেছে। বিকেলবেলা লুচি-তরকারি-মিষ্টি খাবার পর হীরুর বাবা বলেছিলেন, 'এবার চলো, তোমাকে দিয়ে আসি।'

আমি তৎক্ষণাৎ তৈরি।

হীরুর মা বলেছিলেন, 'আবার এসো।'

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আসব কি আসব না—সে জবাব রয়েছে আমার মায়ের হাতে। কাজেই চুপ করে ছিলাম।

হীরুর মা আবার বলেছিলেন, 'আসবে কিন্তু, আসবে তো?'

ফিসফিসিয়ে বলেছিলাম, 'আমি জানি না।'

হীরুর মা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই ঝুলন বলে উঠেছিল, ঠিক আসবে, দেখে নিও। দাদা ছবির বই দিয়েছে না, ঐ লোভে আবার আসবে।'

দমকা বাতাসের মত তাল দিয়ে সবাই হেসে উঠেছিল। চোখ পাকিয়ে সস্নেহে ছেলে মেয়েকে শাসন করেছিলেন হীরুর মা, 'বাঁদর মেয়ে, এ সব বলতে আছে?' বলেই ঝুলনের পিঠে গুম করে একটা কীল বসিয়েছিলেন। আর একেবারে এতটুকুটি হয়ে আমি কোথায় যে লুকোব, ভেবে পাচ্ছিলাম না।

যাই হোক হীরুর বাবাই আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'চলো এবার।'

ঝাউবনের কাছে সেই ফীটনটা দাঁড়িয়ে ছিল। হীরুর বাবার পিছু পিছু আমি তাতে গিয়ে উঠেছিলাম। হীরুও আমাদের সঙ্গে উঠে পড়েছিল।

হীরুর বাবা ছেলের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'তুই আবার কোথায় চললি?'

'চিরন্তনদের বাড়ি।'

'সেখানে গিয়ে আবার হুজ্জুত বাধিয়ে দিও না যেন। আমি ওকে পৌঁছে দিয়েই কিন্তু চলে আসব।'

বাবার কথায় খুব একটা গুরুত্ব দিয়েছে, হীরুকে দেখে এমন মনে হয়নি। উত্তর দিতে হয় তাই দায় সারতে বলেছে, 'আচ্ছা।' বলেই আমার দিকে ফিরেছে, 'এই ভাই, তোর ডাক-নাম কিছু নেই?'

'আছে।'

'কী?'

'বকু।'

'আমি কিন্তু বকু বলেই ডাকব। তোর ভাল নামটা বড্ড শক্ত রে।'

'আমি কিছু বলিনি। চুপ করে থেকে ডাক-নামে ডাকার ব্যাপারে সায় দিয়েছিলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হীরুদের ফীটন আমাদের ভাড়াটে বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে যেতে যেতে অজানা আশঙ্কায় আমার বুক তখন দুরু দুরু, শীতের শেষ অশথ পাতাটির মত হঠাৎ হাওয়ায় প্রাণ কাঁপছে।

সারাটা দুপুর মায়ের বিনা অনুমতিতে কাটিয়ে এলাম, তার পরিণাম কি যে হবে সেই ভাবনায় আমি দিশেহারা, অস্থির।

বাড়িতে পা দিয়েই চোখে পড়েছিল, দাদু আমার ছোট ভাইবোন দুটোকে নিয়ে বসে আছেন। দিদিমাকে দেখা যাচ্ছিল না। মা উঠোনের এককোণে কুয়োতলায় এক পাঁজা বাসন নিয়ে বসে ছিলেন। আমাকে দেখে তীব্র রেখায় উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। মুখখানা গনগনে আগুনের মত, চোখ দুটো জ্বলছিল, থুতনিটা অস্বাভাবিক কাঁপছিল। রেগে গেলে থুতনিটা ভয়ানক কাঁপত তাঁর।

দুর্যোগ যে আসন্ন সেটা বুঝতে এক মুহূর্তও সময় লাগেনি। সংস্কার এবং অভ্যাসবশে শরীরের সমস্ত পেশী শক্ত করতে শুরু করেছিলাম। মা-ই আমার কাছে সব চাইতে উচ্চ আদালত। তিনি যে শাস্তি দেবেন, তার ওপর আর কোথাও আপীল চলবে না।

চাপা কঠিন স্বরে মা বলেছিলেন, 'স্কুলে ভর্তি হয়ে বাড়ি এলি নে যে বড়?'

কিছু একটা বলতে চেষ্টা করেছিলাম, গলার স্বর ফোটেনি। মুখের ভেতর অবরুদ্ধ গোঙানির মত কি যেন পাক খেয়ে ফিরেছে।

কুয়োতলা থেকে পায়ে পায়ে মা এবার আমার দিকে এগুতে শুরু করেছিলেন। আমার কচি দেহের পেশীগুলো ক্রমশ আরো শক্ত হয়ে যাচ্ছিল।

এদিকে বারান্দা থেকে প্রায় লাফ দিয়ে নিচে নেমে পড়েছেন দাদু। দু-হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, 'বড় খুকি, বড় খুকি—'

আমার মা দাদামশায়ের একমাত্র সন্তান। কাজেই বড়-মেজ-ছোট বা সেজ'র কোন প্রশ্নই উঠে না। তবু ঐ নামেই দাদু তাঁকে ডাকতেন।

মা বিরক্ত নির্দয় স্বরে বলেছিলেন, 'তুমি চুপ করো তো বাবা। ওর এত বড় আস্পর্ধা আমায় না জানিয়ে চার ঘণ্টা বাইরে কাটিয়ে আসে! কত বাড় বেড়েছে, আজ দেখব।'

দাদু আমাকে বাঁচাবার জন্য আবার বলেছিলেন, 'বড় খুকি, আমার কথাটা শোন্—'

'কি আবার তোমার কথা শুনব! তুমি সরে যাও—' দাদুকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে মা আমার দিকে এগিয়ে আসছিলেন।

দাদুও অবশ্য পিছু পিছু আসছিলেন। আর বলছিলেন, 'ও নিজে যেতে চায়নি, আমিই ওকে যেতে বলেছি। অন্যায় যদি কিছু হয়ে থাকে, আমার হয়েছে। যা বলবার আমায় বল্। মারতে হলে আমায় মার।'

মা বোধ হয় দাদুর কথা আর শুনতে পাচ্ছিলেন না। আমার চোখে দৃষ্টি স্থির

নিবদ্ধ করে নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে এগিয়ে এসেছিলেন।

নিদারুণ কিছু একটা হয়ে যেত কিন্তু তার আগেই নাটকীয় ব্যাপারটা ঘটে গিয়েছিল। হীরু ছুটে এসে মায়ের একটা হাত ধরেছিল, 'মাসিমা, মাসিমা, বকুকে মারবেন না।'

আমার সঙ্গেই যে হীরু ফীটন থেকে নেমেছে, টের পাইনি। মায়ের চোখ-মুখের চেহারা এবং দাদুর সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা শুনেই চট করে সে বুঝে নিয়েছিল, আমার কান-পিঠ-গাল—এ সবের অবস্থা কি দাঁড়াবে। বুদ্ধিটা প্রখর এবং স্বভাবটা সাবলীল বলেই বোধ হয় 'মাসিমা' বলে ছুটে মায়ের হাত ধরতে পেরেছিল।

মা ততক্ষণে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। আমার দিক থেকে তাঁর চোখ গিয়ে পড়েছিল হীরুর ওপর, সে চোখে খানিক বিস্ময়, খানিক বা বিমূঢ়তা। এই অচেনা ছেলেটি কোথা থেকে এল, এলই যদি, পরম চেনাটির মত কেমন মাসিমা বলে হাত ধরেছে। বিস্ময় কিছু কাটলে মা বলেছিলেন, 'তুমি কে ?'

'আমি হীরু।'

মা এবার কি বলবেন মনে মনে সেটাই খুব সম্ভব স্থির করে নিচ্ছিলেন।

তার আগে হীরুই আবার বলে উঠেছিল, 'আমি বকুর বন্ধু, আমরা আজ একসঙ্গে স্কুলে ভর্তি হয়েছি।'

'ও, তা হলে তুমিই ওকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু নিয়ে যাবার আগে একবার বাড়ির কাউকে বলতে তো হয়।'

হীরু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিল, 'বলেছি তো।'

'বলেছ! কাকে ?' মায়ের স্বরে বিস্ময়টুকু এবার আর গোপন ছিল না।

এদিক-সেদিক তাকিয়ে উঠোনে হঠাৎ দাদুকে আবিষ্কার করে হীরু বলেছিল, 'ঐ দাদুকে।'

মা এবার হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, কিছুটা বা বিব্রত। হীরু তো আর জানে না, আমাদের ওপর কোন বিষয়েই দাদুর কোন জোর নেই। হীরু না জানুক, তার কাছে তো আর এক কথা খুলেও বলা চলে না। তাই মাকে চুপ করে থাকতে হয়েছিল।

অস্বস্তিটা কাটিয়ে উঠে মা বলেছিলেন, 'বকুর যখন বন্ধু, এসো, বসবে এসো।' বলে বারান্দায় নিয়ে একখানা মাদুর পেতে দিয়েছিলেন।

হীরু তক্ষুনি গিয়ে মাদুরে বসেছিল। আর আমি লক্ষ্য করছিলাম, মায়ের চোখেমুখে কিসের যেন ছায়া পড়েছে। নাকি ঐ ছায়াটা কোমলতারই অন্য নাম।

হীরুকে বসিয়ে মা গিয়েছিলেন ঘরে। একটু পরে বাটিতে খইয়ের মোয়া এনে তার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, 'প্রথম দিন এলে, খাও।'

মোয়া ছিল দুটো। হীরু উঠে এসে তার থেকে একটা আমাকে দিয়েছিল। বলেছিল, 'তুই একটা খা, আমি একটা খাই।'

মোয়া হাতে নিয়ে আমি কিন্তু খেতে ভুলে গিয়েছিলাম। অবাক হয়ে আড়ে আড়ে শুধু মাকেই দেখে গেছি। এ কি আমার সেই মা যাঁর চোখের তারায় সর্বক্ষণ নিষ্ঠুরতা খেলে? এ কি আমার সেই মা, কথায় কথায় যিনি আমাদের কাছে ভয়ঙ্করী।

আমার সেই বয়েসে কদাচিৎ কাউকে আমাদের বাড়ি আসতে দেখেছি। আর এলেও এমন সমারোহ করে অভ্যর্থনা করতে দেখার অভিজ্ঞতা সেই প্রথম। সেদিক থেকে হীরু ভাগ্যবান বইকি।

মায়ের চোখেমুখে রঙবদলের পালা দেখে আর তাঁর মেজাজে ঋতুবদলের আভাস পেয়ে সেদিনটার মত আমি নিশ্চিন্ত। কেননা, কান আর পিঠটা তো অন্তত একটা দিনের মত বেঁচে গেছে। আর এজন্যে যার কাছে আমি কৃতজ্ঞ সে হীরু।

খাওয়ার পর্ব তখন চলছে, মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমরা কোথায় থাকো?'

হীরু তাদের বাড়ি কোথায়, বলেছিল।

মা বলেছিলেন, 'খুব কাছেই থাকো দেখছি। তোমার বাবার নাম কী?'

'শ্রীযুক্ত বাবু সোমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।'

'তোমরা ক' ভাইবোন?'

'দুই ভাইবোন।'

হীরু আর মায়ের প্রশ্নোত্তর শুনতে শুনতে বিস্ময় আর থৈ মানছিল আমার। মাকে চিরদিনই প্রায় দেখেছি—নীরব। সারাদিনে দু-চারটির বেশি কথা কখনও বলতেন না। মানুষ মুখে যত কথা বলে চোখ দিয়ে মা তার চাইতে অনেক বেশি বলতেন। চোখ দুটি তাঁর অদ্ভুত ভাষাময় আর প্রকাশক্ষম। আশ্চর্য স্পর্শময় এক মুখরতা ছিল সে দুটির মধ্যে।

আজন্মের অভ্যাসে মায়ের দৃষ্টির ভাষা পড়তে শিখেছিলাম। কখন তিনি কি বলতে চান, তাঁর চোখের দিকে তাকিয়েই টের পেয়ে যেতাম। আশ্চর্য, আমার সেই নির্বাক চুপচাপ মাকে সেদিন যেন কথায় পেয়েছিল। হীরুর সঙ্গে কথার পর কথা বলে যাচ্ছিলেন তিনি। এতে যদি বিস্ময় না মানবো তবে আর কিসে মানবো?

মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'দু'জনের ভেতর তুমি নিশ্চয় বড়?'

হীরু ঘাড় কাত করেছিল।

হীরু তো আমাদের বাড়ি এসে বেশ জমিয়ে বসেছে। ওদিকে তার দেখি দেখে কীটনের কোচোয়ানটা এসেছিল ডাকতে। খুব সম্ভব হীরুর বাবাই তাকে পাঠিয়েছিলেন।

হীরু এক কথায় কোচোয়ানটাকে খারিজ করে দিয়েছিল, 'তুমি যাও রমজান, আমি একটু পর যাচ্ছি।'

রমজান ফিরে গিয়েছিল। আর হীরু আবার মায়ের সঙ্গে গল্পে মেতেছিল।

গল্পে গল্পে কখন যে শীতের বিকেল ক্রমশ মলিন হয়ে সন্ধ্যেটাকে ত্বরান্বিত করতে শুরু করেছিল, কারো হুঁশ নেই। এদিকে রমজান আরো বার-দুই এসে তাড়া দিয়ে গেছে। দু'বারই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে হীরু।

আমাদের সদর দরজাটা ছিল অর্ধেক খোলা। তার ফাঁক দিয়ে রাস্তার একটা অংশ দেখা যাচ্ছিল। চোখে পড়ছিল আরবী ঘোড়ার দুটো পা, কেশর, তেল-চুকচুকে লাল দেহের খানিকটা এবং কালো রঙের চমৎকার গাড়িটা।

শেষ পর্যন্ত মা-ই তাগিদ দিয়েছিলেন, 'লোকটা বার বার আসছে, তোমার বাবা অনেকক্ষণ বসে আছেন। আজ বাড়ি যাও, আরেক দিন এসো।'

'আচ্ছা।' মোয়াটা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। ঢক ঢক করে জল খেয়ে উঠোনে গিয়ে নেমেছিল হীরু। সদরের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ কি মনে পড়তে ফিরে আবার মায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল।

মা বলেছিলেন, 'কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ।'

'কী?'

'স্কুলের ছুটির পর রোজ কিন্তু বকু আমাদের বাড়ি যাবে।'

মা তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন নি। হীরুর দিকে একবার তাকিয়েই স্থির নিষ্পলক দৃষ্টি আমার মুখে এনে নিবদ্ধ করেছিলেন। অর্থাৎ হীরু যে কথাটা বলেছে আমিই তা শিখিয়ে পড়িয়ে এনেছি কিনা সেটা বুঝতে চেষ্টা করছিলেন। আর মায়ের দৃষ্টির সামনে আমার বুকের ভেতর শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসছিল। মাটিতে চোখ নামিয়ে ঘামতে শুরু করেছিলাম।

হীরু সমানে বলে যাচ্ছিল, 'ও মাসিমা, বলুন না, বকু যাবে তো? বকু রোজ যাবে তো? বেশিক্ষণ না, একটুখানি থেকে চলে আসবে।'

মা কি বলতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় সদর দরজায় দীর্ঘ ছায়া পড়েছিল। হীরুর বাবা সোমেশবাবু এসে দাঁড়িয়েছেন। খুব সম্ভব, রমজানের ওপর ভরসা রাখতে পারেন নি বলেই স্বয়ং তাঁকে আসতে হয়েছে।

হীরুর বাবা দরজার কাছ থেকে ডাক দিয়েছিলেন, 'কি রে, বাড়ি যাবি না ? সেই কখন এসেছিস, আর বেরুবার নাম নেই। বন্ধুদের বুঝি খুব ভাল লেগে গেছে !' বলে সস্নেহে হেসেছিলেন।

সোমেশবাবুর গলার আওয়াজ পেয়ে মা তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টেনে দিয়েছিলেন। হীরু কিন্তু তার বাবার দিকে ফিরেও তাকায় নি। একটানা নিজের কথাই বলে যাচ্ছিল, 'ও মাসিমা, আপনি একবার শুধু বলুন, বকু যাবে।'

কেমন করে কে জানে হীরু টের পেয়ে গিয়েছিল, মায়ের হাতেই রয়েছে আমার সব কিছু—আমার স্বাধীনতা, আমার গতিবিধি, আমার জীয়নকাঠি-মরণকাঠি। ওখান থেকে একবার অনুমতিটা যদি আদায় করে নেওয়া যায় তা হলেই নিশ্চিন্ত। তার ওপর আর কারো কথা চলবে না।

সোমেশবাবু ছেলের কথার ধরন এবং মাথা ঝাঁকানি দেখেই বুঝেছিলেন, কিছু একটা ঘটেছে। খানিক শঙ্কিত ভঙ্গিতে বলেছিলেন, 'ও কি, ও রকম অসভ্যতা করছিস কেন ? কী হয়েছে ?'

ঘোমটার তলা থেকে মা আস্তে আস্তে বলেছিলেন, 'ও কিছু না, ছেলেমানুষ, একটা কথা বলছে। আপনি ভেতরে আসুন।'

দাদু অপার বিস্ময় নিয়ে আগাগোড়া মায়ের রূপান্তরটা দেখে যাচ্ছিলেন। মায়ের কথা শেষ হতে না হতেই কর্তব্যটা যেন মনে পড়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি সদরের দিকে দু-পা এগিয়ে বলেছিলেন, 'আরে ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ? দয়া করে এসেছেন যখন ভেতরে আসুন—'

সোমেশবাবু অবশ্য ভেতরে আসেন নি। চৌকাঠের ওপার থেকেই বলেছিলেন, 'আজ আর যাব না, অন্য জায়গায় একটু দরকার আছে, এখুনি সেখানে যেতে হবে।' বলে হীরুকে আবার ডেকেছিলেন, 'চলে আয়।'

মা বলেছিলেন, 'তাই কখনো হয়। প্রথম দিন এলেন, একেবারে দরজা থেকেই চলে যাবেন। ভেতরে না এলে আমাদের কিন্তু খুব খারাপ লাগবে।'

দুই হাত জোড় করে সোমেশবাবু বলেছিলেন, 'আজকের দিনটা আমায় ক্ষমা করে দিন। একই রাস্তায় তো থাকি। অন্য একদিন নিশ্চয়ই আসব।' বলে হীরুকে তাড়া দিয়েছিলেন, 'আর দেরি করিস না বাবা, আমাকে সারদা উকীলের ওখানে একবার যেতে হবে। ভদ্রলোক আমার জন্যে বসে থাকবেন।'

হীরু গ্রাহ্যই করেনি। আমার মায়ের একটা হাত ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সে বলে যাচ্ছিল, 'আপনি তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন না মাসিমা।'

'কী বলবেন উনি ?' ঈষৎ উদ্বিগ্ন স্বরেই জানতে চেয়েছিলেন সোমেশবাবু।

হীরুর জবাবটা মা-ই দিয়েছিলেন, 'ও চায় স্কুলের পর বকু রোজ আপনাদের বাড়ি যাবে। আমি যেন বকুকে যেতে দিই।'

বিব্রত হেসে সোমেশবাবু বলেছিলেন, 'নিজের ছেলে তো, ওকে আমি ভালই চিনি। একবার যে জেদ ধরবে তা করে ছাড়বে। বলতে আমার খুব সঙ্কোচ হচ্ছে, তবু না বলে উপায়ও নেই। দয়া করে ওর এই আবদারটা আপনাকে রাখতেই হবে। নইলে আমাদের রক্ষা নেই।'

দূরে দাঁড়িয়ে অনুভব করছিলাম, ঘোমটার আড়ালে মায়ের মুখটা কঠিন হয়ে উঠেছে। নীরস স্বরে তিনি বলেছিলেন, 'কিন্তু—'

'বলুন—'

'আমি খুবই গরীব। আমার বড় ভয়, বকুটা—' এই পর্যন্ত বলে মা হঠাৎ থেমে গিয়েছিলেন।

একদৃষ্টে মায়ের ঘোমটায়-ঢাকা মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন সোমেশবাবু। তাঁর মুখে ঢেউয়ের মত পর পর কতকগুলো কি যেন খেলে গিয়েছিল। তারপর সসম্ভ্রমে তিনি বলেছিলেন, 'আমার বাড়ি ছেলে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আপনার কোন ক্ষতি হবে না।'

'বেশ, রোজ স্কুল ছুটি হলে বকু আপনাদের বাড়ি যাবে।'

'আপনি আমায় বাঁচালেন।'

সেদিন আমার হাতে মুক্ত পৃথিবীতে পা বাড়াবার সনদ তুলে দিয়ে হীরু তার বাবার সঙ্গে চলে গিয়েছিল। ওরা যাবার পর মায়ের মাথা থেকে ঘোমটাটা আস্তে আস্তে খসে গিয়েছিল। লক্ষ্য করেছিলাম, মা আমাদের কারো দিকে তাকান নি, তাঁর মুখের কোন প্রান্তে চিরদিনের-চেনা কঠোর রেখাগুলিকে আর দেখতে পাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছিল কঠিন বরফের মত তাঁর জমাট-বাঁধা অস্তিত্বের স্তূপ খানিকটা গলে গেছে।

অন্যমনস্কের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একসময় ঘরের ভেতর চলে গিয়েছিলেন মা। আর দাদু আমার কাছে এসে কানের ভেতর ফিসফিসিয়ে উঠেছিলেন, 'হীরুটা ম্যাজিক জানে রে, ওকে রোজ নিয়ে আসবি।' দাদুর চোখ দুটো চকচক করে উঠেছিল।

চার

মনে আছে, পরের দিন থেকে ছিল স্কুল। কথামত স্কুল ছুটির পর হীরু আমাকে রোজ তাদের বাড়ি নিয়ে যেতে শুরু করেছিল। যেতে যেতে অবশেষে হীরুদের

বাড়ি যাওয়াটা রোজকার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

আমার কিন্তু ভারি লজ্জা লাগত। চিরদিনের ভীরুতা আর সঙ্কোচের শক্ত মলাটের ভেতর আমার স্বভাবটাকে পুরে কেউ বুঝি 'শীল' করে রেখেছিল। হীরুরা সেই মলাট ভেঙে আমাকে দুর্বার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইত কিন্তু পারতাম না। প্রতি পদক্ষেপে কুণ্ঠাটা বুকের ভেতর কাঁটার মত বেজে যেত। সেটা পুরোপুরি জয় করা আমার অসাধ্য।

হীরুদের বাড়ি যাবার ব্যাপারে মায়ের যে খুব একটা ইচ্ছা ছিল তা নয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও হীরুর আবদারে আর তার বাবার অনুরোধে অনুমতি দিয়েছিলেন। মনে পড়ে, রোজ হীরুদের বাড়ি থেকে ফিরে এলে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতেন মা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন, বড়লোকের সঙ্গে থেকে কোন অসম্মান, অগৌরব অথবা বিপজ্জনক কোন পরিবর্তন সারা গায়ে লিখে এনেছি কিনা। মা নিষ্ঠুর ছিলেন, নির্মম ছিলেন, তবু তাঁর জগৎখানি ছিল আমাদেরই ঘিরে। আর আমার জগৎ ছিল এতকাল মাকে ঘিরে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মা যেন আমার অস্তিত্বের সকল দিকে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিলেন। হীরুদের পেয়ে আমার পৃথিবীর পরিধি বিস্তৃত হতে শুরু করেছিল। সত্যিই করেছিল কি?

জীবনের শেষ পর্বে পৌঁছে এখনও তো আমার মনে হয় যা-ই করি, যা-ই বলি অথবা যেখানে যত দূরেই যাই না কেন—মায়ের দৃষ্টির বাইরে যাবার উপায় নেই। আমার সব চলা, সব বলা এবং সমস্ত গতিবিধির অদৃশ্যে থেকে প্রতি মুহূর্তে তিনি নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন।

সঙ্কোচ-ভীরুতা-লজ্জা-যা-ই থাক, হীরুদের বাড়ি না গিয়ে কিন্তু পারতাম না। মাধ্যাকর্ষণের মত দুরন্ত টানে তিন দিক থেকে হীরুরা আমাকে ক্রমাগত টানতে থাকত। তিন দিকের এক প্রান্তে ছিল হীরু। হীরুর মত প্রাণবন্ত উজ্জ্বল ছেলে জীবনে আর কখনও দেখিনি। বড় হয়ে 'ফলেন এ্যাঞ্জেলে'র কাহিনী পড়েছি। সে ছিল তা-ই। রূপে-স্বাস্থ্যে-কথায়বার্তায় সপ্রতিভ, শাণিত। যেন দুরন্ত এক দেবদূত। যতক্ষণ ওদের বাড়ি থাকতাম খেলায়-ধুলোয় ছুটোছুটি আর হল্লোড়ে আমাকে একেবারে মাতিয়ে রাখত। আমার মত দুর্বল, ক্ষীণপ্রাণ, কুণ্ঠিত এক মানুষের সঙ্গে কিভাবে যে তার বন্ধুত্ব ঘটেছিল—সেটাই আমার ছেলেবেলার পরম বিস্ময়কর ঘটনা।

আমার আকর্ষণের দ্বিতীয় প্রান্তে ছিল নলিনী অর্থাৎ ঝুলন। মনে পড়ে এক বছর যাতায়াতের পরও ঝুলনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বটা পাকা হয়নি। পাকা দূরের কথা, কিছুই হয়নি। একটা বছরে তার সঙ্গে ক'টা কথা বলেছি তা-ও বোধ হয় আঙুলে গোনা যায়।

প্রথম দিনটির মতই দু-চোখে সংশয় মেখে আমাকে দেখত ঝুলন। হীরুর সঙ্গে যখন আমি খেলায় মগ্ন, সে এসে হানা দিত। তখনও তার চোখে সেই গোয়েন্দার দৃষ্টি। অর্থাৎ আমাকে যাচাই করা তখনও তার শেষ হয়নি। ঐটুকুন মেয়ের ঐরকম দৃষ্টির সামনে আমার অস্বস্তি লাগত, উসখুস করতাম। মনে হত, ঝুলন যেন আমার ওপর খুবই বিরূপ, তাদের বাড়ি রোজ যে যাই সেটা বোধ হয় তার না-পছন্দ।

বিরূপতা থাক আর সংশয় থাক তবু ঝুলনকে ভাল লাগত। কেন লাগত, তার কারণ সেই বয়েসে বুঝবার নয়। ভাল লাগাটা ছিল আমার সজ্ঞান মনের অনেক স্তর নিচে, অবচেতনের অতলে। কিন্তু সে কথা পরে—অনেক পরে।

আমার আকর্ষণের তৃতীয় প্রান্তে ছিলেন হীরুর মা এবং বাবা।

ছেলেবেলায় হীরুদের বাড়ি যাবার আগে আমার জগৎটি ছিল খুবই ছোট। ফলে হাত-পা মেলে ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে বেড়াতে পারতাম না। কিন্তু আরেক দিকে আমার পৃথিবী বড় হতে শুরু করেছিল। সেটা আমার মন। সেখানেই ছিল আমার ওঠাবসা, চলাফেরা, খুশিমত ডানা ছড়িয়ে দেওয়া। কাজেই প্রতিদিন সেই পৃথিবীটার দিগন্তগুলি একের পর এক আমার কাছে খুলে যাচ্ছিল।

ছেলেবেলায় বয়েসের তুলনায় আমি অনেক বেশি বুঝতে পারতাম, মনটা তখনই অদ্ভুত রকমের তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল।

মনে আছে, আমার অস্তিত্বের একটি অংশ যখন হীরুর সঙ্গে খেলায় মগ্ন আরেকটি অংশ তখন নির্নিমেষে হীরুর মা-বাবার দিকেই তাকিয়ে আছে।

লক্ষ্য করেছি, হীরুর মা-বাবার ভেতর আশ্চর্য রকমের মিল। হীরুর বাবা কী করতেন তখন জানতাম না। পরে অবশ্য জেনেছি নদীয়া জেলায় ওঁদের জমিদারি ছিল। সেখান থেকে বার্ষিক মোটা টাকা আসত।

দেখেছি হীরুর বাবা সর্বক্ষণ বাড়িতে থাকতেন। যখনই গেছি, চোখে পড়েছে, হীরুর বাবা আর মা পাশাপাশি বসে আছেন।

হীরুর মা ছিলেন আশ্চর্য রূপসী। গায়ের রঙখানি টুকটুকে ফর্সা। ঠিক সাদা নয়, স্বর্ণাভ। কোমর ছাপানো দীর্ঘ চুল। গলায়-গালে-বাহুসন্ধি এবং কটিতে বয়েসের কিছু পলি জমেছিল, তবু সবই প্রায় নিখুঁত। পরতেন ফরাসডাঙার জলচুড়ি-দেওয়া চওড়া পাড়ের শাড়ি আর তসরের ব্লাউজ। নিটোল হাতে সোনার চুড়ি, গলায় সীতাহার, কানে হীরের ফুল, নাকে মুক্তোর নাকছাবি। কপালে পানপাতার মত করে সিঁদুরের টিপ দিতেন। তাঁর রূপের খ্যাতি ছিল বিবিবাজারের ঘরে ঘরে।

হীরুর বাবা রূপের দিক থেকে অতখানি না হলেও বেশ সুপুরুষ। গায়ের রং অবশ্য বেশ চাপা। পরনে থাকত কুঁচনো মিহি ধুতি, পায়ে মসমসে পাম্প-শু,

ধুতির প্রান্ত তার ওপর লুটোত। পাঞ্জাবি পরতেন গরদের, কোনদিন বা গিলে-করা আদ্দির। হীরের বোতাম, পান্নার আংটি, সোনার ব্যাণ্ডে-বাঁধা দামী ঘড়িতে তাঁকে রাজসিক মনে হত।

হীরুর বাবা-মা সম্বন্ধে প্রবাদের মত দুটি শব্দ বিবিবাজারে চালু ছিল। কেউ বলত 'চখাচখি,' কেউ বলত কপোত-কপোতী'। সেই শৈশবে শব্দগুলোর অর্থ বুঝতে পারতাম না। তবে অনুমান করতাম, তাঁদের দু'জনের মধ্যে যে খুব ভাব, ঐ শব্দগুলো সেটাই যেন প্রাণ খুলে বোঝাতে চায়।

হীরুদের বাড়ি গেলে তার মা-বাবাকে শুধু পাশাপাশি বসে থাকতেই দেখতাম না। দু'জনেই খুব হাসিখুশি আর প্রাণোচ্ছল। প্রচুর হাসতে আর গল্প করতে পারতেন। হীরুর বাবার মাত্রাজ্ঞানটা স্বাভাবিক ছিল না। ছেলেমেয়েদের সামনেই খুনসুটি শুরু করে দিতেন। কখনও খোঁপা ভেঙে দিতেন, কখনও চিবুক ধরে ঝাঁকিয়ে দিতেন, কখনও বা গালে টুসকি দিতেন। হীরুর মা প্রায়ই উল বুনতেন। কতবার যে হঠাৎ টানে বোনা ঘর খুলে যেত তার হিসেব নেই।

জ্বালাতনটা মাত্রাছাড়া হয়ে গেলে হীরুর মা চোখ পাকিয়ে উঠতেন, 'এ্যাই—

'কী?' নিপাট ভালমানুষের মত মুখ করে তাকাতেন সোমেশবাবু।

'বয়েস হচ্ছে না?'

'হচ্ছে নাকি?'

'বুঝতে পারছ না?'

'না তো।'

'তা কেন পারবে। লজ্জা টজ্জাগুলো একেবারে ধুয়ে খাচ্ছ।' চোখ পাকিয়েই থাকতেন হীরুর মা কিন্তু রাগটা যে নিতান্তই কপটতা সেটুকু বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়।

হীরুর বাবা আরো প্রগলভ হয়ে উঠতেন। আরো এগিয়ে নিবিড় হয়ে বলতেন, 'লজ্জাশরম কি আজকে খাচ্ছি, তোমায় যেদিন দেখেছি সেদিনই তো খেয়ে বসে আছি।' তারপরেই গলা নামিয়ে সুর করে গেয়ে উঠতেন, 'তোমার লাগি মাথায় নিলাম কলঙ্কেরই ডালা—'

হীরুর মা বিব্রতমুখে ধমকে উঠতেন, 'আঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না। থামো।' তাঁর গলায় যতখানি শাসন ঠিক ততখানিই অনুরাগ।

হীরুর বাবা বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হতেন না। গান অবশ্য থামিয়ে দিতেন কিন্তু হাসতে থাকতেন।

কোনদিন বা বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ স্ত্রীর হাত ধরে বাঁই বাঁই করে ক

সোমেশবাবু বলতেন, 'শুধু শুধুটা দেখলে কোথায় ? আমার ইচ্ছে হয়েছে তাই সাজবে, আমি দেখব তাই সাজবে। যাও, আর দেরি না করে তাড়াতাড়ি ওগুলো পরে এসো।'

'আর পারি না বাবা।' সত্যিই যেন কত অনিচ্ছা আর কাজটা যেন কত দুঃসাধ্য—এমন একটা ভঙ্গি করে অথচ পায়ে পায়ে ইচ্ছা আর খুশির লহর তুলে হীরুর মা সাজতে চলে যেতেন।

কতদিন যে স্ত্রীকে নিজের ইচ্ছামত সাজতে বলে সামনে বসিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সোমেশবাবু দেখেছেন তার বুঝি লেখাজোখা নেই।

মনে পড়ে, দুরন্ত এক আকর্ষণে দু'টি সুখী পরিতৃপ্ত বয়স্ক পারাবত আমাকে—সেদিনের সেই অবোধ বালকটিকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতেন।

হীরুর মা-বাবা যেখানে বসে বসে গল্প করতেন, হীরুর সঙ্গে খেলতে খেলতে কত-দিন যে আচ্ছন্নের মত সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, খেয়াল থাকত না। হীরু যদি খেলার জন্য ডেকে নিয়ে যেত, কোন এক ছলে আবার ফিরে আসতাম। নির্নিমেষে তাকিয়ে দুটি মুগ্ধ বিভোর আনন্দময় নরনারীর হাসি-গল্প-কৌতুকের ছটায় প্রাণ ভরিয়ে নিতাম।

নিজেদের মধ্যে হীরুর বাবা-মা এমনই মগ্ন থাকতেন যে কোনদিকেই প্রায় লক্ষ্য থাকত না। কদাচিৎ যদি তাঁদের সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যেত স্নিগ্ধ স্বরে বলতেন, 'কি রে, অমন করে কী দেখছিস ?'

উত্তর দিতাম না, চোখও ফেরাতাম না। অপলকে তাকিয়েই শুধু থাকতাম।

হীরুর বাবা-মায়ের এত হাসি-গল্প-খেলা—এ সবই মধুর দাম্পত্য লীলা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার মাধুর্য, প্রীতি আকর্ষণ—আগে কি আর কখনও দেখিনি ? দেখেছি বৈকি।

রাস্তার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পাড়ি জমাবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। নিজেদের বাড়িতে দাদামশায় দিদিমার মধ্যেই তো সেই মাধুর্য ছিল। চলতে ফিরতে আমার চোখে তা পড়ত, আমার কানে তার সুর বেজে যেত। তবু তার মধ্যে একটা 'কিন্তু' ছিল।

দাদামশায়-দিদিমার দাম্পত্য-লীলার ভেতর আড়াল ছিল, গোপনতা ছিল। পরস্পরের প্রতি তাঁদের আকর্ষণটা যাতে মায়ের চোখে না পড়ে সে জন্যে সর্বক্ষণ তাঁরা সতর্ক থাকতেন। তাই দু'জনে লুডো খেলতে বসতেন দরজায় খিল দিয়ে, দাদামশায় দিদিমার চুল বেঁধে দিতেন মধ্যরাতে যখন সবাই ঘুমে ডুবে থাকত।

কিন্তু দাদু-দিদিমার মত লুকোচুরি নেই হীরুর বাবা-মায়ের মধ্যে। পাখির

গানের মত কিংবা দিনের আলোর মত অথবা ঝর্ণার কলধ্বনির মত তা অবাধ, স্বচ্ছন্দ, সাবলীল।

হীরুর বাবা-মাকে দেখতে দেখতে বিচিত্র এক ঘোরের মধ্যে বার বার আমার নিজের মা-বাবার কথা মনে পড়ে যেত। সেই বয়েসে বাবা সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। বাবাকে তখনও পর্যন্ত দেখেছি কিনা মনে নেই।

ক্রমাগত আমার শুধু মনে হত, বাবা কেন আমাদের কাছে থাকেন না? আর থেকে হীরুর বাবার মত মায়ের পাশে বসে হাসিতে-গল্পে-কৌতুকে-খুনসুটিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন না? হে ঈশ্বর, কেন আমার বাবা-মা হীরুর মা-বাবার মত নন? হে ঈশ্বর! যত ভাবতাম ততই অত্যন্ত কষ্টদায়ক এক যন্ত্রণা আমার শ্বাস রুদ্ধ করে আনত।

পাঁচ

স্মৃতি নামে যে পাহারাদারটির বাস মনে সে বোধ হয় পাকা নকলনবীশ নয়। অন্তত আমার বেলায় তো বটেই। সাল তারিখ দিয়ে সব হিসেব সে ঠিক ঠিক টুকে রাখেনি। রাখলে খেই মেলাতে আর ঘটনার সুতো জুড়তে সুবিধেই হত। তাতে আমার জীবনের ক্রমিক ইতিহাসটা পাওয়া সহজ হত। কিন্তু তা আর সম্ভব নয়।

এতকাল পর জীবনের অন্ত প্রান্তে পৌঁছে যখন পেছন ফিরেছি তখন কোন ঘটনাটা আগে কোনটা পরে—বুঝে উঠতে পারছি না। সুদূর ধূসর সেই অতীতে সব কিছুই একাকার হয়ে আছে। সে জট খোলা আমার অসাধ্য।

যতদূর মনে করতে পারছি, স্কুলে ভর্তি হওয়া আর হীরুদের বাড়ি যাবার সনদ পাওয়া, এই দু'টি ব্যাপারের পর একটা বিরাট ঘটনা আমার ছেলেবেলাটাকে ঢেউ-এর দোলায় মোচার খোলার মত দুলিয়ে গিয়েছিল। বাবা এসেছিলেন সেবার। সজ্ঞানে বাবাকে আমার সেই প্রথম দেখা।

মনে আছে, পুজোর ছুটির পর সবে স্কুল খুলেছে। ক্লাসে বা বাড়িতে পড়াশোনার জন্যে তেমন তাড়া নেই। ছুটির আলসেমির রেশটা তখনও যেন চারিদিকে বেজে চলেছে। কোথাও একটা ঢেউ না তুলে, কোথাও আলোড়ন না জাগিয়ে ঢিমে তালের দিন তিরতিরিয়ে বয়ে যাচ্ছে।

কার্তিক মাসের শেষাশেষি। অর্থাৎ হেমন্তের মাঝামাঝি সেই সময়টায় আমাদের ছোট্ট অর্বাচীন শহরটায় শীতের মহড়া শুরু হয়ে গিয়েছিল যেন। তিরিশ পঁয়তিরিশটা দিন পরে পৌষ মাস, কিন্তু তার কত আগেই হিমঝরা রাতেরা এসে গিয়েছিল। গাঢ় সাদা ধোঁয়ার মত দিগন্ত ঘিরে কুয়াশা অনড় হয়ে থাকত। তার ওপাশে

আকাশ দেখা যেত না, তারা দেখা যেত না, চাঁদ উঠলে ঘোলাটে আচ্ছন্নতা চারিদিক কুহকিত করে রাখত।

মনে পড়ে, সেদিন তাড়াতাড়িই খেয়ে দেয়ে আমরা শুয়ে পড়েছিলাম। একঘরে থাকতাম আমি, মা আর ছোট দুটো ভাইবোন। অন্য ঘরে দাদু-দিদিমা।

তখনও আমার ঘুম আসেনি, তন্দ্রার মত একটা ঘোর চেতনার ওপর সন্তর্পণে মিহি পর্দা টেনে দিচ্ছিল। ক্রমশ অতলগভীর নিশ্চিন্ততার মধ্যে একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছিলাম। ঠিক সেই সময় বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গিয়েছিল।

প্রথমটা আস্তে, কুন্ঠিত ভঙ্গিতে। তারপরেই আওয়াজটা জোরালো হয়ে উঠেছিল। নিমেষে তন্দ্রা ছুটে গিয়েছিল আমার।

মাকেই বোধ হয় ডাকতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার আগে পাশের ঘর থেকে দাদুর গলা শোনা গিয়েছিল, 'কে ?'

বাইরে থেকে পুরুষের গলা ভেসে এসেছিল, 'এটা কি রমণীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি ?'

'হ্যাঁ। আপনি কোত্থেকে আসছেন ?'

'দরজা খুলুন। আমি।' আগন্তুক কি একটা নাম বলেছিলেন, বুঝতে পারিনি।

টের পেয়েছিলাম, পাশের ঘরে দাদু ধড়মড় করে উঠে পড়েছেন, বোধ হয় দিদিমাও। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় খিল খোলার শব্দ। ভেতর থেকে সদর দরজায় তালা লাগানো থাকত। একটু পর তালায় চাবি ঘোরাবার এবং ছিটকিনি খোলার আওয়াজ ভেসে এসেছিল।

শুয়ে শুয়ে আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছিলাম, বিদ্যুৎরেখায় মা বিছানায় উঠে বসেছেন। কিন্তু ঐ বসা পর্যন্তই, তারপর একেবারেই নিশ্চল, অনড়। অন্ধকারে তিনি আর কী করছিলেন, তাঁর চোখে মুখে কোন ভাবের ঢেউ খেলে যাচ্ছিল, দেখতে পাচ্ছিলাম না। অথচ মায়ের মুখখানা দেখবার জন্যে আমার ছোট্ট বুকটা তখন উথলপাথল হয়ে উঠেছিল।

ক'টা মুহূর্ত কেটেছিল, আঙুল গুনে বুঝি বলা যায়। তারপরেই ব্যস্ত গলায় দাদুর ডাক শোনা গিয়েছিল, 'ওরে তোরা সব ওঠ্—বড় খুকি, দাদাভাই—জামাই এসেছে। কোথায় গেলে, আলোগুলো জেলে দাও—' শেষের ডাকটি দিদিমার উদ্দেশে।

খুট খুট করে সুইচ টেপার শব্দ শোনা গিয়েছিল। শুয়ে শুয়েই বুঝতে পারছিলাম, আমাদের ঘরের বাইরেটা আলোয় আলোয় ভরে গেছে।

লক্ষ্য করেছি, মা কিন্তু তখনও বিছানার একপাশে বসে ছিলেন। উঠে গিয়ে

দরজা খোলার কোন লক্ষণই তাঁর ছিল না।

এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন দাদু। দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে বলেছিলেন, 'এই তো সবে শুলি, এর ভেতর ঘুমিয়ে পড়েছিস! কি ঘুম রে বাবা! ওঠ-ওঠ্—'

আরো কিছুক্ষণ বসে থেকে আস্তে উঠে গিয়ে দরজা খুলেছিলেন মা। কোনরকম তাড়া বা আগ্রহ যে আছে, দেখে তা মনে হচ্ছিল না। বরং এ ব্যাপারে তিনি যে একেবারে আগ্রহশূন্য, নিস্পৃহ—তাঁর ধীরতা এবং উপেক্ষা দেখে তা-ই মনে হচ্ছিল।

দরজা খুলে দিতেই দাদু ঘরে ঢুকে বোতাম টিপে আলো জ্বালিয়েছিলেন। তারপর আমাকে ডেকেছিলেন, 'দাদাভাই—দাদাভাই—' ডেকে কাছে এসে গায়ে হাত দিয়েছিলেন।

আমি তো জেগেই ছিলাম। দাদুর ছোঁয়া লাগতেই তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে পড়েছিলাম।

আমাকেই শুধু দাদু ডেকেছিলেন। ছোটো ভাইবোন দুটো তখন গভীর ঘুমে; তাদের আর জাগান নি।

দাদুর সঙ্গে বাইরে এসে দেখেছি একটি দীর্ঘকায় পুরুষ ঝুঁকে দিদিমাকে প্রণাম করছেন। দিদিমার পর তিনি দাদুকে প্রণাম করেছিলেন। দাদু তাঁর মাথার হাত রেখে আশীর্বাদের সুরে বলেছিলেন, 'বেঁচে থাকো বাবা, দীর্ঘজীবী হও।'

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে আমি আগন্তুকটিকে দেখছিলাম। বিস্ময়ের কারণটা আমার খুব সামান্য নয়। সেই ছেলেবেলায়, তখন পর্যন্ত, এমন করে আমাদের বাড়িতে কাউকে আসতে দেখিনি। মধ্য রাতের সেই অতিথি কে, তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী এবং কতখানি গভীর সেটুকু বুঝতে পারছিলাম না। তবে দাদুর ছোটাছুটি আর ব্যস্ততা দেখে মনে হচ্ছিল, আমাদের সংসারে এই মানুষটির জন্য আদর আর সম্মানের সিংহাসন পাতা।

জুল জুল করে তাকিয়েই ছিলাম। দাদুকে প্রণাম করে উঠতেই তাঁর সঙ্গে আমার চোখোচোখি হয়ে গেছে। স্থির চোখে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ছেলেটি কে?'

এবার দিদিমা এগিয়ে এসেছিলেন, 'তোমার ছেলে—বকু। ভাল নাম চিরন্তন। অনেক দিন তো দেখনি, তাই ভুলে গেছ।' আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'তোর বাবা, প্রণাম কর।'

এই আমার বাবা! বাবার বর্ণনা তো আগেই দেওয়া আছে। তবু আবার বলি, এলোমেলো অবিন্যস্ত চুলে কতকাল যে যত্নের ছোঁয়া পড়েনি, মুখ ভর্তি মাসখানেকের দাড়ি-গোঁফ, তার মধ্যে উজ্জ্বল স্বপ্নময় দুটি চোখ। সে চোখ দুটি যেন

এ জগতের নয়। সে বয়েসটা চোখের মর্ম বুঝবার বয়েস নয়। তবু চারিদিকে যত চেনা চোখের মেলা ছিল তাদের সঙ্গে এ দুটি যেন মেলে না। এ দুটির ছাঁদই আলাদা, চাউনি আলাদা, ভাষা আলাদা।

দিদিমার নির্দেশে যন্ত্রবৎ বাবার পায়ের দিকে ঝুঁকতে গিয়েই টের পেয়ে গিয়েছিলাম তাঁর দুই বিশাল বাহুর ভেতর বন্দী হয়ে গেছি। বাবা বলেছিলেন, 'এত বড় হয়ে গেছে খোকা, এত বড়! আমি ভাবতেই পারিনি।'

দিদিমা বলেছিলেন, 'কি করে পারবে বল। তুমি তো আর খোঁজখবর নাও না।' তাঁর কথায় অনুযোগের সুর ছিল।

বাবা চুপ। মুহূর্তে সমস্ত বাড়িটায় রুদ্ধশ্বাস স্তব্ধতা নেমে এসেছিল।

অস্বস্তিকর অবস্থাটা শেষ পর্যন্ত দাদুই কাটিয়ে দিয়েছিলেন। বিব্রত ব্যস্তভাবে দিদিমাকে বলেছিলেন, 'আঃ, ওসব কথা থাক। এতকাল পর এই সবে এল, এখনও বসে নি পর্যন্ত। হাত-পা ধুতে দাও, বিশ্রাম করতে দাও। তা নয়, বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে উত্যক্ত করে তোলা।'

দিদিমা লজ্জা পেয়ে গিয়েছিলেন। চোখ নামিয়ে খুব আস্তে সস্নেহ কোমল সুরে এবার বাবাকে বলেছিলেন, 'কিছু মনে করো না বাবা, বুঝতেই পারছ আমার মাথার ঠিক নেই। যাও, একটু জিরিয়ে নাও।' বলে বারান্দার এক কোণে ইজি চেয়ার পেতে দিয়েছিলেন।

আমাকে বুকের ভেতর ধরেই নিঃশব্দে বাবা গিয়ে ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছিলেন।

দাদু বলেছিলেন, 'তুমি একটু বসো মাধব, আমি জেলে পাড়া থেকে ঘুরে আসছি। এক্ষুনি এসে পড়ব। দেখি যদি কিছু মাছ-টাছ পাই।'

বাবা বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন, 'না—না, এত রাত্তিরে কষ্ট করে আপনাকে কোথাও যেতে হবে না। ঘরে যা আছে তাতেই চলে যাবে। তা ছাড়া খিদেও আমার তেমন নেই। আসবার সময় শিয়ালদায় পুরীটুরী খেয়ে এসেছি। আপনি যাবেন না।'

দাদুকে আটকানো যায়নি। বলেছিলেন, 'এ্যাদ্দিন পর এলে। একটু মাছ না হলে—' বলতে বলতেই হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠেছিলেন, 'বড় খুকি—বড় খুকি গেল কোথায়? ঘর থেকে এখনও বেরুতে পারছিস না? ক'বছর পর ছেলেটা এল!' বলে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

মা কিন্তু বাইরে আসেন নি। ঘর আর বাইরের মাঝখানের সীমানা যে চৌকাঠটি সেখানে নিশ্চল দাঁড়িয়ে ছিলেন। কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টানা। বাবার

কোলের ভেতর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম, ঠোঁটদুটি তাঁর শক্তবদ্ধ, চোখ দুটি কেমন যেন সজল, দৃষ্টিটা কিন্তু জলন্ত। ফলে চোখ দুটি ভেজা আগুনের মত মনে হচ্ছিল।

দিদিমা মেয়ের কাছে গিয়ে বলেছিলেন, 'বড় খুকি, তুই মাধবের কাছে যা, কথা বল্। আমি উনুন ধরিয়ে আসছি।'

উনুন ধরিয়ে ফিরে এসে দিদিমা দেখতে পেয়েছিলেন মা একইভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। মেয়ের দিকে তাকিয়ে কি বুঝেছেন তিনিই জানেন, আর কিছু বলেন নি। নিজেই বাবার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

এদিকে বাবা আমার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছেন। বলেছিলেন, 'এখন কি পড়ছিস খোকা? ক, খ, অ, আ শিখেছিস?'

বাবার কথা শুনে হেসে ফেলেছিলাম। এত বড় হয়েছি, স্কুলে ভর্তি হয়েছি, কত কত বই পড়তে হয় আর বাবা জানতে চাইছিলেন আমার বর্ণপরিচয় হয়েছে কিনা। আমার হয়ে দিদিমা বলেছিলেন, 'ওসব তো কবেই শিখেছে। ক্লাস টু-তে পড়ছে। এই তো বচ্ছরের পরীক্ষা এসে গেল। এবার থ্রী-তে উঠবে।'

আমার বাবা, তবু এই অপরিচিত মানুষটির বুকের ভেতরে থেকেও আড়ষ্টতা আমার কাটছিল না। জড়ানো স্বরে বলেছিলাম, 'আমি নীতিসুধা পড়ি, রামায়ণ পড়ি—'

'তাই নাকি!' বাবা আমার দিকে চোখ বড় করে তাকিয়ে ছিলেন, তাতে বিস্ময় ঝলকাচ্ছিল।

'শটকে, কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া, বুড়িকিয়া, কুড়ি ঘর পর্যন্ত নামতা—সব আমার মুখস্থ।'

'বল কি!'

উৎসাহ পেয়ে আরো বিদ্যে জাহির করেছিলাম, 'হাত-পা-মাথা, পশু-পাখি-বালক —সব কিছুর ইংরিজি জানি। ওয়ান থেকে হানড্রেড পর্যন্ত বলতে পারি।'

'বটে, বটে।' বাবা বলেছিলেন, 'তবে তো মস্ত বিদ্বান হয়ে উঠেছ। আর আমি বলছি, ক, খ, শিখেছ কিনা! ছিঃ ছিঃ—'

দিদিমা পাশ থেকে বলেছিলেন, 'বকু লেখাপড়ায় খুব ভাল হয়েছে।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ। ছ-মাসের পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে।'

'আচ্ছা!' প্রশংসার চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বাবা বলেছিলেন, 'তা হলে তো বকুবাবুকে একটা কিছু দিতে হয়। কি দেওয়া যায় বল তো?' বলে এদিক সেদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি জান

হাতের আস্তিনটা কনুইর ওপর পর্যন্ত গুটিয়ে সোনার একখানা তাবিজ বার করে আমার হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন।

অত বড় তাবিজ কখনও আমার সরু রোগা হাতে খাপ খায়? কাজেই খুব ঢল ঢল করছিল। বাবা সেটা খুলে হেসে ফেলেছিলেন, 'তুই বড্ড রোগা খোকা। এখন এটা হবে না। বড় হলে পরিস। এখন রেখে দে।'

হাতের মুঠোয় তাবিজটা নিয়ে বাবার কোলে আমি বসে ছিলাম। বাবার কাছ থেকে কোন উপহার পাওয়া আমার সেই বোধ হয় প্রথম, সম্ভবত শেষও। জীবনের শেষ পর্বে পৌঁছে সেই তাবিজটা আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে আছে। কনুইর একটু ওপরে সেটা বেঁধে রেখেছি।

আরো কিছুক্ষণ একথা-সেকথার পর দাদু ফিরে এসেছিলেন। তাঁর হাতে ঝোলানো প্রকাণ্ড একটা রুই মাছ।

যেন দিগ্বিজয় করে এসেছেন, এমন ভঙ্গিতে মাছটা একবার তুলে ধরেছিলেন দাদু। বুকটা টুকটুকে লাল, শরীর পিছল, চোখ রক্তাভ—রীতিমত স্বাস্থ্যবান রাজসিক চেহারা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মাছটা নিজে দেখেছিলেন, সবাইকে দেখিয়েছিলেন। তারপর বারান্দার একপাশে নামিয়ে রেখেছিলেন।

উঠোনের এককোণে পাতকুয়ো। সেখান থেকে হাত-পা ধুয়ে এসে গামছা দিয়ে পা মুছতে মুছতে দাদু দিদিমাকে বলেছিলেন, 'মাধবের কপালটা ভাল, জেলেপাড়ায় যেতে মাছটা পাওয়া গেল। চমৎকার মাছ। কেটেকুটে খানকতক ভেজে ফেল, ফুলকপি আছে তো ঘরে, তাই দিয়ে খান কতক ঝোল কর আর মাথাটা দিয়ে চিঁড়ে ভেজে মুড়িঘণ্ট।'

বাবা অস্বস্তির স্বরে বলেছিলেন, 'না-না, এত রাত্তিরে অতসব হাঙ্গামা করতে হবে না। একটু ঝোল করলেই চলে যাবে।'

দাদু বলেছিলেন, 'অত আর কোথায়? আর রাতই বা এমন কি হয়েছে! নেহাত হিম পড়ছে বলেই এমন নিষুতি নিষুতি দেখাচ্ছে, নইলে এই সবে এগারটা বাজল।'

মনে আছে, বাবা আর কিছু বলেন নি।

এদিকে দাদুর তালিকাটা শুনে ঠোঁটে ঠোঁট টিপে নিঃশব্দে হাসছিলেন দিদিমা। দিদিমার ঠোঁট সেই বয়েসেও টিয়াপাখির ঠোঁটের মত টুকটুকে। হাসির ছলে মুখের সেই ভঙ্গিটুকু কিন্তু ভারি বিচিত্র দেখিয়েছিল। চোখের তারায় দুষ্টুমি ছলকে দিয়ে দিদিমা বলেছিলেন, 'বেশি মাছ রেঁধে আর কি হবে, খাবে তো মাধব একা। আর বড় ওর সঙ্গে এক আধখানা খাবে। বাদ বাকি কালকের জন্তে সাঁতলে রেখে দিই, না কি বল।'

দাদুর মুখখানা হঠাৎ কি রকম যেন হয়ে গিয়েছিল। এক পোঁচ কালি কি কেউ তাতে মাখিয়ে দিয়েছে ? না একটু আগে মাছটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে রান্নার যে তালিকা তিনি পেশ করছিলেন তখন যে উৎসাহ আর খুশির আলো ঝল-কাচ্ছিল এক ফুঁয়ে কেউ তা নিভিয়ে দিয়েছে ? কি উত্তর দেবেন, অনেকক্ষণ বুঝি ভেবেই উঠতে পারেন নি দাদু। তারপর খানিক ধাতস্থ হয়ে বলেছিলেন, 'না-না, সবার জন্যেই দু-চারখানা করে রেঁধে ফেল। মাছটার ওজন সের তিনেকের মতন। আজ হয়েও যা থাকবে তাতে কাল ভেসে যাবে।'

দিদিমা বলেছিলেন, 'তা হয়ত যাবে।'

কিন্তু লোভনীয় ভোজটায় দিদিমা আবার যদি একটা বাগড়া দিয়ে বসেন সেই ভয়ে শঙ্কিত তটস্থ দাদু বলেছিলেন, 'যাও-যাও, তাড়াতাড়ি মাছটা কুটে নুন-টুন মাখিয়ে ফেল। অনেকক্ষণ এনেছি, আবার নরম হয়ে যেতে পারে।'

নরম হবার আদৌ কোন সম্ভাবনা নেই। মাছটার চোখ এখনও উজ্জ্বল চুনীর মত, দেহ পিছল। দু-ঘন্টা ঐভাবে ফেলে রাখলেও তার শরীরের চকচকানি এতটুকু মলিন হবে না। দুর্ভাবনাটা তো মাছের জন্য নয়, দিদিমাকে যেন তেন প্রকারেণ সামনে থেকে সরানো। নইলে বার বার সবার জন্যে রান্নার বিপক্ষে একটার পর একটা যুক্তি খাড়া করে যাবে বুড়ী।

দিদিমা কিন্তু নাছোড়। বলেছিলেন, 'এই তো খানিকটা আগে খাওয়া হল। আবার কোন পেটে খাবে শুনি ?'

'খানিক আগে খেয়েছি !'

'নয় তো কি। ন'টার সময় খেলে না ?'

আড় চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে বিব্রত ব্যতিব্যস্ত দাদু বলেছিলেন, 'শীতকালের রাত্তির কতবড়, হুঁশ আছে ? সন্ধেবেলা একবার খেলেও মাঝরাত্তিরে আবার খাওয়া যায়।'

চাপা গলায় দিদিমা এবার বলেছিলেন, 'পেটুক কোথাকার।' বলে তির্যক দৃষ্টিতে দাদুকে বিদ্ধ করে মাছটা আঙলের ডগায় ঝুলিয়ে কুয়োতলায় চলে গিয়েছিলেন।

আর দাদু হাত-পা মুছে বাবার দিকে অপ্রতিভ হেসে আস্তে আস্তে দাওয়ায় গিয়ে উঠেছিলেন। লক্ষ্য করেছি, বাবাও নতচোখে মুখ টিপে হেসে হেসে দাদু-দিদিমার মধুর দাম্পত্য লীলার মহিমাটুকু উপভোগ করেছিলেন।

বারান্দায় উঠে খুঁজেপেতে একটা বেতের মোড়া যোগাড় করে এনেছিলেন দাদু। বাবার মুখোমুখি বেশ আয়েস করে বসে বলেছিলেন, 'তা মাধব, হাত-মুখ ধুয়ে নিয়েছ তো ?'

'আজ্ঞে না। ভাবছি, একেবারে স্নানটাই করে ফেলব।'

দাদু কি বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই উঠোনের প্রান্ত থেকে দিদিমা বলে উঠেছেন, 'না না, এত রাত্তিরে স্নানের আর দরকার নেই। হিম পড়ছে, স্নান করলে নির্ঘাত ঠাণ্ডা লেগে যাবে। আজকাল শীতের এই মুখটায় খুব জরজারি হচ্ছে।'

বাবা বলেছিলেন, 'শীত-গ্রীষ্ম বারোমাস রাত্তিরে স্নান করা আমার অভ্যাস। এ তো বাংলা দেশ, হিম আর কোথায়। পশ্চিমে অমন শীতের ভেতরেও রাত্তির-বেলা স্নান না করলে আমার ঘুম আসত না। তা ছাড়া ক'দিন ধরে ট্রেনে ট্রেনে ঘুরছি। ধুলোয় ধুলোয় গা-মাথা বোঝাই হয়ে আছে। স্নান না করতে পারলে স্বস্তি পাচ্ছি না।'

'তা হলে আরেকটু বোসো। আঁচটা উঠলে গরম জল করে দিচ্ছি।'

'গরম জলের কিন্তু দরকার ছিল না।'

'না—না, এই কার্তিক মাসের রাত্তিরে তোমায় ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে হবে না।'

অগত্যা কি আর করা, বাবাকে শ্বশুরবাড়ির এই আদবটুকু মেনে নিতেই হয়েছিল।

এরপর খানিকক্ষণ চুপচাপ।

একসময় দাদুই নীরবতা ভেঙেছিলেন, 'তারপর মাধব—'

বাবা মুখ তুলে সাড়া দিয়েছিলেন, 'আজ্ঞে।'

'এখন তুমি আসছ কোত্থেকে ?'

'আজ্ঞে, সোজা অমরকণ্টক থেকে।'

ঘাড় চুলকে দাদু জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তা অমরকণ্টকটা তোমার হল গিয়ে যেন কোথায় ?'

বাবা বলেছিলেন, 'আজ্ঞে মধ্যপ্রদেশে। নর্মদা নদীর ওটাই হল উৎস। ওখান থেকে বেরিয়ে নর্মদা নদী মহারাষ্ট্রের ভেতর দিয়ে সোজা কচ্ছ উপসাগরে গিয়ে পড়েছে।

'সেখানে দেখবার টেখবার মতন কিছু আছে ?'

বাবার চোখ দু'টি এবার চকচকিয়ে উঠেছিল, 'আছে বৈকি। অনেক কিছু দেখবার আছে।'

'কী ?'

বাবা যেন মুহূর্তে ভিন্ন মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। অন্যমনস্ক, দূরবর্তী এবং অপরিচিত। একটু আগে যাঁকে স্নেহোচ্ছল, আমার প্রতি সদয় এবং মনোযোগী দেখেছি, মুহূর্তে কয়েক শ'মাইল পাড়ি দিয়ে এমন এক রাজ্যে তিনি চলে গিয়েছিলেন

যেখানে আমার সেই বয়েসের ধ্যানধারণা পৌঁছয় না। মনে আছে বাবা দাদুর কাছে অমরকণ্টকের রমণীয় এক বর্ণনা দিয়েছিলেন। সব কিছু আজ তার মনে নেই, থাকার কথাও নয়। তবে বাবার গম্ভীর সুরেলা কণ্ঠস্বর এখনও যেন শুনতে পাই, তার রেশ আজও মাঝে মাঝে প্রাণে বাজে।

বিশাল এক হ্রদ, অরণ্যময় পাহাড়, দোলায়িত চড়াই-উতরাই, উপত্যকা-অধিত্যকা-মালভূমি, ফেনায়িত জলকল্লোল, দূর বিস্তৃত নীলাকাশ—বাবার বর্ণনায় আরো কি কি ছিল মনে নেই। তবে চমৎকার এক নিসর্গ দূর দিগন্ত থেকে আমাকে ক্রমাগত হাতছানি দিতে শুরু করেছিল। তখনও আমি পাহাড় দেখিনি, হ্রদ দেখিনি, উপত্যকা-অধিত্যকা দেখিনি। তবু সেই অপরিচিত শব্দগুলি বিচিত্র ঝঙ্কারে আমাকে মুগ্ধ এবং সম্মোহিত করে ফেলেছিল। বাবা কি সেদিনই আমার রক্তে বোহেমিয়ানার উত্তরাধিকার সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন ?

দাদুর বোধ হয় ওসব বিবরণ ভাল লাগছিল না। বলেছিলেন, 'ওসব পাহাড়-পর্বত ছাড়া আর কিছু নেই ?'

'আছে বৈকি।'

'কী ?'

'শিবের বিশাল মন্দির আছে। তা ছাড়া সাধু আছে বিস্তর—শৈব, রামায়েৎ, আর্য সমাজী আর উদাসী সম্প্রদায়ের। তাদের আশ্রমও আছে।'

'আচ্ছা—আচ্ছা—'সাধুপ্রসঙ্গে দাদু উৎসাহিত। বলেছিলেন, 'তা এই সাধুদের সঙ্গে মিশেছিলে টিশেছিলে নাকি ?'

'হ্যাঁ, এই একটু—আধটু—'

'তা এদের কথা বল দেখি, শুনি। কি করে-টরে এরা ?'

একটু চুপ করে থেকে বাবা শুরু করেছিলেন, 'বেশির ভাগ সাধুই দণ্ডী কেটে-কেটে অমরকণ্টক থেকে কচ্ছের মোহানা পর্যন্ত চলে যায়। আবার ঐভাবে অমরকণ্টকে ফিরে আসে।'

দাদু স্তম্ভিত, 'বল কি !'

মৃদু হেসে বাবা বলেছিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কিন্তু একটা ব্যাপার তো আমার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না।'

'কী ?'

'গুজরাট-মারাঠা—কচ্ছ টচ্ছ বললে না ? এত সব দেশের ওপর দিয়ে নদীটা বয়ে গেছে। তা হলে লম্বা তো কম নয়। এতখানি পথ দণ্ডী কেটে যেতে-আসতে সময় নিশ্চয়ই কম লাগে না ?'

'অনেক সময় লেগে যায়। প্রায় শ' পাঁচেক মাইল লম্বা নদীটা। এক একজনের প্রায় পাঁচ-ছ' বছর লাগে। আবার এমন অনেক সাধু আছে যারা সারা জীবন ধরেই দণ্ডী কেটে চলেছে।'

'বল কি হে।'

বাবা বলেছিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

দাদু একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, 'আচ্ছা মাধব, ঢের সাধু সন্ন্যাসী তো দেখেছ। সবাই তো আর খাঁটি না, মেকিও আছে।'

'মেকিই বেশি।'

'এদের ভেতর সিদ্ধপুরুষ টুরুষ কারো সন্ধান পেয়েছ?'

'একবার মাত্র সে সুযোগ এসেছিল।'

'কি রকম শুনি—'প্রবল ঔৎসুক্যে বেতের মোড়াটা বাবার সামনে টেনে এনে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছিলেন দাদু।

বাবা কি বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই কুয়োতলা থেকে দিদিমা প্রায় ধমকে উঠেছিলেন, 'বেচারী গাড়ি-টাড়িতে ঘুরে হয়রান হয়ে এসেছে। কোথায় তাকে একটু বিশ্রাম করতে দেবে, তা নয়। নাগাড়ে বকিয়ে চলেছে। থামো তো বাপু।'

দাদু কাঁচুমাচু। অপ্রতিভ মুখে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ মাধব, তুমি এবার স্নান-টান করে ফেল।' বলে পাশের ঘরে তাকিয়ে ডেকেছিলেন. 'বড় খুকি—বড় খুকি—'

আশ্চর্য্য, মা সেই আগের ভঙ্গিতেই চৌকাঠের ওপর চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন। অমরকণ্টক আর সাধু সন্ন্যাসীব কাহিনীতে আমরা এতই মগ্ন যে সেদিকে কারো লক্ষ্য ছিল না।

দাদুর ডাকে মা সাড়া দেন নি, যথারীতি নিশ্চল নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে ছিলেন।

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ মায়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন দাদু। তারপর বলেছিলেন 'তুই তখন থেকে ঐরকম দাঁড়িয়ে আছিস নাকি? মাধব এতদিন পর এল, একবারও কাছে এলি না।'

মায়ের দিক থেকে উত্তর নেই।

'আর দাঁড়িয়ে থাকিস না। মাধবকে তেল-গামছা টামছা এনে দে।'

মায়ের নড়ার কোন লক্ষণ দেখা যায়নি। দাদু যে বকে মরছেন, সেদিকে তাঁর বিন্দুমাত্র মনোযোগ আছে এমন মনে হবার কোন কারণ ছিল না।

এবার দাদু অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। মায়ের ভরসায় না থেকে নিজেই বিরক্ত পায়ে উঠে গিয়ে গামছা, সরষের তেলের বাটি, নারকেল তেলের কৌটো, শুকনো ধুতি,

দাঁতের মাজন—ইত্যাদি ইত্যাদি যোগাড় করে বাবার কাছে রেখেছিলেন, 'যাও, স্নান করে এস।'

ওদিকে দিদিমার মাছ কোটা হয়ে গিয়েছিল, উনুনটাও ধরে গেছে। দিদিমা কুয়োতলা থেকে সোজা রান্নাঘরে চলে গিয়েছিলেন।

বাবা নোংরা জামাকাপড় খুলে লুঙ্গি পরে অনেকক্ষণ ধরে ডলে ডলে তেল মেখেছিলেন। তখনই চোখে পড়েছিল, তাঁর চেহারার দীর্ঘ ফ্রেমটিতে মাংস বা মেদের অংশ সামান্যই। চওড়া চাওড়া হাড়গুলি প্রকট, হাত-পায়ের মোটা মোটা নীল শিরা ফুটে বেরিয়েছে। এসবের ওপর খসখসে, ঢিলে, রঙ-জলে-যাওয়া কর্কশ চামড়া আঁটা।

তেল মাখার পর পড়-পড় শীতের সেই কুয়াশাবিলীন রাতটিতে প্রায় বরফগলা কুয়োর জল আধঘণ্টা ধরে মাথায় ঢেলেছিলেন বাবা। দিদিমা রান্নাঘর থেকে সমানে চিৎকার করে যাচ্ছিলেন, 'আর ঢেলো না মাধব, আর ঢেলো না। ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

বাবা হেসে বলে যাচ্ছিলেন, 'আপনি ভাববেন না মা। সারা জীবন বাউণ্ডুলের মত ঘুরে ঘুরে শরীরটা এমন হয়ে গেছে যে শীত-গ্রীষ্ম-ঝড়-বৃষ্টি—কোন কিছুতেই কিছু হয় না।'

স্নানের পর ঘণ্টাখানেক ধরে আহ্নিক করেছিলেন বাবা।

ইতিমধ্যে রান্না হয়ে গিয়েছিল। খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল রান্নাঘরের বাইরের ঘেরা বারান্দায়।

খেতে দেবার ব্যাপারে দিদিমা কিন্তু দাদুর সঙ্গে চিরদিনের সেই কৌতুকের খেলাটা খেলেছিলেন। শোবার ঘরের বারান্দা থেকে দাদু চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে-ছিলেন, 'কি গো, আসন-টাসন পাতা হয়েছে?'

নিরীহ স্বরে দিদিমা বলেছিলেন, 'হয়েছে।'

'চলো মাধব, চল্ রে দাদাভাই—' আমাদের সঙ্গে নিয়ে সদলে রান্নাঘরের দাওয়ায় এসেছিলেন দাদু। আর সেখানে এসে তাঁর যা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা বোধ হয় ব্যাখ্যা করা যায় না। মুখের ওপর দিয়ে পর পর অনেকগুলো ঢেউ খেলে গিয়েছিল। পাড়ের সুতো দিয়ে ফুলতোলা দু-খানি মাত্র আসন পাশাপাশি পাতা ছিল। একটা আমার জন্য, দ্বিতীয়টি বাবার।

দিদিমা বলেছিলেন, 'বোসো মাধব, বোস্ রে দাদাভাই—'

জামাই-এর সামনে কি বলবেন যেন ভেবে পাচ্ছিলেন না দাদু। নিদারুণ আশা-ভঙ্গে ভোজনরসিক লোভী মানুষটির দু চোখ করুণ হয়ে উঠেছিল।

ওদিকে দিদিমার ঠোঁট দুটি ছিল টেপা। চোখ কুঁচকে মিটমিটিয়ে দাদুর দিকে তাকাচ্ছিলেন তিনি। সে দৃষ্টিতে যা বলকে যাচ্ছিল তার নাম বোধ হয় নিষ্ঠুরতা, নাকি কৌতুক, নাকি হাসি, কিংবা অনুরাগই। কে জানে কি, সেই বয়েসে তার রহস্য ভেদ করার শক্তি আমার ছিল না।

এদিকে বাবা খুব দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলেন। আগেকার কথোপকথনের সূত্রে তিনি জেনেছিলেন, রুইমাছটার খানকয়েক টুকরো পেটে না গেলে শ্বশুরমশাই ঘুমোতে পারবেন না, সারারাত বিছানায় ছটফট করে কাটাবেন। এদিকে দেখা যাচ্ছে, আসন পাতা হয়েছে মাত্র দু খানা। খাবার জন্য সুস্পষ্ট আহ্বানও তাঁকেই আর আমাকে।

দাদু-দিদিমার ভেতরকার খেলাটা যে বাবা টের পাচ্ছিলেন না, তা নয়। অথচ কিছু করারও বুঝি বা তাঁর নেই। অতএব আসনের সামনে তাঁকে থমকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল।

দাদুর রক্তশূন্য ছাইয়ের মত মুখখানা দেখে বোধ হয় শেষ পর্যন্ত করুণাই হয়েছিল দিদিমার। মর্মপীড়াটা আর দীর্ঘস্থায়ী করেন নি। অতর্কিতে মনে পড়ে গেছে, এমন সুরে বলেছিলেন, 'এই রে, তোমার আসন পাততেই ভুলে গেছি। তা সত্যিই খাবে নাকি ?'

একটু হাতছানির শুধু অপেক্ষা। আস্কারাটুকু পাওয়ামাত্র আর অপেক্ষা করেন নি দাদু। নিজেই ছুটে গিয়ে আসন পেতে বসে পড়েছিলেন এবং আমাদের তাড়া দিয়েছিলেন, 'বসে পড রে দাদাভাই, অনেক রাত হয়ে গেছে। শিগ্‌গির বস্‌—'

আমরা বসে পড়েছিলাম।

এই সময়টুকুর ভেতর দিদিমা রেঁধে ফেলেছিলেন কমগুলি পদ নয়—মাছভাজা, বেগুনভাজা, মুগের ডাল, ঝোল, মুড়িঘণ্ট। তার ওপর ঘি তো ছিলই।

নিজে খাব কি, ফিরে ফিরে দাদুর খাওয়াটাই শুধু দেখছিলাম। পদ্মাসন করে বসে পাতের দিকে সেই যে ঝুঁকেছিলেন আর মাথা তোলবার ইচ্ছা বা ফুরসত কোনটাই তাঁর ছিল না। খাচ্ছিলেন আর মাথা নাড়ছিলেন দাদু। মাথা নাড়াটা তারিফের মুদ্রা। সমানে বকে যাচ্ছিলেন, 'বুড়ো হাড়ে ভেলকি দেখিয়ে দিলে। রান্নাগুলো যা হয়েছে কি বলব, একেবারে স্বর্গের সুধা।'

তারিফ করতে করতে আবেগের স্রোতে ভেসে গিয়েছিলেন দাদু। জামাই যে সামনে বসে আছে, সেদিকে আদৌ হুঁশ ছিল না বোধ হয়। বলেছিলেন, 'যা রেঁধেছ বুলবুলি, ইচ্ছে হয় হাত দু'খানা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিই, নইলে মাথায় তুলে ধেই ধেই করে নাচি।'

বলতে ভুলেছি 'বুলবুলি' দিদিমার আদরের ডাক। উচ্ছ্বাসটা প্রবল হলে মাঝে মাঝে ঐ নামেই ডেকে ফেলতেন দাদু।

দিদিমা কিন্তু এবার যথার্থই রেগে গিয়েছিলেন। চাপা তীব্র গলায় বলেছিলেন, 'আঃ কি অসভ্যতা শুরু করলে! লোকজন কিচ্ছুটি মানে না।'

দিদিমার স্বরের তীব্রতা দাদুকে চকিত করে তুলেছিল। চমকে চোখ তুলে বাবাকে একবার দেখে জিভ কেটে তাড়াতাড়ি আবার মুখ নামিয়ে নিয়েছিলেন।

কিছুক্ষণের জন্য অদ্ভুত স্তব্ধতা। তারপর দাদুই আবার আবহাওয়াটাকে স্বাভাবিক করে নিয়েছিলেন। এতক্ষণ লোভনীয় ভোজ্যগুলির সামনে বসে মায়ের কথা মনে ছিল না। হঠাৎ খেয়াল হতেই বলেছিলেন, 'তাই তো, তুমি আমাদের খেতে দিচ্ছ, বড় খুকি গেল কোথায়? বড় খুকি—'

দেখা গেছে মা তখনও সেই ঘরটার চৌকাঠে ছবিতে-আঁকা কোন অনড় মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হয়েছিল, মা বুঝি চিরকাল ঐভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবেন।

দাদু এবার বিরক্ত হয়েছিলেন, 'কতবার করে ডাকাডাকি করছি, তবু মাধবের কাছে এলি না। কি অবাধ্য যে তুই হয়েছিস বড় খুকি!'

কিন্তু কে কার কথা শোনে! বিরক্তি, ভৎর্সনা—কোন কিছুই মাকে বুঝি ছুঁতে পারছিল না। স্পর্শাতীত কোন জগতে নিজেকে বুঝিবা বিলুপ্ত করে রেখেছিলেন তিনি।

সেদিন বুঝিনি, বড় হয়ে মনে হয়েছিল, মা যে ঐভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সে কি বেদনায়, সে কি অভিমানে, সে কি সংকেতময় তীব্র কোন যন্ত্রণায়? সেদিন যেটুকু বুঝেছিলাম তা এইরকম। দাদু-দিদিমার মধুর কৌতুকের খেলাটার পাশে মা-বাবার সম্পর্কটা কেমন যেন আড়ষ্ট মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল তার মধ্যে শোণিত প্রবাহের উত্তাপ নেই, প্রাণের আলো বিচ্ছুরিত নেই, সেখানে সব কিছুই নিষ্প্রভ, বিড়ম্বিত আর অস্বাচ্ছন্দ্যে ভরপুর। মা-বাবা এমন কেন? এমন কেন?

মনে পড়ে, আমরা তিনজন শুধু সেদিন খেয়েছিলাম। মা আর দিদিমা খাননি।

ঢের রাত হয়ে গিয়েছিল। অতএব খাওয়া-দাওয়ার পরই শোবার পালা।

মা আর আমরা তিন ভাইবোন এক ঘরে শুতাম। দাদু-দিদিমা আরেক ঘরে। সেদিন শোবার ব্যবস্থায় অদল বদল হয়েছিল। মা আর বাবাকে একখানা ঘর ছেড়ে দিয়ে আমরা ভাইবোনেরা এসেছিলাম অন্য ঘরটায় দাদু-দিদিমার বিছানায়।

যে মা দাদুর হাজার ভৎর্সনা এবং অনুরোধেও বহুকাল পর ফিরে-আসা স্বামীর সামনে আসেন নি, কেমন করে তাঁর সঙ্গে একঘরে নিশিযাপন করেছিলেন, সেদিন আমার কল্পনা অতদূর পৌঁছোয় নি। বড় হয়ে অনুমান করতে চেষ্টা করেছি কিন্তু

স্পষ্ট করে কিছুই বুঝতে পারিনি। ব্যাপারটা আমার কাছে কুহেলী-বিলীন এক রহস্ত হয়েই রয়েছে।

শুধু এটুকু মনে আছে, সেদিন বাবার কাছে শুয়ে গল্প করবার খুব ইচ্ছা হয়েছিল আমার। কিন্তু সে-কথা মুখ ফুটে বলতে পারিনি। প্রায়-অপরিচিত মানুষটিকে ইচ্ছাটা জানাতে ভারি লজ্জা লেগেছিল।

ছয়

দাদু-দিদিমার কাছে শুয়ে সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসেনি। শুধু ঘরবদলের জন্যই না, বাবার জন্যও।

কোথায় ছিলেন এই মানুষটি, আগে আর কখনও তাঁকে দেখেছি কি না মনে নেই। তাঁর কথা আগে আর কোনদিন ভাবিও নি বোধ হয়। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত তিনি এসেছেন, নিমেষে আমাকে জয় করে নিয়েছেন।

এতকাল বাবা কেন আমাদের কাছে আসেন নি, এলেন যদি এখন এখানে থাকবেন তো, থাকলে কতদিন থাকবেন—এলোমেলো অফুরন্ত কত ভাবনা যে সেদিন ভিড় করে এসেছিল। আর মনের ভেতর তাদের মিলিত কলরব শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমের অতল জলে টুপ করে ডুবে গেছি, তা-ই বা কে বলবে।

সেদিন কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম, মনে পড়ে না। দরজায় কড়ানাড়ার শব্দে হঠাৎ জেগে উঠেছিলাম। কে শব্দ করছে বাইরে ?

ঘরের ভেতর অন্ধকার তখন ফিকে, জলো কালির মত। দাদু-দিদিমা আর ভাইবোনেরা তখনও ঘুমুচ্ছে। সবার নাকের মিহি-মোটা বিচিত্র আওয়াজ একাকার হয়ে কনসার্ট বেজে চলেছে। ঘুমচোখে অনভ্যস্ত ঘরে প্রথমটা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম, কেমন যেন ভয় ভয় লাগছিল। তারপরেই মনে পড়ে গেছে, রাত্তিরে বাবা এসেছেন। আমরা ঘরবদল করে এখানে এসেছি, দাদু-দিদিমার কাছে শুয়েছি।

দরজার কড়াটা একটু থেমে পরক্ষণেই আবার টক টক করে নড়ে উঠেছিল। শুনতে শুনতে আমার বুক টিপ টিপ করছিল।

অনেকক্ষণ কান খাড়া করে বসে থেকেছি, অসাড় হাতে দাদুকে বারকয়েক ঠেলেছিও। কিন্তু ঘুমটা দাদুর এতই গাঢ়, এমন গভীর, ভাঙায় কার সাধ্য !

হয়ত চেঁচিয়েই উঠতাম, সেই সময় গলাটা শোনা গেছে, 'এই খোকা, খোকা, উঠলি ?'

বাবা ! কাল রাতে যে কণ্ঠ স্বরের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ভোর হতে না হতেই কি তা

ভুলি! হৃৎপিণ্ডের ভেতর দিয়ে বিচিত্র শিহর খেলে গিয়েছিল। রোমাঞ্চিত আমি তড়াক করে বিছানা থেকে নেমে দরজা খুলে দিয়েছিলাম।

হ্যাঁ, বাবাই। মোটা খদ্দরের চাদরে সারা গা আর মাথা ঢাকা। শুধু খাঁড়ার মত তীক্ষ্ণ নাকের দু-পাশে স্নেহকোমল দুটি চোখ আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল।

ভোরের আলোর মত স্নিগ্ধ হেসে বাবা বলেছিলেন, 'কখন থেকে কড়া নাড়ছি, নাড়ছি তো নাড়ছি। উঠিস আর না। বড্ড ঘুমকাতুরে তুই।'

অপার বিস্ময়ে বাবার দিকে তাকিয়ে থেকেছি। বলতে চেয়েছিলাম, আমি তো কখন জেগেছি কিন্তু বলতে পারিনি। বাবার সম্বন্ধে আমার প্রাণে বিস্ময়ের শেষ নেই। তাঁর কথার উত্তর দেবার চাইতে তাঁকে দেখতেই বেশি সাধ হচ্ছিল।

বাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কি অমন দেখছিস আমাকে ?'

লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিয়েছিলাম।

আমার সেই ড্যাবড্যাবে চোখ মেলে বিস্ময়ের দেখাটা নিয়ে আর কোন প্রশ্ন করেন নি বাবা। বলেছিলেন, 'বেড়াতে যাবি ?'

লজ্জার কথাটা আর মনে ছিল না। উৎসাহে মুখ তুলে ঘাড় কাত করেছিলাম। অর্থাৎ যাব।

'তা হলে একটা চাদর টাদর গায়ে দিয়ে আয়, কার্তিক মাসের হিম লাগলে অসুখ হতে পারে।'

তখন চাদর কোথায় পাই। এদিক সেদিক তাকাতেই ভারী কাঁথাটা চোখে পড়ে গিয়েছিল। কাল রাতে ওটা গায়ে দিয়ে ঘুমিয়েছিলাম। এক ছুটে গিয়ে কাঁথাটা সর্বাঙ্গে জড়িয়ে বাবার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। আমি তৈরি, বাবা বললেই বেরিয়ে পড়তে পারি।

বাবা আমার সাজের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলেছিলেন, 'কাঁথা গায়ে দিয়ে যাবি! আচ্ছা চল্। এক কাজ কর, মাথাটা ভাল করে ঢেকে নে। দাঁড়া, আমিই ঢেকে দিচ্ছি।' কার্তিকের হিমের বিরুদ্ধে মাথা ঢেকে আমাকে রণসাজে সাজিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

ঘরের দরজা ভাল করে ভেজিয়ে সদর খুলে একসময় দু'জনে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

বাইরে এসে বাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'পুব দিক কোনটা রে খোকা ?'

দিক সম্বন্ধে তখনও আমার ধারণাটা অস্পষ্ট। চোখ নামিয়ে মাথা নেড়েছিলাম।

'সে কি রে, সূর্য কোন দিকে ওঠে তা-ই জানিস না ?'

এমন একটা সাধারণ ব্যাপার জানি না, প্রায়-অচেনা বাবার কাছে সে অজ্ঞতা ধরা পড়ে গেল। কান আমার লাল হয়ে উঠেছিল।

তখনও অন্ধকার কাটে নি। দিগন্ত জুড়ে নিবিড় কুয়াশা অনড় হয়ে আছে। আকাশটা অদৃশ্য, কুয়াশার চাঁদোয়ার ওপারে তার আসল রংখানি বিলীন। আশে পাশে কোন কিছুই স্পষ্ট নয়। সবই রহস্যময়, প্রায় নিরাকার। এত ভোরে রীতিমত ঠাণ্ডা লাগছিল, গায়ের লোম হিমে সজারুর কাঁটা হয়ে উঠেছে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে পায়ের তলায় যে পথটা পেয়েছিলাম সেটা ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। বাবার গা ঘেঁষে পাশাপাশি হাঁটছিলাম। বাবা বলেছিলেন, 'দিক যখন চিনিস না তখন কি আর করা! চল্, এই রাস্তাটা ধরেই যাই। পথটা কোথায় গেছে জানিস?'

জানি না, কি করেই বা জানব। এতকাল আমার চলাফেরা ঘোরাঘুরি ছিল ঐ ছোট্ট বাড়িটায় সীমাবদ্ধ। কয়েক মাস হল সেটার পরিধি কিঞ্চিৎ বেড়েছে। এখন স্কুলে যাই, হীরুদের বাড়ি যাবার সনদও হাতে এসে গেছে। এই জগৎটুকুর বাইরে আর সব কিছুই আমার কাছে অপরিচিত এবং নিষিদ্ধ। অতএব বাবার প্রশ্নের উত্তরে আমাকে মাথা নাড়তে হয়েছে।

বাবা বলেছিলেন, 'এখানে থাকিস আর এখানকার পথঘাট কোথায় গেছে তার খোঁজই রাখিস না, কি বোকা ছেলে রে তুই!'

অস্ফুটে বলেছিলাম, 'কি করে জানব, মা যে আমাকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেয়না।'

'বেরুতে দেয় না!' বাবা যেন খানিক অবাকই হয়ে গিয়েছিলেন।

'না।'

'কেন রে?'

'কি জানি। বেরুলে মারে।'

বাবা এ প্রসঙ্গে আর কোন প্রশ্ন করেন নি। শুধু বলেছিলেন, 'পথটা যেখানে খুশি যাক, আমরা হাঁটতে তো থাকি।'

অনেকক্ষণ চলার পর চারপাশে ঘন কুয়াশা ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছিল। জলো কালির মত তরল অন্ধকারটুকুও উধাও। সামনের দিকের আকাশ দিগ্বলয়রেখায় যেখানে নেমে গেছে সেই জায়গাটা দিনের প্রথম আলোয় ছুপিয়ে উঠতে শুরু করেছিল। একটু পরেই ওখানে সূর্য উঠবে।

ইতিমধ্যে পাখিরা বেরিয়ে পড়েছে। বাবা আর আমি ছাড়া রাস্তায় কদাচিৎ দু-একটি মানুষ চোখে পড়ছিল। তারা 'শিউলি', কাঁধে খেজুর-রসের হাঁড়ি ঝুলিয়ে চলেছে। বিবিবাজারের বাকি মানুষ তখনও ঘরে, শীতের হিমেল ভোর তাদের বিছানায় ধরে রেখেছে।

বাবা বলেছিলেন, 'খোকা, খেজুর রস খাবি ?'

আমি তৎক্ষণাৎ রাজী, 'খাব।'

একটা শিউলিকে ডেকে দু'জনে রস খেয়ে আবার হাঁটতে শুরু করেছিলাম যেতে যেতে ডেকেছিলাম, 'জানো বাবা—' বাবাকে সেই আমার প্রথম সম্বোধন।

চোখ ফিরিয়ে বাবা সাড়া দিয়েছিলেন, 'কি রে ?'

'আমার রস খেতে খুব ইচ্ছে করে, মা খেতে দেয় না।'

'কেন ?'

'কি জানি। রসই নাকি, ভাল ভাল কিছু খেতে দেয় না। দাদু দিতে বললেও দেয় না। সেই জন্যে দাদু ভাল কিছু আনেও না। মা আমাদের খালি মারে।' একদিনের পরিচয়েই বুঝেছিলাম, বাবার কাছে বিন্দুমাত্র ভয় নেই, সব মনোবেদনা উজাড় করে দেওয়া যায়।

বাবা কিছু বলেন নি, চোখদু'টি তাঁর বিষণ্ণ-করুণ হয়ে গিয়েছিল।

বাড়ি থেকে যখন বেরুই তখন রাস্তাটা ছিল পীচের, খানিক এগিয়ে সেটা খোয়ার দখলে চলে গিয়েছিল। কিন্তু কতক্ষণ আর, একসময় শহুরে কৌলীন্য খুইয়ে পথটা মাঠের ভেতর হারিয়ে গেল।

এখানে বাড়ি-ঘর-বসতি কিছুই নেই। বিবিবাজারের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে আমরা অনেক দূর চলে এসেছিলাম। মাঠ ভেঙে যাচ্ছিলাম তো যাচ্ছিলামই। দু-ধারের খেত শীতের মরসুমী ফসলে ঝলমলে হয়ে ছিল। গাঢ় সবুজ পাতার মাঝখানে হাসফুটে মুখের মত শুভ্র ফুলকপি। কোথাও পেঁয়াজকলি, টোমাটো। কোথাও মুলো, বেগুন। কোথাও গাজর-বীট-ওলকপি। হেমন্তের শিশিরে সব ভিজে গিয়েছিল, বাতাসের একটু কাঁপন লাগলেই পাতা থেকে টুপ টুপ করে জল ঝরে পড়ছে। সোনালি-সবুজে, লালে-হলুদে মাঠখানা যেন রঙীন মনোরম এক গালিচা।

মাঠের পরও মাঠ ছিল। সে মাঠ জুড়ে হেমন্তের এই সকালে শুধু ধান আর ধান।

একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, বিবিবাজারের সীমানা পেরিয়ে মাঠের ভেতর আসতেই বাবা যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলেন। অন্যমনস্ক, উদাসীন, অপরিচিত। কাল রাত থেকে যে মানুষটিকে দেখে আসছি, তিনি বুঝি অন্য কেউ। ভাল ভাল খাবার খেতে না পাওয়া, মারধোর ইত্যাদি ব্যাপারে মায়ের বিরুদ্ধে আমার ছোট্ট বুকে অসংখ্য অভিযোগ আর মর্মবেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে ছিল। বাবার কাছে সেগুলো সম্বন্ধে সামান্য ইঙ্গিত দিয়েছিলাম। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলার জন্য বার বার ডেকেও তাঁর সাড়া পাইনি। মাথার ওপর অবাধ-অসীম আকাশ, দূরবিস্তৃত প্রান্তর একাকার হয়ে বাবাকে মগ্ন করে ফেলেছিল।

সেই ছেলেবেলায় আধফোটা চেতনায় আমার মনে হয়েছিল, বাবার ভেতর অনাবিষ্কৃত সুদূর এক মহাদেশ আছে, তা আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে। ছোট ছোট পা ফেলে অতদূরে সেই বিপুল রহস্যময়তায় পৌঁছুবার সাধ্য আমার ছিল না।

মনে আছে চলতে চলতে রোদ উঠে গিয়েছিল। সূর্যটা প্রথমে আবীরে মাখা টুকটুকে। তারপর দেখতে দেখতে গনগনে হয়ে উঠেছিল। মনে আছে জীবনে সেই আমার প্রথম বাড়ির বাইরে গিয়ে সূর্যোদয় দেখা।

এতকাল আমার ঘুমভাঙার আগেই রোদটা কখন যেন উঠে বসে থাকত। সেদিক থেকে বাবার সঙ্গে মাঠের মাঝখানে গিয়ে প্রথম সূর্যোদয় দেখার দিনটা স্মরণীয় বৈকি, বিস্ময়করও।

চলতে চলতে সুদূর অন্যমনস্কতা থেকে হঠাৎ উঠে এসেছিলেন বাবা, 'আচ্ছা খোকা—'

'কি বলছ বাবা ?'

'সূর্যস্তব জানিস ?'

'না।' বাবার কাছে আমার আরেকটা অজ্ঞতা ধরা পড়ে গিয়েছিল।

'বামুনের ছেলে হয়ে ওটা জানা উচিত। রোজ ভোরবেলা সূর্য ওঠার আগে উঠে স্তবটা আবৃত্তি করবি। নে, এখন আমার সঙ্গে সঙ্গে বল।' উদাত্ত গম্ভীর স্বরে বাবা স্তবপাঠ শুরু করেছিলেন :

ওঁ জবাকুসুমং সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরং।

বাবার কণ্ঠে যে এত সুরেলা, এত স্নিগ্ধ ধ্বনিময় আগে বুঝতে পারিনি। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমিও পদগুলো বলে যাচ্ছিলাম। শক্ত শক্ত সংস্কৃত শব্দগুলো উচ্চারণ করা আমার সাধ্যে কুলোচ্ছিল না। মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছিলাম। বাবা আস্তে আস্তে শব্দগুলো ভেঙে ভেঙে আমাকে বলিয়ে দিয়েছিলেন।

সূর্যস্তবই না, বাবা সেদিনই আমাকে দিক চিনিয়ে দিয়েছিলেন। কোনটা পুব কোনটা পশ্চিম, কোনটা নৈঋর্ত আর কোনটা ঈশান, কিভাবে তাদের নির্ণয় করতে হয়—আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। এতদিন কাক, শালিক আর চড়াই—পাখিদের এই তিন বংশকে চিনতাম। বাবা সেদিন লক্ষণ দেখিয়ে বক, শঙ্খচিল, মাছরাঙা, কাটোয়া, জলপিপি এবং আরো কত পাখি যে চিনিয়ে দিয়েছিলেন! শুধু কি পাখি আর দশ দিক, গাছপালার কোনটার কি নাম, কোনটা মানুষের কি উপকারে আসে, ইত্যাদি ইত্যাদি জানিয়ে দিয়েছিলেন।

বাবা বলেছিলেন, 'আমাদের চারদিকে মেলা শাজানো আছে। চোখ মেলে

প্রাণভরে শুধু দেখবি, কান পেতে শুনবি। মনে রাখিস সারা জীবন কাটিয়ে দিলেও দেখার, শোনার আর শেষ নেই।'

সেদিনের সেই অকারণ পথচলায় নগদ প্রাপ্তি ছিল দিক-চেনা, পাখিচেনা, সূর্যস্তব মুখস্ত করা আর জীবনের প্রথম সূর্যোদয় দেখা। অজান্তে আরো কিছু পেয়েছিলাম, আমার রক্তে বাবা তাঁর বোহেমিয়ান মন সেদিনই বুঝি সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন।

মনে পড়ে, সেদিন সূর্যকে মাঝ-আকাশের দেউড়িতে পৌঁছে দিয়ে আমরা বাড়ি গিয়েছিলাম। দাদু-দিদিমা—সবাই খুব অধীর হয়ে ছিলেন, উদ্বিগ্নও। বাড়ি ফিরতেই চারদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রশ্নবাণ ছুটে এসেছিল।

'কোথায় গিয়েছিলে দু'জনে ?'

'এমন করে না বলে যেতে আছে ?'

'আমরা তো ভেবে ভেবে অস্থির। থানায় খবর দেব কিনা ভাবছিলাম, এমন সময় তোমরা এলে।'

স্মিতমুখে বাবা বলেছিলেন, 'অত চিন্তার কি আছে। খোকাও নেই, আমিও নেই। বোঝা উচিত ছিল, ও আমার সঙ্গেই গেছে।'

মা উঠোনের এককোণে নিষ্পলকে তাকিয়ে ছিলেন, কোন প্রশ্ন করেন নি, একটি মন্তব্যও না। বাবার কথা শেষ হতে না হতেই ছুটে এসে আমার একটা হাত ধরে বারান্দায় নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রথমে গালে ঠাস ঠাস চড় পড়েছিল। তারপর পিঠে সপাসপ কঞ্চির ঘা পড়তে শুরু করেছিল। মারছিলেন আর সমানে কাঁদছিলেন মা, 'কেন, কেন গিয়েছিলি ওর সঙ্গে ?'

দাদু-দিদিমা ছুটে গিয়ে আমাকে বাবার কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, মেয়েকে যথেষ্ট বকাবকিও করেছিলেন।

মা কাঁদছিলেন আর বলছিলেন, 'ওকে বলে দাও যেখানে খুশি যাক, যা খুশি করুক, আমি কিছু বলতে যাব না। কিন্তু বকুকে কোথাও নিয়ে যাওয়া চলবে না। সারা জীবন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছে কিন্তু ছেলেকে নিয়ে আমি ওকে বাজি জিততে দেব না।'

কথাগুলো কার উদ্দেশে, বুঝতে অসুবিধে হয়নি।

বাবা একটি কথাও বলেন নি। তাঁর চোখদু'টি অত্যন্ত করুণ মৌন, আর ছায়াচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল। উষ্ণ আলিঙ্গনে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন বাবা। তাঁর বাহুবেষ্টন ক্রমশ দৃঢ়তর হচ্ছিল, বিশাল একটি বুকে আশ্রয় পেয়ে আমি সমানে ফুঁপিয়ে যাচ্ছিলাম।

সাত

আশ্চর্য, এতকাল পরেও সেদিনের সব ঘটনা সব কথা স্পষ্ট মনে আছে, স্মৃতি থেকে কিছুই হারায়নি। কিছুই মুছে যায়নি।

ভোরবেলা বাবার সঙ্গে বেরিয়ে দুপুরে বাড়ি ফিরে মায়ের হাতে প্রচণ্ড মার খাবার পর সেই যে দাদু দিদিমা আমাকে বাবার কাছে দিয়ে গিয়েছিলেন তখন থেকে এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর কাছছাড়া হইনি, সারাক্ষণ সঙ্গে সঙ্গেই ছিলাম। বাবার সঙ্গেই সেদিন স্নান করেছি, খেয়েছি, দুপুরে দিবানিদ্রা দিয়েছি। বাবাও নিঃশব্দে কেমন যেন অপরাধীর মত আমাকে আগলে আগলে থেকেছেন। আর মা দূর থেকে তীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ চোখে সর্বক্ষণ আমাদের পাহারাই দিয়ে গেছেন বুঝি, আমরা কি করি, কি বলি তার ওপর অপলকে লক্ষ্য রেখেছেন।

মনে আছে, সেদিন আর অফিসে যান নি দাদু। বিকেল বেলা ঘুম থেকে আমাদের ডেকে নিয়ে চা আর পাঁপরভাজা খেতে খেতে গল্প জুড়ে দিয়েছিলেন। আর আমি বেড়ালছানার মত বাবার গায়ে গা লাগিয়ে একবার দাদু আরেক বার বাবার পাঁপরে ভাগ বসাচ্ছিলাম।

দাদু শুধিয়েছিলেন, 'তারপর মাধব, কত বছর পর এলে বল তো?'

'আজ্ঞে তিন বছর।'

'কাল বলেছিলে অমরকণ্টক থেকে ফিরছ।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তিন বছর আগে এখান থেকে গিয়ে কি এতগুলো দিন ঐ অমরকণ্টকেই ছিলে?'

'আজ্ঞে না।' বাবা বলেছিলেন, 'তিন বছর ধরে এক জায়গায় থাকব কি। এখান থেকে প্রথমে গিয়েছিলাম দেওঘর। সেখানে থেকে শোনপুরের মেলা দেখে সোজা প্রভাস তীর্থ। প্রভাস থেকে দ্বারকা, গিরনার হয়ে গিয়েছিলাম রাজকোট। দু-বছর এভাবে কাটিয়ে এসেছিলাম অমরকণ্টকে। বাকি একটা বছর সেখানেই ছিলাম। অমরকণ্টক থেকেই কাল রাত্তিরে সোজা বিবিবাজারে এসেছি।'

খানিক কি ভেবে দাদু বলেছিলেন, 'ভেবে ভেবে একটা বিষয়ে আমি কূলকিনারা পাই না মাধব। যত ভাবি [illegible] অবাক হয়ে যাই।'

'কী বিষয়ে?' বাবা জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলেন।

'এই যে এত দেশ ঘোরো, হাতে তো একটা পয়সা নিয়ে বেরোও না। কী

খাও, কোথায় থাকো, গাড়ি ভাড়ার টিকিটই বা কিভাবে কাটো—আমি তো কিছুই ভেবে পাই না।'

মৃদু হেসেছিলেন বাবা, 'সব ব্যবস্থা একরকম করে হয়েই যায়।'

'না-না, এড়িয়ে গেলে চলবে না। কিভাবে কি কর, বলতে হবে।' দাদু নাছোড়।

একটু চুপ করে থেকে বাবা বলেছিলেন, 'গাড়িতে তো আমি উঠি না, কাজেই টিকিট কাটার হাঙ্গামা নেই।'

'গাড়িতে ওঠো না তো অত দূর দূর দেশে যাও কি করে?'

'হেঁটে।'

'হেঁটে!' দাদু হতবাক।

'হ্যাঁ।' আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছিলেন বাবা। মুখে সেই স্নিগ্ধ হাসির রেখাটুকু লেগেই ছিল, 'যখন যা পাই, খাই। এ দেশের নাম ভারতবর্ষ, দুয়ারে গিয়ে দাঁড়ালে কেউ আর ফেরায় না। দুয়ারেই বা যেতে হবে কেন, মুখ দেখেই লোকে টের পেয়ে যায় খেয়েছি কিনা? আর থাকার কথা? ওটা কোন সমস্যাই না। কোথাও মাথা গুঁজতে না পাই, মাঠ-ঘাট-গাছতলা এগুলোর ওপর কেউ তো দখলী স্বত্ব নিয়ে বসে নেই।'

বিমূঢ় মুখে দাদু বলেছিলেন, 'এত কষ্ট করে ঘুরে বেড়িয়ে কী লাভ?'

'কী লাভ!' বাবার চোখে সকালবেলার সেই অপরিচিত দূরমনস্ক দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল, 'গাড়িতে চড়ে হুশ করে যদি ছুটে যাই, বড় বড় শহরে গিয়ে দামী দামী হোটেলে যদি উঠি, কতটুকুই বা দেখতে পাব। তাতে করে এই বিশাল দেশের কিছুই চেনা হবে না, তার অগণিত মানুষকে অনুভব করা যাবে না, প্রকৃতি চারদিকে যে অফুরন্ত মেলা সাজিয়ে রেখেছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যত্ন করে না দেখলে তার কতটুকু বা জানতে পারব! গাড়ি চড়ে আয়েশ করে এই বিচিত্র দেশের মর্মকে জানা যাবে না, কোনদিনই সেভাবে তার সন্ধান পাব না।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। বাবার উদ্দীপ্ত আপ্লুত কণ্ঠস্বরে সেদিন আমাদের বাড়ির বাতাসে ঘর-পালানো।

একসময় দাদু ডেকেছিলেন, 'আচ্ছা মাধব—'

'বলুন—' তৎক্ষণাৎ বাবার সাড়া পাওয়া গেছে।

'এই বয়েসে কত তীর্থ তো ঘুরলে। কোথায় প্রভাস' কোথায় দ্বারকা, কোথায় পক্ষীতীর্থম্—কিছুই বাকি রাখোনি। সাধুসঙ্গও অনেক করেছ। কাল যে কথাটা

ঘুরে হত্যে পেড়ে গিয়েছিলাম, এখন তা বল। সিদ্ধপুরুষ টুরুষ কারো দেখা পেয়েছ?'

বাবা হেসে ফেলেছিলেন।

দাদু শুধিয়েছিলেন, 'হাসলে যে?'

'এত সাধুর মেলায় কে সিদ্ধ আর কে অসিদ্ধ, কেমন করে বুঝব। তবে কোন কোন সাধু সম্বন্ধে অলৌকিক অনেক গল্প শুনেছি। নিজের চোখে অবশ্য কিছু দেখিনি।'

দাদু সাগ্রহে বলেছিলেন, 'কি গল্প শুনেছ, বল।'

'প্রভাসে এক সাধু দেখেছি, তাঁর বয়েস নাকি ন'শ বছর, তিনি পাওহারী বাবা। হাওয়া ছাড়া কিছুই খান না। অথচ চেহারাখানি মোটেই শীর্ণ নয়, রীতিমত মৈনাক পর্বত একটি। তিনি নাকি হাজার বছর বাঁচবেন বলে শিষ্যদের জানিয়েছেন, পৃথিবীতে যখন কল্কী অবতার নামবে তখন দেহরক্ষা করবেন। আরেক সাধুকে দ্বারকায় দেখেছি, তিনি গলা পর্যন্ত মাটির ভেতর ঢুকিয়ে দিনের পরদিন, মাসের পর মাস ঐভাবে পড়ে আছেন। তিনি নাকি হাওয়াও গ্রহণ করেন না, শ্বাস রুদ্ধ করে কয়েক শ বছর একইভাবে আছেন। আর এক সাধু শুনেছি, পেচ্ছাব-পায়খানা করে তা-ই খেতেন। কেউ কিছু চাইলে মল-মূত্রই খানিকটা ছুঁড়ে দিতেন। হাত পেতে ভক্তিভরে কেউ তা নিলে দেখতে পেত, হয় একটি ফল হয়ে গেছে নতুবা ফুল। আর ঘৃণা করলে সর্বাঙ্গ জ্বলে যেত। অমরকণ্টকে এক সাধুর সংস্পর্শে এসেছিলাম, তিনি আমাকে আশ্চর্য করে দিয়েছিলেন।'

'কি রকম, কি রকম—' উৎসাহে দাদু ঘন হয়ে বসেছিলেন।

বাবা বলেছিলেন, 'একদিন সকালবেলা কুণ্ডে স্নান করে উঠে আসছি, একটা ঝাঁকড়া বটগাছের তলা থেকে এক সাধু আমার নাম ধরে ডাকলেন, আমি তো অবাক, সাধু আমার নাম জানলেন কেমন করে? যাই হোক, পায়ে পায়ে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সাধু গড় গড় করে আমার সংসার সম্বন্ধে সব কথা বলে গেলেন। তারপর জানালেন, পঁচিশ বছর ধরে তিনি নাকি আমার জন্যে ওখানে অপেক্ষা করছেন। খুব শিগ্‌গিরই নাকি তাঁর দেহান্ত ঘটবে। প্রয়াণের আগে তাঁর পরমাত্মার ইচ্ছা, আমার দেহের আধারে প্রবেশ করবেন এবং সেখানেই তাঁর নতুন বসতি হবে।'

'বল কি হে।'

বাবা চুপ করে থেকেছেন।

দাদুর আগ্রহ তখন শীর্ষবিন্দুতে। চোখেমুখে সারাদেহে বিস্ময় ফুটিয়ে বলেছিলেন,

'তারপর কী হল মাধব?'

বাবা বলেছিলেন, 'আমায় সামনে বসিয়ে ছুই কাঁধে হাত রেখে চোখ বুজে বিড় বিড় করে কি যেন মন্ত্র পড়েছিলেন সাধু, মাঝে মাঝে জোরে জোরে ফুঁ দিচ্ছিলেন। এইভাবে অনেকক্ষণ কাটবার পর বলেছিলেন, যা বেটা, আমার পরমাত্মা তোর ভেতর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।'

'ঐ ঘটনার পর নিজের মধ্যে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করেছ?'

'আজ্ঞে না, কিছুই বুঝতে পারিনি। তা ছাড়া—'

'কী?'

থেমে থেমে আস্তে আস্তে বাবা বলেছিলেন, 'ও সবের প্রতি আমার মোহ নেই। আমি শুধু দেখতে চাই। পৃথিবী জুড়ে এত মানুষ এত রূপের খেলা—তার মধ্যে হারিয়ে যেতেই আমার আনন্দ।'

দাদু ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, 'না-না, ওটা কোন কাজের কথা নয়। কার ভেতর কি আছে, কেউ বলতে পারে! সিদ্ধ পুরুষদের করুণা হলে সব পাওয়া যেতে পারে। সমস্ত বাসনা-কামনা পূরণ হতে পারে। তাঁদের হেলাফেলা ক'রো না, কিছু পাবার চেষ্টা ক'রো।'

দাদুর কাছে পাওয়ার নিয়ম একটাই। সেটা হল মোটা দাগের সাংসারিক নিয়ম। তাঁর মতে ইচ্ছাপূরণ এক ভাবেই হতে পারে, তা অর্থে। বিত্ত, সম্পদ—এ সব থেকে নিঙড়ানো সুখই দাদুর কাছে শেষ কথা। আনন্দকে তিনি পেতে চান সম্ভোগে, বিলাসে, দৈহিক আরামে, সুখাদ্যে, স্বাদু পানীয়ে।

দাদুর উপদেশ বাবাকে প্রভাবিত করেছিল কিনা বুঝতে পারিনি। তবে এটুকু বুঝেছিলাম, বাবার দু-চোখে শুধু তৃষ্ণা আর তৃষ্ণা। সে তৃষ্ণায় শেষ নেই, নির্বাণ নেই। বিচিত্র মানুষকে দেখবেন তিনি, ফুল দেখবেন, পাখি দেখবেন, লতাগুল্ম দেখবেন, অফুরন্ত ঝর্ণা দেখবেন, তরঙ্গিত পর্বতমালা দেখবেন, সফেন সমুদ্র দেখবেন, ঊষর-ধূসর প্রান্তর দেখবেন। দেখবেন আর এই বিপুল দেশের হৃদ্‌স্পন্দন অনুভব করবেন। দেখবেন আর মুগ্ধ হবেন, অভিভূত হবেন, রোমাঞ্চিত হবেন। প্রাণ ভরে তাঁর শুধু রূপের সরোবর চোখের সরোবর তাঁর সর্বক্ষণ দেখার নেশায় টলমল, আচ্ছন্ন।

অশ্রান্ত পথচলায় কোথায় কী পেলেন আর কী হারালেন সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। দেখলেন, তাই তাঁর আনন্দ। অনুভব করলেন, তাই সর্বসুখ। ভুবনজোড়া রহস্যের মাঝখানে বিলীন হয়ে যেতে পারলেন তা-ই তো পরম পাওয়া। এর বাইরে তাঁর কোন প্রত্যাশা নেই। আর এমন কোন প্রলোভন বা আকর্ষণের

শক্তি নেই যা তাঁকে বিচলিত বিভ্রান্ত করতে পারে।

দাছ আবার বলেছিলেন, 'আমার কথাটা মনে রেখ মাধব, দু-চারদিনের বেশি তো তোমাকে এখানে ধরে রাখতে পারব না, একদিন নিশ্চয়ই পালাবে। আবার যদি সাধুসঙ্গ হয় ছাড়বে না, যতক্ষণ না কিছু পাচ্ছ, লেগে থাকবে।'

বাবার স্থায়ী কোন ঠিকানা নেই। স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের কাছে দু-চার দিনের জন্য আসেন, তারপর মন উড়ু উড়ু হলেই পালান। তাঁকে যে ধরে রাখা যায় না, ইচ্ছা হলে নিজেই যে তিনি পা পেতে বসবেন তেমন স্বভাবই তাঁর নয়। দু'দিন যেতে না যেতেই পা তাঁর অজান্তে চুলবুলিয়ে ওঠে। পলাতক মানুষটি কয়েক বছর পর ঘুরে ঘুরে এসে ক্ষণিকের অতিথি হন, এটুকু সান্ত্বনা। বাবার ঘর পালানোতে সবাই এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে এ ব্যাপারে আর চমক নেই। দাছ যে তাঁর পালানোর কথাটা বলেছিলেন, সেটা কিছু না ভেবেই। অভ্যাসবশে।

বাবা কি বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই মায়ের তীক্ষ্ণ চাপা গলার ডাক আমার কানে এসেছিল, 'বকু—'

আমি চকিত হয়ে মুখ ফিরিয়েছিলাম। মা কাছেও ছিলেন না, আবার দূরেও যাননি। বারান্দার এক প্রান্তে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। চোখোচখি হতেই আগের স্বরে বলেছিলেন, 'হাঁ করে খালি গল্প গেলা হচ্ছে, উঠে আয়।'

উঠবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও আমার ছিল না। ভয়ে ভয়ে বাবার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। বাবা তাকিয়েছিলেন মায়ের দিকে। মায়ের দৃষ্টি ছিল আমার ওপর নিবদ্ধ।

বাবার চোখে অনুনয় ছিল। গল্পের আসরে আমি থাকি সেটা যাতে মা মঞ্জুর করেন সে জন্যে তিনি যেন প্রার্থনা করছিলেন।

মা কিন্তু হৃদয়হীনা, নিষ্ঠুর। ভুলেও বাবার দিকে তাকান নি। অগত্যা কি আর করা, ধীরে ধীরে বাবার মুখ মলিন হয়ে গিয়েছিল। তিনি চোখ সরিয়ে নিয়েছিলেন।

সেই শঙ্কাঘন মুহূর্তে নিজেকে নিয়েই আমার উৎকণ্ঠিত থাকার কথা। তবু বিদ্যুৎ-চমকের মত মনে হয়েছিল মা-বাবার মধ্যে কি কথা বন্ধ! চোখ দিয়ে যতটুকু বলা সম্ভব ততটুকুই বলছেন বাবা, মুখ ফুটে কিছুই উচ্চারণ করেন নি।

বাবার দিকে তাকিয়েও যখন ফল হল না তখন উচ্চতর আদালতে আবেদন পেশ করেছিলাম। দাছর কানে ফিসফিসিয়ে বলেছিলাম, 'তুমি মাকে বল, আমি এখন যাব না।'

দাছ আমার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন, 'থাক না বড় খুকি, কদ্দিন পর ছেলেটা

বাপকে পেয়েছে। একটু বসুক, বাপকে চিনুক।'

বিদ্রূপে চোখের তারা ধারাল ছুরির মত ঝলকে গিয়েছিল মায়ের। বলেছিলেন, 'বাপ চিনে আর দরকার নেই।'

'কী বলছিস বড় খুকি!'

'যা বলছি তা তোমার না বোঝার কথা নয় বাবা।'

বিব্রত বিচলিত দাদু মেয়েকে ধমক দিয়েছিলেন, 'আঃ, বড় খুকি। মাথাটা কি তোর একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে! কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বসেছিস!'

'তুমি আমাকে যত খুশি বকতে পার বাবা—' মা একই সুরে বলেছিলেন, 'কিন্তু সত্যি কথা আমি বলবই। বাপ চিনলে বকুর ক্ষতি হবে, তার চাইতে বেশি ক্ষতি হবে আমার। সারা জীবন আমার শুধু লোকসানের পালা, তার ওজন আমি আর বাড়াতে দেব না।'

দাদু স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। মেয়ে তাঁর চিরদিনই তীক্ষ্ণভাষিণী, নির্দয়। মনে যা আসে মুখে তা নির্মমভাবে বলে ফেলেন। যার উদ্দেশে বলা তার বুকে কতখানি বিঁধল, কতখানি রক্ত ঝরল, সেদিকে তাঁর বিন্দুমাত্র খেয়াল থাকে না। ঘোরের মধ্যে, আত্মবিস্মৃতের মত জ্ঞানশূন্যের মত বলেই যান। তাই বলে আমাকে এবং বাবাকে নিয়ে সবার সামনে এমন রূঢ় মন্তব্য তিনি করতে পারেন তাও বুঝি দাদুর পক্ষে অভাবিত ছিল। অকল্পনীয়ও। কথার পিঠে কথা বলা নিয়ম। একটা কি উত্তর দিতে চেষ্টা করেছিলেন দাদু, গলায় স্বর ফোটেনি।

এবার মা আমার দিকে ফিরেছিলেন, 'উঠে আয় বকু, উঠে আয়। পড়াশোনা তোমার গোল্লায় যাচ্ছে। স্কুলে যাওয়া নেই, বইয়ের পাটও চুকে গেছে। এখন শুধু গল্প আর গল্প, আড্ডা আর আড্ডা। উঠে আয় বাঁদর।'

ভোরবেলা বাবার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে দুপুরে ফিরেছিলাম। আজ আর স্কুলে যাওয়া হয়নি। তাই নিয়ে দুপুরে একবার তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিলেন মা। মার-ধোর বকাবকি যা কিছু আমার ওপর দিয়েই বয়ে গেছে কিন্তু মায়ের আক্রমণের লক্ষ্য বোধ হয় আমি ছিলাম না। মায়ের হাতের কঞ্চি আমার পিঠে যত দাগ বসিয়েছে তার হাজার গুণ কেটে কেটে বসেছে বাবার প্রাণে। পিঠ কেটে যে রক্ত ঝরে তা সবাই দেখে। সবার অলক্ষ্যে বুকের ভেতর যে শোণিতক্ষরণ তা দেখার চোখ ক'জনের?

দাদু এতক্ষণে খানিকটা ধাতস্থ হতে পেরেছিলেন বোধ হয়। বলেছিলেন, 'আরে বাপু, একটা দিন না পড়লে বিদ্যাসাগর হওয়া আটকাবে না। সব সময় ছেলেটাকে এমন দাঁতে কাটিস না বড় খুকি?'

মা উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নি। আমার চোখে দৃষ্টি স্থির রেখে বলেছিলেন, 'এই শেষবার বলছি, উঠে আয়! না এলে চুলের ঝুঁটি ধরে তুলে আনব। কেউ তোকে রক্ষা করতে পারবে না।'

আর বসে থাকার মত দুঃসাহস আমার প্রাণে অবশিষ্ট ছিল না। সম্মোহিতের মত পায়ে পায়ে উঠে গিয়েছিলাম, মা আমাকে একটা ঘরে পুরে দিয়ে বলেছিলেন, 'জোরে জোরে পড়তে থাকো।' বলে বাইরে গিয়ে দরজায় শেকল তুলে দিয়েছিলেন।

বাংলা বইখানা সামনে মেলে ধরে আমি কিন্তু একটা অক্ষরও দেখতে পাচ্ছিলাম না, চোখের জলে সব ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল। পড়ার নামে মুখস্থ একটা পদ্য চেঁচিয়ে আউরে যাচ্ছিলাম ঠিকই কিন্তু কান্না মেশানো স্বরটা নিজের কানে দুর্বোধ্য লাগছিল।

পিঞ্জরে পুরে দিয়েছিলেন মা কিন্তু তাঁর সাধ্য কি মনটাকে আটকান। আমার ধ্যানজ্ঞান সব পড়ে ছিল বারান্দার কোণটিতে, বাবা আর দাদু যেখানে বসে আছেন।

শুনতে পাচ্ছিলাম দাদু বাবাকে বলছেন, 'তুমি কিছু মনে করো না মাধব। বড় খুকির মাথাটা কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেছে। একেবারে পাগল—'

দাদুর সান্ত্বনা কিভাবে বাবা গ্রহণ করেছিলেন বলতে পারব না। তবে তাঁকে জবাব দিতে শুনিনি।

আবহাওয়াটাকে লঘু করার জন্য দাদু আবার বলেছিলেন, 'অনেক দেশ তো ঘুরলে মাধব, তা খাবার দাবার কোন্ দেশে ভাল মেলে?'

বাবা যেন অন্যমনস্কের মত উত্তর দিয়েছিলেন, 'সব দেশেই ভাল খাবার আছে।'

'না মাধব, না।'

'কী?'

'বাংলা দেশের মত এমন সন্দেশ-রসগোল্লা-দই-কাঁচাগোল্লা কোথাও তুমি পাবে না।'

'তা হয়ত পাব না, আবার উত্তর প্রদেশের মত প্যাঁড়া, নাগপুরের মতন কলাকন্দ, বৃন্দাবনের মত রাবড়ীও তো এখানে মিলবে না। একেক দেশের খাবারে একেক রকম বিশেষত্ব। এক জায়গায় সঙ্গে আরেক জায়গার তুলনা চলে না।'

'তাই বোধ হয় ঠিক।'

ঘরে বসেই টের পাচ্ছিলাম, আসর জমছে না। দাদুর প্রশ্নের উত্তরে ছাড়া ছাড়া উত্তর দিচ্ছিলেন বাবা।

দাদু কিন্তু নাছোড়। ভোজনরসিক মানুষটি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বাবার কাছ

থেকে নানা দেশের সুখাদ্যের তালিকা সংগ্রহ করে যাচ্ছিলেন। সে সব খাবারের আস্বাদ তিনি কোনদিন পাননি, নামগুলো শুনেই রোমাঞ্চিত হচ্ছিলেন।

কথায় কথায় মাংসের প্রসঙ্গ এসেছিল। জলচর, স্থলচর, নভোচর—তিন ভুবনের কোন্ প্রাণীটির মাংস সবচেয়ে সুস্বাদু তাই নিয়ে দাদু বিষম চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছিলেন।

দাদুর মতে কচ্ছপের মাংসই শ্রেষ্ঠ, বাবার কিন্তু এ ব্যাপারে ভিন্ন মত। সবিনয়ে তিনি জানিয়েছিলেন, কক্কুটই স্বাদুতম।

দাদু বলেছিলেন, 'মুরগী আমি খাইনি, তবু বলব কচ্ছপের সঙ্গে তার তুলনা হয় না।'

'আমি মুরগী খেয়েছি। পাঁঠা খেয়েছি, জলপিপি-শূকর-হাঁস-ডাক পাখি-পায়রা-খরগোস—প্রায় সব মাংসই খেয়েছি। আমার তো মনে হয়, অমন মাংস হয় না।'

'তুমি কচ্ছপ খেয়েছ?' দাদুর স্বর শুনে মনে হয়েছিল তিনি যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

'আজ্ঞে না।'

'বেশ, এখুনি আমি নিয়ে আসছি। খেয়ে বল, কোনটা ভাল।'

বাবা বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন, 'না-না, এখন আর কষ্ট করে যাবেন না।'

দাদুর গলা এবার চাপা শুনিয়েছিল, 'আরে বাপু, কষ্টটা কি তোমার জন্যেই শুধু করব! তোমার নাম করে আনলে আমরাও ভাগ পাব তো। ভালমন্দ কতকাল যে মুখে দিইনি। যে ক'দিন আছ, খাবার দাবার আনলে বাধা দিও না। ঐ বড় খুকি—' বলতে বলতে থেমে গিয়েছিলেন।

দাদুর যুদ্ধং দেহিটা তা হলে নিতান্তই ছলনা। মায়ের জন্য ভাল কিছু বাড়িতে আনতে পারেন না। তাই কি সঙ্গোপনে জামাই-এর সঙ্গে চুক্তি করে নিয়েছিলেন, তাঁর নাম করে জগতের সব সুখাদ্য নিয়ে আসবেন। বদ্ধ খাঁচায় বসে আমার শুধু জানতে ইচ্ছা করছিল মা কি এখন বারান্দায় নেই, শ্বশুর-জামাইএর গোপন বোঝা-পড়ার কথা কি তিনি জানতে পারেন নি?

দাদু কিন্তু সেদিন সে মুহূর্তে কচ্ছপের মাংস যোগাড় করতে ছুটেছিলেন।

মনে পড়ে সেদিনও আগের রাত্তিরের মতই শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল। বাবা-মা এক ঘরে, আমরা ভাইবোন সমেত দাদু-দিদিমা আর এক ঘরে।

খাওয়া-দাওয়ার পর আমি কিন্তু বাবার কাছছাড়া হইনি। আগের রাত্রে ইচ্ছাপূরণ হয়নি। পুরো একটা দিন বাবার সঙ্গে সঙ্গে থেকে আড়ষ্টতা কেটে গিয়েছিল। এক ফাঁকে বলেছিলাম, 'বাবা, আমি আজ তোমার কাছে শোব কি?'

'নিশ্চয়ই শুবি—' বাবা সস্নেহে আমার মাথায় হাত রেখেছিলেন।

'গল্প বলতে হবে।'

'কিসের গল্প ?'

'সাধুদের। ঐ যে দাদুকে বলছিলে।'

সাধুদের গল্প কেন শুনতে চেয়েছিলাম, নিজের কাছেই তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। সম্ভবত বাবা দাদুর কাছে সাধুদের যে অলৌকিক কাহিনী বলেছিলেন আমাকে তা মুগ্ধ করে থাকবে।

বাবা ঠাট্টা করে শুধিয়েছিলেন, 'এত গল্প থাকতে সাধুদের গল্প শুনতে চাইছিস যে খোকা! সাধু-সন্ন্যাসী হবি নাকি ?'

আমি লজ্জা পেয়ে মুখ নামিয়ে নিয়েছি, উত্তর দিইনি।

যাই হোক, খেয়ে দেয়ে দাদুর সঙ্গে গল্প করে আমরা শুতে গিয়েছিলাম। বিশাল তক্তাপোষের একধারে আমি, মাঝখানে বাবা আর এক ধারের শূন্য জায়গাটা মায়ের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

মা তখনও রান্নাঘরে, দিদিমার সঙ্গে খেতে বসেছিলেন। আর আমি শুয়ে শুয়ে বাবার গল্প শুনছিলাম।

মনে পড়ে সেদিন গল্প শুনতে শুনতে রাত ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল। কোতোয়ালী থানার পেটা ঘড়িতে একে একে দশটা, এগারোটা, অবশেষে বারোটা বেজে গিয়েছিল। মা তবু শুতে আসেন নি। রান্নাঘরে বসে বসে কি যে তিনি করছিলেন কে বলবে।

এদিকে আমার চোখের পাতা ধীরে ধীরে ভারী হয়ে একসময় বুজে গিয়েছিল। তারপর সব কিছু নিরবয়ব, অন্ধকার, অস্তিত্বহীন।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম, মনে নেই। চাপা ফিসফিসানিতে হঠাৎ জেগে গেছি। শীতের দিনে চিরকাল পা থেকে মাথা পর্যন্ত মুড়িসুড়ি দিয়ে আমার শোবার অভ্যাস। কম্বল সরিয়ে সন্তর্পণে চোখ দু'টি বার করতেই যা চোখে পড়েছিল তা যেমন চমকপ্রদ তেমনি অভাবিত। এমন দৃশ্য আমার সুদূর কল্পনাতেও বুঝি ছিল না। বাবা বিছানার ওপর বসে ছিলেন আর মা দরজায় পিঠ দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে।

বাবা অনুচ্চ কোমল স্বরে ডাকছিলেন, 'সুনু এসো—'

মা নিশ্চুপ।

দাদু-দিদিমা মাকে 'বড় খুকি' ডাকতেন। তা ছাড়াও 'সুনু' বলে আর একটা আদরের নামও যে তাঁর আছে এবং সে নামে একমাত্র বাবাই যে তাঁকে ডাকেন, সে খবর জানতাম না। তখন আমার কী করণীয়, আবার কম্বলটা মাথা পর্যন্ত টেনে

দেব? নাকি পাশ ফিরে শোব? কম্বলও টানি নি, পাশ ফিরেও শুইনি। এমন অভাবনীয় দৃশ্যের সাক্ষী থাকার লোভ কিছুতেই মুছে দিতে পারছিলাম না। অতএব চোখ দু'টি অর্ধেক বুজে বুকের ভেতর শ্বাস আটকে অসাড় দেহে পড়ে ছিলাম।

বাবা আবার ডেকেছিলেন, 'কাছে এসো সুনু—'

মা নিরুত্তর।

এবার বাবা উঠে গিয়ে মায়ের একটা হাত ধরে বিছানায় এনে বসিয়ে দিয়ে ছিলেন। বলেছিলেন, 'কাল এসেছি। পুরো একটা দিনের ওপর কাটিয়ে দিলাম। এখন পর্যন্ত একটা কথা বলনি। কাল রাত্তিরে মেঝেতে গিয়ে শুয়ে রইলে। ডাকাডাকি করলাম, কাছে এলে না। আজও দূরে দূরেই রয়েছ। আমি আসাতে তুমি কি খুশি নও সুনু?'

মাকে ঠিকমত দেখতে পাচ্ছিলাম না, বাবার আড়ালে তিনি বসে ছিলেন। কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টানা, ডান গালের একাংশ, শুভ্র সুগোল একটি হাত, ধারাল চিবুক, ভুরুর খানিকটা, দীর্ঘ চোখের পল্লব—মাত্র এইটুকুই আমার চোখে পড়ছিল।

আস্তে আস্তে দু-হাতে মুখ ঢেকে জোরে জোরে মাথা নেড়েছিলেন মা, 'আমি কি সে কথা বলেছি?

আমি চমকে উঠেছিলাম। মায়ের গলা কেমন যেন কান্নায় ভেজা। চিরদিন মায়ের একটা রূপই আমার চেনা—রূঢ়, উগ্র, তীক্ষ্ণভাষিণী। তাঁর এই রূপান্তর আমাকে বিমূঢ় করে দিয়েছিল।

বাবা বলেছিলেন, 'বলো নি, তবে হাবেভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছ।'

মা একথার উত্তর দেন নি, মুখ থেকে হাতও সরান নি।

বাবা আবার বলেছিলেন, 'আমার কাছে আসোনি, কথা বলনি—তা না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু ছেলেটাকে সন্ধ্যেবেলা আমার কাছ থেকে তুলে নিয়ে গেলে কী বলে? সকালবেলা বেড়াতে বেরিয়েছে বলে কিরকম মারলে! আসলে ওকে তো মারো নি, মেরেছে আমাকে।' বাবার চোখ-মুখ-কণ্ঠস্বর আহত অভিমানে থমথম করছিল। তিনি থামেন নি, 'এসবের অর্থ কী? ছেলেকে বাপের কাছ থেকে দূরে রাখতে চাও—কেন? কেন? কেন? এসব দিয়ে আমাকে কী বোঝাতে চাও তুমি? এর চাইতে মুখ ফুটে স্পষ্ট করে বল, কাল সকালে উঠেই আমি চলে যাব। কাল কেন, আজই এখুনি চলে যাব। চোখের সামনে ছেলেটার ওপর এমন মারধোর আমি দেখতে পারব না।

আগেই টের পেয়েছিলাম আমাকে নিয়ে মা-বাবার মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। সে রাত্রে সেটা চূড়ান্তে পৌঁছেছিল। নাকি কথাটা ঠিক না, আমাকে উপলক্ষ্য করে

মা-বাবা পরস্পর জটিল গভীর একটা কিছু বোঝাপড়া করে নিচ্ছিলেন ?

সিক্ত জড়িত গলায় মা বলেছিলেন, 'সাধে কি আর মেরেছি, কত দুঃখে যে বকুর গায়ে হাত তুলেছি—'

'শুধু আজকেই না, যখন তখন তুমি মার।'

'কে বললে ?'

'যে-ই বলুক, কথাটা তো সত্যি।'

মা চুপ। শুধু মুখ থেকে হাত সরিয়ে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার বাবাকে দেখে চোখ নামিয়ে নিয়েছিলেন।

বাবা আবার বলেছিলেন, 'মারধোরই করো না, ছেলেমেয়েগুলোকে ভালমন্দ কিছু খেতেও দাও না। কেন ?'

মা বলেছিলেন, 'এ খবরও পেয়ে গেছ ?'

'হ্যাঁ, গেছি।'

'একটা দিনের ভেতর কম খবর তো যোগাড় কর নি। তা নালিশগুলো করলে কে ? বাবা, না বকু ?'

'যে-ই করুক, অস্বীকার করতে পারবে ?'

'পারব না, করবও না।'

'শুধু শুধু ছেলেমেয়েগুলোকে এমন কষ্ট দিচ্ছ কেন ?'

'শুধু শুধু নয়।'

'তবে ?'

'সে তুমি বুঝবে না।'

'বুঝিয়ে দিলে বুঝব না কেন ?'

মুখ তুলে বাবার চোখে দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ করে মা বলেছিলেন, 'তুমি অন্ধ, কিছুই দেখতে পাও না, কিছুই দেখতে চাও না। বিয়ের পর মেয়েদের বাপের সংসারে থাকাটা যে কতখানি লজ্জার, কতখানি অসম্মানের তা যদি তুমি বুঝতে! একে পরের সংসারে বোঝা হয়ে আছি, তার ওপর ছেলেমেয়েদের যদি ভালমন্দ খাওয়াই-পরাই, সে গ্লানি আমার পক্ষে অসহ্য। তা আমি সইতে পারব না।'

আমাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের একটা ব্যাখ্যা যেন পেয়ে গিয়েছিলাম। এদিকে বাবার মুখ পলকে রক্তশূন্য। নিষ্প্রাণ স্বরে বলেছিলেন, 'কিন্তু—'

'কী ?'

'তোমার বাবা-মা কি পর ? এ তুমি কী বলছ!'

'বিয়ের পর বাপের সংসার মেয়েদের কাছে পরের সংসারই।'

'তা ছাড়া তোমার বাবা তো তোমাদের গলগ্রহ ভাবেন না।'

'বাবা কি ভাবলেন না ভাবলেন তাতে আমার কি যায় আসে! এ সংসারে আছি, তাতে লজ্জায় প্রতি মুহূর্তে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে, মুখ তুলে কারো দিকে তাকাতে পারি না পর্যন্ত। অথচ—'

বাবা এবার কিছু বলেন নি। পাংশু মুখে নিস্পন্দের মত বসেই ছিলেন। মা বলে যাচ্ছিলেন, 'অথচ আমার নেই কী? তুমি বিদ্বান, পণ্ডিত। শুধু যদি একটু সংসারী হতে, আমাদের দিকে যদি একটু চোখ ফেরাতে, আমাদের ওপর যদি তোমার বিন্দুমাত্র মায়া থাকত, তা হলে এমন অবস্থা হত না। দশজনের মত আমিও মাথা তুলে থাকতে পারতাম।'

আমার সেই বয়েসে এত সব কথা বুঝবার নয়। তবু মা যে বাবার সঙ্গে কথা বলেছেন, জমাট-বাঁধা কঠিন বরফস্তূপ যে গলে যাচ্ছে, সেটুকুই আমার স্বস্তি। যে বাতাস বুকের ভেতর আবদ্ধ করে নিস্পন্দের মত পড়ে ছিলাম, সহজ নিশ্বাসে এত-ক্ষণে তা বেরিয়ে এসেছিল।

বাবা বলেছিলেন, 'তোমার দুঃখ আমি বুঝি সুমু—'

'ছাই বোঝো।'

'বিশ্বাস কর সুমু, তোমাকে না বোঝার মত অমানুষ আমি নই।'

'তা হলে এমন করো কেন? কেন এমন করো?' অবুঝ বালিকার মত স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন মা।

'কী করি?'

'বার বার পালাও।'

বাবা তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন নি। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে গম্ভীর অন্যমনস্ক সুরে বলেছিলেন, 'পারি না সুমু। দু-চারদিন এক জায়গায় হয়ত রইলাম, তারপরেই কে যেন ভেতর থেকে ক্রমাগত ফিসফিসিয়ে বলতে থাকে, পালা, পালা। বলে আর ধাক্কা দেয়। আর আমিও নিজের অজান্তে কখন যেন পথে গিয়ে নামি। এই আমার স্বভাব, আমার নিয়তি। তবে—'

'কী?' মায়ের দু চোখ উৎসুক, ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।

'এবার আমি মনস্থির করে ফেলেছি।'

'কিসের মনস্থির?'

'এখন থেকে আমি তোমাদের কাছেই থাকব।'

'বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করি না। এ মিথ্যে, এ তোমার স্তোক।' জোরে

জোরে প্রবল বেগে সমানে মাথা নেড়ে গিয়েছিলেন মা।

পরম স্নেহে মায়ের কাঁধে একটি হাত রেখে বাবা বলেছিলেন, 'মিথ্যে নয়, স্তোক নয়। এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি মৃন্থ।'

'পা ছুঁয়ে তো আরো কতবার বলেছ। কিন্তু একবারও কি কথা রেখেছ? তোমার মুখের কথায় বিশ্বাস কী?'

'অন্ত বারের কথা বাদ দাও। এই বারটা, শুধু এই বারটা তুমি দেখ।'

'কেন, এইবারে কী?'

'এবারে এসে খোকাকে দেখলাম কত বড় হয়ে গেছে। কত চালাক-চতুর। ওকে ছেড়ে আর পালাতে পারব না, ও-ই আমার পায়ে বেড়ি দিয়েছে।'

'ও—ও, আমার জন্তে তা হলে নয়, খোকার জন্তে থাকবে? বেশ বেশ, আমি তো আর পারলাম না, খোকাই তোমাকে বাঁধুক।' অভিমানে ঠোঁট স্ফুরিত হয়েছিল মায়ের। কাঁধ থেকে বাবার হাতখানা ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন।

বাবা প্রথমটা হতবাক। তারপর রহস্তময় মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'খোকাকেও হিংসে!'

'হ্যা, হিংসে। আমার রূপ নেই, যৌবন নেই, দেখতে আমি কুচ্ছিৎ কালপেঁচা —কী দিয়ে তোমাকে ধরে রাখব! খোকাই তোমাকে ধরুক।'

আমার রাগী মা যে এত অভিমানিনী, এমন অবুঝ অবোধ শিশু, কে তা জানত। অভাবনীয় একটি দৃশ্ত দেখতে দেখতে বিস্ময়ে, উত্তাপ আবেগে কখন আধেক-বোজা চোখ দু'টি পুরোপুরি মেলে ফেলেছিলাম, খেয়াল নেই।

বাবা ঠেলে-দেওয়া হাতখানা আবার মায়ের কাঁধে তুলে দিয়েছিলেন, 'তুমি বড্ড ছেলেমানুষ মৃন্থ, বড্ড ছেলেমানুষ। নিজের ছেলেকেও হিংসে করছ।'

'ছেলেমানুষ তো ছেলেমানুষ। হিংসে করছি বেশ করছি। ভাল করছি।' মায়ের গলার স্বর কেমন যেন গাঢ়, চোখের তারায় বিগলিত তরল হাসি।

বাবা এবার হেসে ফেলেছিলেন।

খানিকক্ষণ নীরবতা। তারপর বাবাই আবার শুরু করেছিলেন, 'ভাবছি, একটা চাকরি-বাকরি নেব। শ্বশুরমশায়কে বললে তাঁর অফিসে ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন না?'

'পারবেন বোধ হয়, তুমি বাবাকে বোলো।'

'আচ্ছা।'

কি খানিক ভেবে মা বলেছিলেন, 'চাকরি হলে আমাদের আলাদা বাসা করবে তো?'

বাবা বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই করব।'

মা এবার দু-হাতে বাবার কাঁধটা আঁকড়ে তার ওপর মুখখানি রেখেছিলেন। চোখে-ঠোঁটে-গালে হাসি যেন উছলাচ্ছিল। হৃদয় মথিত হয়ে দলিত হয়ে কিসের এক আলো উথলে উঠে মুখখানিতে মাখামাখি হয়ে যাচ্ছিল। এর নাম যদি সুখ হয়, এর নাম যদি পরম পাওয়া হয়, তবে বলব মা আমার একেবারেই বালিকা, বড় স্বল্পতুষ্ট। এতটুকুর জন্যে আমাদের ওপর তাঁর এত নিষ্ঠুর এত কঠোর হবার প্রয়োজন ছিল না।

অনেক, অনেকক্ষণ মা ঐ একইভাবে মুখখানি রেখে বসে ছিলেন। আর আমিও নির্নিমেষে সেই অভাবনীয় দৃশ্যটি দেখে দেখে মুগ্ধ অভিভূত হয়ে যাচ্ছিলাম। আমার ছোট্ট হৃৎপিণ্ড বার বার তরঙ্গিত হয়ে যাচ্ছিল, উচ্ছ্বসিত হচ্ছিল, বিপুল আবেগে ফেটে চুরমার হয়ে যাবে মনে হচ্ছিল।

একসময় কোতোয়ালীর পেটা ঘড়িতে জানান দিয়েছিল, দুটো বাজে।

বাবা আস্তে আস্তে ডেকেছিলেন, 'সুনু, অনেক রাত হয়েছে। শোবে না?'

মা নিশ্চুপ, নিথর।

বাবা আবার ডেকেছিলেন, 'সুনু—'

প্রগাঢ় স্বরে মা বলেছিলেন, 'আঃ, একটু চুপ করে থাকো তো বাপু।'

আরো কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মত এলিয়ে থাকার পর মা আস্তে আস্তে মুখ তুলেছিলেন। আর সেই সময় কাণ্ডটা ঘটে গিয়েছিল, কপাল থেকে টুপ করে ঘোমটাটা খসে পড়েছিল।

বাবা মায়ের দিকে তাকিয়েই ছিলেন। হঠাৎ দৃষ্টিটা বিস্ময়ে চকিত হয়ে উঠেছিল। নিজের অজ্ঞাতসারেই মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, 'বাঃ! বাঃ!'

আমিও অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম। আগে লক্ষ্য করিনি, মা আমার পাতা কেটে চুল বেঁধেছেন, মস্ত খোঁপার রূপোর ফুল-বসানো কাঁটা গুঁজে দেওয়া। চোখে কাজলের সরু টান, মুখে পাউডারের সূক্ষ্ম প্রলেপ। পরনের শাড়িটি সাদা রেশমী। সর্বাঙ্গ থেকে মৃদু সুখকর সুরভি উঠে আসছিল। নাকে মুক্তোর নাকছাবিটি দিয়েছেন, হাতভর্তি চুড়ি, গলায় সীতাহার, অনামিকায় পাথর-বসানো আংটি। কোনদিন মাকে ভাল জামাকাপড় বা গয়না পরতে দেখিনি। 'সাজসজ্জা' শব্দটা তাঁর কাছে অপরিচিত। এলোমেলো জটবাঁধা চুল, ময়লা শাড়ি, বিষণ্ণ কঠিন মুখ—মায়ের ঐ রূপটিই চিরদিনের চেনা। আমার যোগিনী মা যে এমন করে সাজতে পারেন, নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়নি। চোখ দুটি ক্রমশ বড়, আরো আরো বড় করে আমি শুধু দেখছিলাম আর দেখছিলাম।

বাবা বলেছিলেন, 'সাজলে টাজলে তোমাকে তো বেশ দেখায়।'

মা দু-হাতে মুখ ঢেকে লজ্জা-থরথর স্বরে বলেছিলেন, 'যাও।'

বাবা জোর করে মায়ের মুখ থেকে হাত সরিয়ে কী বলতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় মায়ের সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়ে গিয়েছিল। বিব্রত হতবাক মা বলেছিলেন, 'ও মা, তুই এখনও ঘুমোস নি!'

আমি কী উত্তর দিয়েছিলাম অথবা তার পর কী ঘটেছিল, মনে নেই। এত কথা মনে আছে কিন্তু স্মৃতির ঐ জায়গাটা একেবারে ঝাপসা, কুয়াশায় বিলীন।

আট

পরের দিন সকালে ফীটনে করে হীরু এসে হাজির।

মনে পড়ে ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে বারান্দায় বসে বাবা, দাদু আর আমি পরটা-বেগুনভাজা এবং চা খাচ্ছিলাম। মা-দিদিমাও চায়ের কাপ হাতে অদূরে বসে।

সদরে ফীটন থামিয়ে ছুটে ভেতরে ঢুকেছিল হীরু। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা আমার কাছে এসে বলেছিলে, 'কাল স্কুলে যাস নি যে?'

আমি উত্তর দেবার আগেই হীরু আবার বলেছিল, 'আমাদের বাড়ি রোজ যাস, কাল গেলি না কেন? কী হয়েছিল?'

হীরুদের বাড়ি যাওয়াটা প্রত্যহের নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। একটা দিন নিয়মভঙ্গ হওয়াতে হীরু ছুটে এসেছে। বলেছিলাম, 'আমার বাবা এসেছে, তাই যাই নি।'

হীরু প্রথমটা অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর বলেছিল, 'তোর বাবা!'

'হ্যাঁ রে, এই তো—' আমি বাবাকে দেখিয়ে দিয়েছিলাম।

হীরু বাবাকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনাকে কী বলে ডাকব?'

'কী বলবে, কী বলবে—' বাবা সঠিক উত্তরটা সেই মুহূর্তে যেন খুঁজে পাননি।

বারান্দার আর এক প্রান্ত থেকে মা বলেছিলেন, 'মেসোমশাই বলে ডেকো। কেমন?'

হীরু ঘাড় কাত করে জানিয়েছিল, তা-ই ডাকবে। তারপর বাবাকে প্রশ্ন করেছিল, 'আচ্ছা মেসোমশাই, আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন? বকুর সঙ্গে কতদিন এসেছি, আপনাকে তো দেখিনি।'

বাবা বলেছিলেন, 'আমি একটু কাজে বাইরে গিয়েছিলাম।'

'কী কাজে?'

বাবা বিব্রত, অপ্রতিভ। হীরুর প্রশ্নের উত্তরটা খুঁজতে দিশেহারার মত এদিক-সেদিক তাকাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত দিদিমা সেই অস্বস্তিকর অবস্থাটা থেকে বাবাকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'তোমার মেসোমশাই আপিসের কাজে বাইরে গিয়েছিলেন।'

হীরু বলেছিল, 'আপনাকে তো আগে দেখিনি, বকুও আপনার কথা বলে না। আমরা ভেবেছি বকুর বুঝি বাবাই নেই।'

বাবা চুপ। হীরুর দিকে তিনি যেন আর তাকিয়ে থাকতে পারছিলেন না, চোখ দুটো নামিয়ে নিয়েছিলেন। তার প্রশ্নগুলো এ বাড়ির প্রতিটি মানুষের মনে কী নিদারুণ প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে চলেছে তা যদি হীরু বুঝতে পারত, তা হলে বোধ হয় ঐ শরাঘাতগুলো হানত না।

একটু কি ভেবে হীরু এবার আমার দিকে ফিরেছিল, 'কাল আমাদের বাড়ি যাস নি, আজ কিন্তু যেতে হবে। এক্ষুনি আমার সঙ্গে যাবি।'

বাবার সঙ্গ ছাড়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও আমার ছিল না। অন্য সব দিন হীরুদের বাড়িটা প্রবল আকর্ষণে আমাকে অবিরত হাতছানি দিতে থাকে। আর সম্মোহিত আমি, কুহকিত আমি—ছুটে যাই। কিন্তু সেদিন সমস্ত আকর্ষণের মেলা আমাদের বাড়িতেই সাজানো ছিল। আর তার কেন্দ্রে যিনি বসে ছিলেন তিনি বাবা।

বাবার কাছে আরো একটু ঘন হয়ে বসে বলেছিলাম, 'বা রে, এখন তোর সঙ্গে যাব কেমন করে?'

'কেন?'

'স্কুলে যেতে হবে না?'

'আজ কী বার, ভুলে গেছিস?'

'কী বার?'

'রবিবার। রবিবারে তোর জন্যে স্কুল বসবে' খন। নে, চল্।'

দিনটা রবিবার, খেয়াল ছিল না। তবু স্কুলে যাবার অজুহাতটা কাজে লাগেনি দেখে বিপন্নই বোধ করেছিলাম। হাতের কাছে এমন আর কিছুই খুঁজে পাওয়া যায়নি যা দিয়ে হীরুদের বাড়ি যাওয়া ঠেকানো যেতে পারে। অগত্যা সোজাসুজি বলেছিলাম, 'আমি এখন যাব না।'

'হ্যাঁ, যাবি—' হীরু জেদ ধরেছিল।

'না, যাব না। বাবা এসেছে।'

'মেসোমশাই তো থাকবেনই। তুই চল্, 'মা তোকে যেতে বলে দিয়েছে।'

'উঁহু—'

এবার হীরু বাবার কাছে দরবার করেছিল, 'ও মেসোমশাই, আপনি একটু বলে দিন না। নইলে বকু যাবে না। বলুন না একটু—'

বাবা মুখ নামিয়ে বসে ছিলেন। চোখ তুলে বলেছিলেন, 'যা খোকা, ও এত করে বলছে।'

দাদু-দিদিমা বাবার সুরে সুর মিলিয়েছিলেন, 'যা।'

আমি বলেছিলাম 'না—'

মা এতক্ষণ একটা কথাও বলেন নি। এবার ধমকে উঠেছিলেন, 'ছেলেটা সকালবেলা নিতে এসেছে, যা বলছি। অন্য দিন তো ওদের বাড়ি যাবার জন্যে নাচতে থাকিস। যত সব আদিখ্যেতা—'

দিদিমা বলেছিলেন, 'বকিস নি বাপু। জ্ঞান হবার পর এই তো প্রথম বাপকে পেয়েছে, এখন গায়ে গায়ে একটু লেগে থাকবেই। যা দাদাভাই, হীরু-দাদার সঙ্গে যা।'

অগত্যা উঠতেই হয়েছে। বাবার দিকে তাকিয়ে করুণ সুরে বলেছিলাম, 'হীরুদের বাড়ি গিয়ে একটুখানি থেকেই চলে আসব। তুমি আবার চলে যাবে না তো?'

বাবা বলেছিলেন, 'না রে বাপু, না। তুই ঘুরে আয়।'

হীরুর পিছু পিছু সদরের দিকে যেতে যেতে বাবার গলা কানে এসেছিল। দিদিমাকে তিনি জিজ্ঞেস করছিলেন, 'ছেলেটি কে?'

'হীরু। বকুর সঙ্গে পড়ে। এক দিনে স্কুলে ভর্তি হয়েছে।'

'খোকার খুব বন্ধু বুঝি?'

'হ্যাঁ। একেবারে গলায় গলায় ভাব। রোজ একবার করে ওদের বাড়ি বকুর যাওয়া চাই, হীরুরও আসা চাই এ বাড়িতে।'

'ছেলেটা বেশ চালাক-চতুর আর চটপটে তো।'

'হ্যাঁ।'

'কোন বাড়ির ছেলে?'

'আমাদের এই রাস্তার শেষ মাথায় লাল রঙের প্রকাণ্ড যে বাড়িটা রয়েছে, সেইটা ওদের। হীরুরা খুব বড়লোক। তাই বলে একেবারেই অহঙ্কার নেই। ওর বাবাও একদিন আমাদের বাড়ি এসেছিলেন।'

হীরুর বাবা রোজ আমাকে তাঁদের বাড়ি যাবার জন্য মাকে অনুরোধ করতে এসেছিলেন। দিদিমা সেকথা বাবাকে বলছিলেন। শুনতে শুনতে আমি ফাঁটনে গিয়ে উঠেছিলাম।

হীরুদের বাড়ি আসতেই হীরুর মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কাল আসো নি কেন বকু ?'

কেন আসিনি, বলেছিলাম।

বাবার কথা শুনে হীরুর মা-ও অবাক হয়েছিলেন। সে প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্ন না করে বলেছিলেন, 'কাল আসো নি, আমরা ভেবেছি অসুখ টসুখ করল কিনা। এদিকে হীরু একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছে, আমাদেরও ভাবনা হচ্ছিল। আজ সকালে হীরুটাকে আর ধরে রাখা গেল না। আমরাও বললাম, যা বকুকে নিয়ে আয়।'

হীরুর বাবাও কাছাকাছি ছিলেন। সস্নেহে বলেছিলেন, 'তুমি আসতে আসতে এমন হয়ে গেছে যে হঠাৎ একদিন না এলে ভাল লাগে না। এবার থেকে কিন্তু রোজ এসো। কেমন ?'

'আচ্ছা।' আমি ঘাড় কাত করেছিলাম।

হীরুর বাবা বলেছিলেন, 'তুমি তো বললে তোমার বাবা এসেছেন।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এতদিন কোথায় ছিলেন ?'

বাবার মুখে কাল শুনেছিলাম, সরাসরি অমরকণ্টক থেকে তিনি আসছেন। সেই কথাটাই হীরুর বাবাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম।

'অমরকণ্টক!' হীরুর বাবাকে চিন্তিত দেখিয়েছিল, 'সেটা কোথায় বল দেখি—'

'আমি জানি না।'

'উনি কি সেখানে চাকরি-বাকরি করেন ?'

'জানি না।'

আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন হীরুর বাবা, হীরুর মা তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিলেন, 'ও কি অতশত জানে। ছেলেমানুষকে এ সব জিজ্ঞেস করতে নেই। যাও বকু, তুমি খেলা কর গে।'

আমি বেঁচে গিয়েছিলাম যেন। বাবার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই আমার জানা নেই। জ্ঞান হবার পর সেই প্রথম তাঁকে দেখেছি। সোজা অমরকণ্টক থেকে তিনি বিবিবাজারে এসেছেন, চমৎকার চমৎকার গল্প করতে পারেন, চোখের দৃষ্টি স্নেহ-কোমল। মাঝে মাঝে কেমন যেন সুদূর আর অন্যমনস্ক হয়ে যান, তখন আর তাঁকে

চেনা যায় না, ধরাছোঁয়া যায় না। বাবার সম্বন্ধে এটুকুই আমার জানা, এর বাইরের আর সব কিছুই অপরিচয়ের অন্ধকারে ঘেরা। কাজেই বাবা কী করেন, এতকাল কোথায় থাকতেন ইত্যাদি ইত্যাদি প্রশ্নগুলো করলে আমার পক্ষে বিব্রত হবার কথা। উত্তরে আমাকে চুপ করেই থাকতে হয়েছে।

ফীটন থেকে নেমে হীরু তার মা-বাবার হাতে আমাকে সঁপে দিয়ে দোতলায় চলে গিয়েছিল। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, সবাই আমার কাছে ভিড় করে এসেছে কিন্তু ঝুলনকে কোথাও দেখতে পাচ্ছিলাম না। এই বিশাল বাড়ির কোন প্রান্তে যে সে আত্মগোপন করেছিল, কে বলবে।

হীরুর মা-বাবার কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে হীরুর খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিলাম। একতলার দীর্ঘ করিডর দিয়ে প্রায় উর্ধ্বশ্বাসেই ছুটছিলাম। পথটার দু-ধারে লম্বা-লম্বা কাচের জলাধারে লাল-নীল মাছেদের খেলা। বড় হয়ে জেনেছিলাম, ওগুলোর নাম একুয়েরিয়ম। শুধু লাল-নীল মাছই না, তারের জাল দিয়ে ঘেরা বাক্সে খরগোস, বাঁদর, বেজি, পায়রা—এ সবও রয়েছে। তা ছাড়া বাড়িময় কুকুর-বেড়াল-কাকাতুয়া-ময়না, আরো কত কি যে আছে তার হিসেব নেই। হীরুর বাবার পাখি এবং পশু-প্রীতি এ শহরে প্রবাদের মত।

নির্জন করিডর ধরে ছুটছিলাম। হঠাৎ প্রকাণ্ড একটা একুয়েরিয়মের পাশ থেকে আস্তে করে কে যেন ডেকে উঠেছিল, 'এই বকুদা—'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। চমকে চোখ তুলে দেখি, ঝুলন।

ঝুলনের সঙ্গে দেখা হওয়া মানেই অনিবার্য যুদ্ধ। অবশ্য আঘাতটা একতরফা, সবগুলো তীরই সে হানবে, আমাকে শুধু মুখ বুজে সইতে হবে। আমার দিক থেকে পাল্টা ঘা দেবার কোন সম্ভাবনাই নেই।

অতএব শ্বাস রুদ্ধ করে প্রস্তুত হচ্ছিলাম। ঝুলন পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছিল। চিরদিন যেমন তাকায় তেমনি ভুরু কুঁচকে, হাত দু-খানি পেছনে মুষ্টিবদ্ধ করে, ঠোঁট টিপে বিশ্লেষণী চোখে অনেকক্ষণ আমাকে দেখেছিল। তারপর বলেছিল, 'খুব ভাঁট হয়ে গেছে তোমার, না?'

ঝুলনের সামনে চিরদিনই আমি বোবা, সেদিনও আমার মুখে কথা যোগায় নি। চোখ নামিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে ছিলাম। ভাঁটটা আমার কোনদিক থেকে হ'ল, কখন কীভাবে প্রকাশ করে ফেলেছি, বুঝতে পারছিলাম না। জিজ্ঞেস করে যে জানব, তেমন দুঃসাহসটুকু আমার মধ্যে কোথাও খুঁজে পাইনি।

ঝুলন আবার বলেছিল, 'বাবুকে বাড়ি থেকে সেধে না আনলে আসে না।

ই-হি-হি-হি—' কথার শেষে জিভ ভেংচে দিয়েছিল।

আমি যথারীতি চুপ।

ঝুলন আবার বলেছিল, 'আসো নি কেন কাল ?'

এতক্ষণে স্বর ফুটেছিল আমার গলায়, 'বাবা এসেছে যে।'

'তোমার আবার বাবা আছে নাকি ?'

আমি ঘাড় কাত করে জানিয়েছিলাম, আছে।

'এ্যাদ্দিন তো মায়ের কথা বলেছ, দাদুর কথা বলেছ, দিদিমার কথা বলেছ, বাবার কথা বলনি। বাবাটা এল কোত্থেকে ?'

সেই বয়েসেই ঝুলনের রসনা ছিল খুরধার, কথায় ছিল রীতিমত বাঁধুনি।

জড়িয়ে জড়িয়ে বাবা কোথা থেকে এসেছেন, জানিয়েছি।

আরো কিছুক্ষণ সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে তীক্ষ্ণ ধারাল দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাকে দেখেছিল ঝুলন। খুব সম্ভব আমার কথায় কতখানি সত্যতা আছে বুঝতে চেষ্টা করছিল।

অবশেষে মুক্তি পেয়েছিলাম। ঝুলন বলেছিল, 'দোতালায় তোমার বন্ধু ছটফট করছে, যাও।'

বলামাত্র আমি উধাও। এক এক লাফে চারটে করে সিঁড়ি পেরিয়ে নিমেষে দোতালায় হীরুর ঘরে চলে এসেছিলাম।

হীরুর ঘরখানা প্রকাণ্ড। এখানে খেলাধুলোর সরঞ্জাম প্রচুর। এক দিকে টেবিল টেনিস খেলার ব্যবস্থা, আর এক দিকে ক্যারম, লুডো, ট্রাই সাইকেল, বাঘবন্দী খেলার কোর্ট, ইঞ্জিনীয়ারিং খেলার বাক্স, ঘরবাড়ি তৈরির জন্য কাঠের টুকরো, আলমারিতে রঙচঙে ছবির বই, মজার মজার গল্পের বই। একধারে লোহার দাঁড়ে ছোট একটা বাঁদর ছানা রয়েছে। হীরুর এটা খুব প্রিয়। ঘরে ঢুকে দেখি হীরু সেটাকে কাঁচা চীনাবাদাম খাওয়াচ্ছে। আমার পায়ের শব্দে চোখ ফিরিয়ে বলেছিল, 'কি রে, এত দেরি করলি ?'

'মেসোমশাই-মাসিমা আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। তারপর ঝুলন ধরল।'

হীরু কি বলতে যাচ্ছিল, এই সময় ঝুলন এসে হাজির। এত তাড়াতাড়ি সে এল কী করে ? আমার মতই লাফে লাফে সিঁড়ি ডিঙিয়ে নাকি ?

এক বছরের মত এ বাড়িতে আমার যাওয়া-আসা। হীরু আর আমি যখন এই ঘরখানিতে বসে ক্যারম খেলতাম কি ছবির বই দেখতাম, সেই সময় সামনের করিডরে ঘোরাফেরা করত ঝুলন আর তীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ চোখে অনেকখানি বিদ্বেষ পুরে আমাকে বিদ্ধ করতে থাকত। ঘোরাফেরা করত আর দেখতই শুধু,

কিন্তু এক বছরের তিন'শ পঁয়ষট্টি দিনে ভুল করে একবারও এ ঘরে আসেনি। চৌকাঠ বরাবর অদৃশ্য একটা গণ্ডি কোথাও টানা ছিল। অলিখিত চুক্তির ফলে সেটা পেরুত না ঝুলন।

আশ্চর্য, সেদিন কিন্তু চুক্তি-লঙ্ঘন করে সোজা সেই ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল ঝুলন।

ঝুলনের সঙ্গে হীরুর সম্পর্ক ছিল যুদ্ধের। কাছাকাছি এলেই সংঘাত অনিবার্য। আমার সামনেই কতবার যে তাদের মারামারি রক্তারক্তি হতে দেখেছি, হিসেব নেই। তবুও আমি বুঝতাম, এই নিদারুণ বৈরিতা পারস্পরিক টানেরই আর এক নাম।

ঝুলন দরজা পেরিয়ে ভেতরে আসতেই হীরু চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'এখানে আসতে তোকে কে বলেছে?'

'কে আবার বলবে, আমিই এসেছি।' ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ঝুলন। তার গলার স্বরে এবং দাঁড়াবার ভঙ্গিতে যুদ্ধ ঘোষণা ছিল।

'বেরো বাঁদরী—'

'না।'

'হ্যাঁ, বেরুবি।'

'না।'

'তবে রে—' লাফিয়ে ঝুলনের ঘাড়ের ওপর পড়ে হীরু চুলের মুঠি ধরেছিল।

বাস্, লড়াই শুরু। হীরু ছেলে, তার ওপর বয়েসেও বড়। অতএব শারীরিক শক্তিও তুলনায় বেশি এবং তা প্রয়োগের কৌশলও অনেক বেশি পরিমাণে তার আয়ত্তে। কিন্তু মেয়ে হয়েও ঝুলন কম যায় নি। যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর মত তুমুল লড়াই চালিয়ে গিয়েছিল।

প্রথমে ততটা গুরুত্ব দেয়নি হীরু, ঝুলনের চুলের মুঠি ধরলেও জোরে টান লাগায় নি। কিন্তু ঝুলন যখন চোখের কাছটা খিমচে কোমরে কামড় বসিয়ে মাংস ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম করেছে তখন টের পাওয়া গেছে প্রতিপক্ষটি খুব সোজা নয়, সহজে তাকে বিধ্বস্ত করা যাবে না। অতএব শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চুলে টান লাগিয়েছে হীরু, সেই সঙ্গে বৃষ্টির মত চলছিল কীল, চড়, লাথি, ঘুষি।

আগেও দুই ভাইবোনের লড়াই দেখেছি কিন্তু সেগুলো ছোটখাটো সংঘর্ষ মাত্র। নখের ঘায়ে খানিকটা ছাল ওঠা কিংবা ঘুষির চোটে নাক ফেটে দু-চার ফোঁটা রক্তপাত—তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু এবার যা ঘটতে চলেছে তা রীতিমত ভয়াবহ, পানিপথ অথবা হলদিঘাটের যুদ্ধের মত মারাত্মক কোন ঐতিহাসিক ঘটনা।

কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে দু'জনকে দেখেছি। ঝুলনের ধারাল নখে, তীক্ষ্ণ দাঁতে হীরুর চোখের কোল, গাল এবং কোমর রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। ঝুলনের

অবস্থাও কিছু ভাল নয়, তার নাকমুখ কেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটেছে।

সব চাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার, এমন একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গেছে অথচ এতটুকু শব্দ নেই। ঘটেছে একান্ত নিঃশব্দে, নীরবে। শুধুমাত্র আমাকে সাক্ষী রেখে একটা বিশ্বযুদ্ধের মহড়া চলছিল।

কী করব, কী করা উচিত, ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। বিমূঢ় বিস্ময়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ কর্তব্যটা মনে পড়ে গিয়েছিল। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে হীরুর মা আর বাবাকে ডেকে এনেছিলাম। তাঁরা হীরু আর ঝুলনকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

হীরুর বাবা হীরুর গালে একটা চড় কষিয়ে বলেছিলেন, 'অসভ্য ছেলে, ছোট বোনের সঙ্গে মারামারি করছ?'

ঝুলনের দিকে তাকিয়ে রাগে ফুলছিল হীরু চড় খেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, 'ওই পেত্নীটা আমার ঘরে ঢুকল কেন?'

'ঢুকলেই মারামারি বাধাতে হবে?'

ওদিকে হীরুর মা মেয়ের গাল টিপে হেসে ফেলেছিলেন, 'তুই বাপু সাঙ্ঘাতিক পাজী হয়ে উঠেছিস ঝুলন। মেয়ে হয়ে ছেলেদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাস। দাদা চায় না তবু ওর ঘরে গিয়েছিলি কেন?'

ঝুলন বলেছিল, 'খেলতে।'

হীরু ভেংচে উঠেছিল, 'এ-হে-হে-হে, খেলতে! তোর সঙ্গে কে খেলবে রে কালপেঁচী!'

ঝুলনও একই রকম মুখভঙ্গি করেছিল, 'হনুমান, তোর সঙ্গে খেলতে আমার বয়ে গেছে।' জিভ বার করে বুড়ো আঙুল নাচিয়ে সে-ও ভেংচি কেটেছিল।

হীরুর বাবা ধমকে উঠেছিলেন, 'আবার—আবার ঝগড়া শুরু হ'ল?'

বাবার ধমক অগ্রাহ্য করে হীরু চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'আমার সঙ্গে না তো কার সঙ্গে খেলতে রে বাঁদরী?'

'বকুদার সঙ্গে।'

'বকুদার সঙ্গে!' আগের মতই ভেংচে ভেংচে বলেছিল হীরু, 'আমার বন্ধু তোর সঙ্গে কক্ষনো খেলবে না, কক্ষনো না।'

'আর গোলমাল নয়, এবার নিচে চল্। রক্ত ধুয়ে আইডিন লাগাতে হবে।' ছেলেমেয়েকে নিয়ে হীরুর মা-বাবা একতলায় নেমে গিয়েছিলেন, আমি তাঁদের অনুসরণ করেছিলাম।

আইডিন-টাইডিন লাগানো হলে হীরু আর আমি ওপরে চলে আসছিলাম কিন্তু

আসা হয় নি। ঝুলন হঠাৎ পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে গিয়েছিল। যে মেয়ে এতবড় রক্তারক্তির পরও অবিচলিত, হঠাৎ তাকে কাঁদতে দেখে সবাই হতবাক।

হীরুর বাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কাঁদছিস কেন রে ?'

'বকুদা ওপরে যাবে না।'

'যাবে না তো কী করবে ?'

'আমার ঘরে গিয়ে আমার সঙ্গে খেলা করবে। ও বাঁদর সেখানে যাবে না।'

হীরু এবার তিড়বিড় করে লাফিয়ে উঠেছিল, 'না, কিছুতেই না। আমার বন্ধু ওই কালপেঁচার সঙ্গে খেলবে না।'

ঝুলন কাঁদছিল আর জেদী স্বরে ঘ্যান ঘ্যান করছিল, 'ও বাবা, তুমি বকুদাকে বল না আমার সঙ্গে খেলতে। ও বাবা—'

কানে হাত চেপে হীরুর বাবা অসহায় মুখে বলেছিলেন, 'মাথার পোকা একেবারে নড়িয়ে ছাড়লে! যাও বকু, ঝুলনের সঙ্গে একটু খেলে এসো।'

হীরু বলেছিল, 'বকু যাবে না, ও আমার বন্ধু।'

'বাঁদরামি করলে কিন্তু খুব মার খাবি হীরু। তোর বন্ধু তো কী হয়েছে ? ঝুলনের সঙ্গে একটু খেলে তারপর তোর সঙ্গে খেলবে।'

হীরু সাহস করে আর কিছু বলেনি, তবে রাগে ক্ষোভে অপমানে তার চোখ দুটো যেন ফেটে যাচ্ছিল।

আর আমি পড়ে গিয়েছিলাম দোটানায়। হীরুকে ফেলে যেতেও পারি না, আবার হীরুর বাবাকে অমান্য করার সাধ্যও নেই। শেষ পর্যন্ত কাঁপা পায়ে ঝুলনের সঙ্গে তার খেলার ঘরে গিয়েছিলাম। অনুভব করছিলাম, পেছনে দাঁড়িয়ে নিষ্পলকে হিংস্র চোখে আমাকে বিদ্ধ করছে হীরু।

ঝুলনের খেলার ঘরখানা হীরুর মতই। টেবল টেনিসটা বাদ দিলে আর যা-যা সাজানো আছে আমার সেই বয়েসটাকে মুগ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট।

ঝুলনের সঙ্গে প্রথমে কিছুক্ষণ লুডো খেলেছিলাম, তারপর ক্যারম। মনে পড়ে খেলার পর পরম উদারতায় চারখানা ছবির বই আমাকে উপহার দিয়েছিল ঝুলন।

হীরুর কথা ভুলিনি, তেমন অকৃতজ্ঞ আমি নই। অতএব বই পাওয়া হয়ে গেলে জানিয়েছিলাম, 'এবার যাই, হীরু খুব রেগে আছে।'

ঝুলন বিবেচকের মত বলেছিল, 'আচ্ছা।'

আমি বেরিয়ে আসছি, ঝুলন ডেকেছিল, 'বকুদা—'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। ঝুলন এবার বলেছে, 'তুমি রোজ আসবে তো ?'

'আমি তো রোজই আসি

কাল এসেছিলে ?'

'কাল বাবা এসেছিল যে—'

'বাবা আসুক আর যে-ই আসুক, তুমি রোজ আসবে। আর—'

'কী'

'দাদার সঙ্গে খেলবার আগে আমার সঙ্গে খেলবে।'

'হীরু যদি রাগ করে ?'

'কেঁদেকেটে তা হলে আমি বাড়ি মাথায় করে ফেলব। খেলবে তো ?'

দ্বিধান্বিত অনিশ্চিত স্বরে উত্তর দিয়েছিলাম, 'আচ্ছা।'

ঝুলনের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে দোতলায় গিয়ে দেখি হীরু গাল ফুলিয়ে মুখ কালো করে বসে আছে। আমাকে দেখেই ক্ষেপে উঠেছিল, 'যা-যা, আজ থেকে তুই আমার বন্ধু না। আমার সঙ্গে খেলতে হবে না। ঐ বাঁদরীর সঙ্গে খেল গে।'

কত সাধ্যসাধনা করে যে সেদিন হীরুর রাগ ভাঙিয়েছিলাম সে শুধু আমিই জানি।

সেদিনই আমার দিকে প্রথম হাত বাড়িয়েছিল ঝুলন। হীরুর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ধরে আমার এ বাড়িতে যাওয়া-আসা। সেই সম্পর্কটায় সেদিন থেকে ভাগ বসাতে শুরু করেছিল ঝুলন। ভাগাভাগির খেলায় হীরুর দিকের পাল্লাটা তখনও অনেক বেশি ভারি, আমার ওপর তার প্রায় সম্পূর্ণ অধিকার। কিন্তু একদিন ওই ঝুলন, যার ভাল নাম কুমারী নলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার ভিতর-বাহিরের, আমার বলতে যা কিছু সবটুকুই দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু সে সব পরের কথা। তবে সেদিন ঝুলন যে আমাকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল তার মধ্যেই আমার নিয়তি গভীর রেখায় নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

প্রথম পরিচয়ের দিনটি থেকে ঝুলনের এত বিদ্বেষ এত বিরূপতা, এত দূরে দূরে থাকা—তার সমস্ত কিছুর তলায় যে বিপরীত আরেকটি খেলা ছিল কে তা জানত।

নয়

এতকাল পর বাবা ফিরে আসতে সবাই খুশি।

দাদু খুশি, কেননা তিনি ভোজনরসিক। জিভখানি ভাল ভাল খাবারের ধ্যানে সবসময় তাঁর সরস লালায়িত হয়ে আছে। বাবা আসার আগে জিভখানাকে সংযত রাখতে হয়েছিল। দুঃখে দাদু একেবারে মুহ্যমান হয়ে ছিলেন। বাবা আসাতে মর্মবেদনা একেবারে ঘুচে গিয়েছিল। দাদুর উৎসাহ তখন ভাখে কে।

সকালে উঠেই দাদু ছুটতেন পাকা রুই অথবা চিতলের পেটির সন্ধানে। বিকেলে অফিস থেকে ফিরে ছুটতেন মাংস কি নতুন গুড় কিংবা শীতের প্রথম দুর্লভ আনাজটির খোঁজে। এই পায়েসের জন্য বাসমতী চাল আনছেন, এই যোগাড় করছেন দুধ, এই আনছেন ক্ষীর। মোট কথা তাঁর সমস্ত উদ্দীপনা, ধ্যান ভাল ভাল খাবারের মধ্যে সঁপে দিয়েছিলেন।

একদিন দেখি এক হাঁড়ি জয়নগরের মোয়া বারান্দায় নামিয়ে রেখে বাড়ির বাইরে সদর দরজাটার পাশে একা একাই হেসে খুন হয়ে যাচ্ছেন দাদু। আমি অবাক। বলেছিলাম, 'কি, অমন হাসছ যে?'

দাদু বলেছিলেন, 'আনন্দে।'

'আনন্দে!'

'হ্যাঁ রে, দাদাভাই। মোয়াগুলো যা চমৎকার, মুখে দিলে ননীর মত গলে যাবে। যা স্বাদ, যা খুসবাই!'

'মোয়া এনে আনন্দ হয়েছিল, তা বাড়িতে হাসলেই পারতে।'

'বাড়ির ভেতর কী করে হাসব!'

'কেন?'

'সেখানে তোর বাবা আছে না? জামাইএর কাছে মোয়ার আনন্দে হাসলে সে কি ভাববে! মনে করবে শ্বশুর ব্যাটা কি লোভী আর হ্যাংলা রে।'

দাদুর মত দিদিমাও খুব খুশি। সেটা ভালমন্দ খাবারের প্রলোভনে নয়। এতদিন পর জামাই এসেছে, বাড়িময় এতদিনের বদ্ধ রুদ্ধশ্বাস আবহাওয়া কেটে গিয়ে ঝিরঝিরে দক্ষিণা বাতাস বইতে শুরু করেছে, এতে কোন শাশুড়ী না সুখী হতে পারে।

জ্ঞান হবার পর বাবাকে সেই আমার প্রথম দেখা। বাবাকে পেয়ে আমি উচ্ছ্বসিত, সম্মোহিত। আমার হৃৎপিণ্ড অথৈ আনন্দে দুর্বার বেগে ওঠানামা করতে শুরু করেছিল। স্কুলের কয়েকটা ঘণ্টা আর হীরুদের বাড়ি কিছুক্ষণ—এই সময়টুকু ছাড়া সারা দিনরাত আমি বাবার কাছছাড়া হতাম না। সর্বক্ষণ তাঁর পায়ে পায়ে জড়িয়ে তাঁর সঙ্গে স্নান, তাঁর সঙ্গে ঘুম, তাঁকে ঘিরেই আমার জীবনের আহ্নিকগতি ক্রমশ দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠেছিল।

সব চাইতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন মায়ের। যে মাকে চিরদিন যোগিনী বেশে দেখেছি, চিরদিন যিনি রাগী, নিষ্ঠুর, মমতাহীন, তাঁকে যেন আর চেনা যাচ্ছিল না। সেদিন রাতে বাবার সঙ্গে সন্ধি হবার পর থেকেই মায়ের এতদিনের চেনা রূপটা বদলে গিয়েছিল। চিরকাল নিজেকে অবহেলাই করেছেন মা, চিরকাল নিজের দিকে

মুখ ফিরিয়েই থেকেছেন। বাবার সঙ্গে সন্ধির সেই রাতটিকে শাড়িতে-গয়নায় এবং প্রসাধনে সেই যে নিজেকে সাজিয়েছিলেন তারপর থেকে সেই বেশেই তাঁকে দেখেছি। এতকাল আত্মপীড়নের পর মা নিজের দিকে চোখ ফিরিয়েছিলেন, সেই প্রথম নিজের সম্বন্ধে মনোযোগী হয়েছিলেন। আমার ওপর তাঁর বিদ্বেষ বা বিরূপতা বিন্দুমাত্র ছিল না। কোমল, সদয়, স্নেহময়ী হয়ে উঠেছিলেন।

লক্ষ্য করেছি চলতে-ফিরতে মায়ের পায়ে পায়ে খুশি যেন উছলে পড়ত। তাঁর চোখমুখ থেকে এমন দীপ্তি বিচ্ছুরিত হত, আগে আর কখনও তা দেখিনি।

মনে পড়ে, সেদিন ভোরবেলা বাবার সঙ্গে দিগন্তবিসারী প্রান্তরে অকারণ পথচলার পরিণাম হয়েছিল মারাত্মক, বাড়ি ফিরে মায়ের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়েছিলাম। কিন্তু বাবার সঙ্গে মায়ের বোঝাপড়া হয়ে গেলে আমার যেন সুদিন এসে গিয়েছিল।

বাবা শুধু সেদিনই না, রোজ ভোরে এবং বিকেলে—দুবেলাই আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুতেন। সেই আদিগন্ত মাঠখানা যেখানে গিয়ে ফুরিয়ে গেছে সেটি একটি অথৈ-অকূল বিল। একেক দিন তালের ডোঙা যোগাড় করে আমাকে তুলে বাবা ভেসে পড়তেন।

যে বাবাকে বাড়ির সংক্ষিপ্ত সঙ্কীর্ণ পরিবেশে দু-হাতের বেড়ে ধরতে পারতাম, খোলামেলা অবাধ দিগন্তে এসে তিনি একেবারে অধরা। সেখানে তিনি উদাসীন বাউল আত্মবিস্মৃতের মত দূরমনস্কের মত কোন অচেনা মহাদেশে হারিয়ে যেতেন।

মনে পড়ে, একেক দিন বিকেলে তালের ডোঙায় বিল পাড়ি দিতে দিতে অন্ধকার ঘন হয়ে আসত। দেখতে দেখতে সন্ধ্যামালতীর মত আকাশভরা বাগানটায় একটি একটি করে তারা ফুটতে থাকত। যেদিকে চোখ ফেরানো যেত, শুধু তারা—তারার মেলা। একসময় দিগন্তের ওপার থেকে চাঁদ উঠে এসে বিলের আরশীতে নিজের মুখ দেখতে থাকত। কার্তিকের শেষাশেষি সেই দিনগুলিতে পৌষ যেন হাত বাড়িয়ে খানিক হিমের ছোঁয়া দিয়ে যাচ্ছিল। বৈঠা দিয়ে কচুরিপানা ঠেলতে ঠেলতে বাবা ডাকতেন, 'খোকা—'

আমি উন্মুখ হয়ে থাকতাম। ডাকামাত্রই সাড়া পেয়ে যেতেন বাবা।

যে বাবাকে বাড়িতে খুব কাছের মানুষ মনে হত, অনিঃশেষ মাঠ অথবা বিলের মাঝখানে তাঁর যেন অন্য রূপ। আমি সাড়া দেবার পরও অনেকক্ষণ নিজের মধ্যেই মগ্ন হয়ে থাকতেন। একসময় হঠাৎ বলে বসতেন, 'তোর দেশ-বিদেশে বেড়াতে ইচ্ছা করে খোকা ?'

দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে আমার সেই বয়সে কোন ধারণাই ছিল না। ভূগোলে পৃথিবীর

কথা পড়েছি। আমার পৃথিবী বিবিবাজারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

বাবা যেন অচেনা রহস্যময় জগতের প্রতিনিধি, আমার ছোট্ট পরিধির ভেতর আগেই তিনি সুদূরের খবর নিয়ে এসেছিলেন। আট বছরের হৃৎপিণ্ডে এমন দোলা লেগেছিল যে সারাদিন নেশাগ্রস্তের মত বাবার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। তাঁর সব কথায় ইচ্ছায় সায় দিতে ভাল লাগত, দিয়ে মনে হত ধন্য হয়ে গেলাম।

দেশ-বিদেশ আর বেড়ানো, এই শব্দ দুটোর মধ্যে এমন একটা রোমাঞ্চ আর আকর্ষণ ছিল যে কিছু না বুঝেই প্রায় মাথা নেড়েছিলাম, 'হুঁ —'

'বুঝলি খোকা, দেশ না দেখলে মানুষ না দেখলে জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। বই পড়ে কতটুকু আর জানা যায়। পৃথিবীময় কত বিস্ময় যে ছড়িয়ে আছে। চোখ মেলে শুধু দেখতে হয়, কান পেতে শুনতে হয় আর বুক ভরে অনুভব করতে হয়।'

সেই বয়েসে এসব বোঝা আমার পক্ষে অসম্ভব, আমাকে বোঝাবার ভাষাও এ নয়। কিন্তু বাবার তা খেয়াল থাকত না। দূরদূরান্তের দেশ-দেশান্তরের কথা বলতে গেলে তাঁর ওপর কি যেন ভর করে বসত। দুরন্ত আবেগে তখন তিনি টলমল, ভাসমান। হয়ত আত্মবিস্মৃতও।

আমি চুপ। নিষ্পলকে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

বাবা বলে যেতেন, 'আচ্ছা খোকা—'

'বল—'

'ভাবছি এবার সৌরাষ্ট্রে যাব। প্রভাস, দ্বারকা আর গির্ণার এই তিন তীর্থ এখনও বাকি। তা ছাড়া গির ফরেস্টটাও দেখতে হবে। সেখানে কী আছে জানিস খোকা?'

'কী?'

'সিংহ। গির ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোথাও সিংহ নেই।' বাবা বলতেন, 'আমার সঙ্গে যাবি খোকা?'

আমার চোখ চকচকিয়ে উঠত। অনেক, অনেক দূরে পৃথিবী নামে এই গ্রহটির কোন প্রান্ত থেকে যেন প্রভাস, দ্বারকা, সৌরাষ্ট্র, গির্ণার—অশ্রুতপূর্ব অদ্ভুত অদ্ভুত নামগুলি আমাকে ক্রমাগত হাতছানি দিতে শুরু করেছিল। আমার সম্মোহিত সত্তার ভেতর থেকে উত্তরটা যেন বেরিয়ে আসত, 'যাব।' পরক্ষণেই একটা কথা মনে পড়ে যাওয়াতে হকচকিয়ে যেতাম, 'কিন্তু—'

আমার স্বরে কী থাকত জানি না। বাবা খানিক অবাক হয়ে বলতেন, 'কিন্তু কী?'

'তুমি যাবে কী করে ?'

'কেন ?'

'সেদিন রাত্তিরে মাকে তুমি বললে না, এবার থেকে এখানে থাকবে। চাকরি করবে, আলাদা বাড়ি ভাডা করে আমাদের নিয়ে যাবে। আমাদের ফেলে আর কখনও কোথাও যাবে না ?'

বাবা চকিত হয়ে উঠতেন, 'ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেদিন তো তুই ঘুমোস নি। জেগে থেকে সব শুনেছিলি।' বলতে বলতে তাঁর চোখ-মুখ-কণ্ঠস্বর বিমর্ষ হয়ে যেত, 'আমারই ভুল হয়ে গেছে, এ জীবনে আর বোধ হয় প্রভাস-দ্বারকা-গির্ণারে যাওয়া হবে না।'

আমি নিশ্চুপ, সেই বয়েসেও বাবার আশাভঙ্গের মনস্তাপটা যেন খানিক অনুভব করতে পেরেছিলাম।

মনে পড়ে, সকালবেলা আমাকে নিয়ে মাঠেঘাটে ঘুরতেন বাবা কিন্তু বিকেলে সব কিছু পেছনে ফেলে সেই দিগন্তবিসারী বিলে চলে আসতেন। এখানে অকারণের খেয়ায় তাঁর রোজ পাডি জমানো চাই। তখন নয়, বড হয়ে অনেক পরে বুঝেছি এই অনিশ্চিত নৌকো বাওয়া বাবাব জীবনের প্রতীক। সমস্ত জীবন নির্দিষ্ট কোন নিশানা সামনে না রেখে লক্ষ্যহীন ঘুরে বেডিয়েছেন। এতেই তাঁর আনন্দ, এতেই তাঁর সুখ।

একেক দিন নৌকো বাইতে বাইতে হেমন্তের স্বল্পায়ু বিকেল ফুরিয়ে সন্ধ্যে নেমে যেত। দেখতে দেখতে কুয়াশা আর অন্ধকারের মলাটের তলায় বিলটা অদৃশ্য হতে থাকত। বাবার কিন্তু খেয়াল নেই। তিনি বাইতেন আর বাইতেন আর বাইতেন।

আকাশে তখন একটি পাখিও আর নেই, সব যে যার নির্দিষ্ট ঠিকানায় ফিরে গেছে। দিনের শেষ রঙটুকুও মুছে গেছে। পাখি আর রঙ না-ই থাক, একটি দু'টি করে তারা কিন্তু ফুটতে শুরু করেছে।

বাবা বলতেন, 'বৃশ্চিক রাশি কোনটা জানিস, খোকা ?'

'না।' আমি মাথা নাডতাম।

'সপ্তর্ষি ?'

'না।'

বৃহস্পতি ?'

'না।'

'মঙ্গল ?'

সেই বয়েসে কী-ই বা আমি জানতাম! কতটুকুই বা শিখেছি! অতএব এবারও মাথা নেড়ে আমার অজ্ঞতা জানাতে হত। আর বাবাও এমন, একটি আট ন' বছরের বালকের কাছে এ-সব প্রশ্নের উত্তর যে প্রত্যাশিত নয়, তা যেন হুঁশ থাকত না।

জলস্থলের অনেক কিছুই বাবা আমাকে আগে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এবার শুরু হয়েছিল অন্তরীক্ষের পাঠ। নভোমণ্ডলের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বাবা আমাকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন, কোনটা সপ্তর্ষি, কোনটা বৃহস্পতি, কোনটা মঙ্গল আর কোনটা শুক্র গ্রহ।

চেনাতে চেনাতে একেক দিন রাত দুপুর হয়ে যেত। নিশি-পাওয়া মানুষের মত বিলের জলে ঘুরে ঘুরে চোরের মত বাড়ি ফিরে দেখতাম, সবাই বসে বসে ঢুলছে।

আমাদের দেখে মা উঠে বসতেন, বাবাকে খানিক বকাবকি করতেন। 'তোমার বিবেচনাটা কি শুনি, ছেলেটাকে নিয়ে এত রাত্তির পর্যন্ত এই ঠাণ্ডায় টো টো করে এলে।'

অপ্রতিভ মুখে বাবা কী বলতেন বোঝা যেত না।

মা আবার বলতেন, 'যাও, হাতমুখ ধুয়ে খেতে বোসো। ভাত-তরকারি সব বরফ হয়ে যাচ্ছে।'

বাবা আর কিছু বলতেন না, কাঁধে গামছা ফেলে আমাকে নিয়ে সুড় সুড় করে কুয়োতলায় চলে যেতেন।

মা থামতেন না, 'টো টো করে ঘুরিয়ে তুমি কিন্তু ছেলেটার স্বভাব খারাপ করে দিচ্ছ।'

বাবা কিন্তু তখনও চুপ।

মা বলতেই থাকতেন, 'আজ বাদে কাল বার্ষিক পরীক্ষা। এ রকম করে ঘুরে বেড়ালে নির্ঘাত একটা বছর মাটি হয়ে যাবে।'

লক্ষ্য করতাম, মায়ের বকুনিটা প্রথম দিনের মত তীব্র নয়। তার মধ্যে প্রশ্রয়ের একটু সুরই যেন বাজছে।

বিকেলবেলা অনিশ্চিতের খেয়ায় পাড়ি দিতে দিতে বাবার স্বভাবের একটা বিচিত্র দিক আমার কাছে খুলে গিয়েছিল।

মনে আছে, একদিন বাড়ি থেকে বাবার সঙ্গে বেরুচ্ছি, মা বলেছিলেন, 'আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরো।'

বাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কেন?'

'বাবা পোলাওয়ের চাল আর ঘি যোগাড় করেছেন, সন্ধ্যেবেলা রান্না হবে। গরম

গ...া খেলে ভাল লাগবে না।'

উৎসাহের স্বরে বাবা বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। পোলাও হবে, দেখো, সন্ধ্যের আগেই হাজির হয়ে যাব। চল্ রে খোকা, খিদেটায় ভাল করে শান দিয়ে আসি।'

মা হেসে ফেলেছিলেন, 'পেটুক কোথাকার।'

বাবাও হাসতে হাসতে আমার হাত ধরে সদর দরজার বাইরে চলে গিয়েছিলেন।

সেদিন নৌকো বাইতে বাইতে বিলের মাঝামাঝি চলে এসেছিলেন বাবা। ওপারে দিগন্ত আর বিল যেখানে একাকার সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ওখানে কী আছে রে খোকা?'

ওপারে কোনদিন যাইনি, বাবার সঙ্গে রোজ বিলের সিকি ভাল পাড়ি দিয়েছি মাত্র। অতএব অজানার অন্ধকারে-ঘেরা সেই চিরাচরিত করুণ উত্তরটিই আমাকে দিতে হয়েছে, 'জানি না।'

বাবার হঠাৎ কি মনে পড়তে মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'তুই আর জানবি কি করে! তোর মা তো বাড়ি থেকে বেরুতেই দিত না।'

আমি চুপ।

নিবিড় কচুরিপানার মধ্য দিয়ে ডিঙির পথ করে নিতে নিতে বাবা একসময় জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ওপারে যাবি খোকা?'

বাবার কোন কথাটায় আমি অরাজী? তৎক্ষণাৎ আমার মাথা একদিকে হেলে গিয়েছিল, 'যাব।'

দ্বিতীয় প্রশ্ন আর করেন নি বাবা, আমার সায় পাওয়ামাত্র ডিঙিটাকে দুর্দম বেগে সামনের দিকে ছুটিয়ে দিয়েছিলেন। সন্ধ্যের খানিক আগে আগেই আমরা ওপারে পৌঁছে গিয়েছিলাম।

ওপারে তেমন কোন বিস্ময়ই ছিল না। মাইলের পর মাইল ফসলের ক্ষেত। মাঝে মাঝে বন্ধ্যা প্রান্তর আর ইতস্তত কৃষাণগ্রাম। এ সবের মধ্যে কোন রহস্য ছিল বাবাই জানেন, দুচোখে অপার মুগ্ধতা নিয়ে মোহগ্রস্তের মত শুধু হেঁটেই যাচ্ছিলেন। আমি আর কি করি, তাঁর পিছু পিছু হেঁটে যাচ্ছিলাম।

হাঁটতে হাঁটতে কদাচিৎ দু-একটা লোক চোখে পড়ছিল। সবই চাষাভুষো শ্রেণীর সাধারণ মানুষ। কেউ জমির কাজ সেরে আসছে, কেউ আসছে হাট ফেরত।

যাকেই চোখে পড়েছে তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে খানিক গল্প জুড়ে দিয়েছেন বাবা। এ সব গ্রামের নাম কী, কী ফসল এখানে ফলে, এ অঞ্চলে দর্শনীয় কিছু আছে কিনা,

ইত্যাদি ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করে কৌতূহল মেটাচ্ছিলেন।

বাবা একেকটা লোককে ধরেন, গল্প জোড়েন, সাময়িক থামার পর আবার হাঁটতে শুরু করেন। এইভাবে কখন সন্ধ্যে নেমে গিয়েছিল, তারপর দেখতে দেখতে রাত্রি। সময়টা বোধ হয় পূর্ণিমাপক্ষের ত্রয়োদশী অথবা চতুর্দশী হবে। কখন যে মাঠের ওপার থেকে চন্দনের পাটার মত শুক্লপক্ষের চাঁদ উঠে এসেছিল, টেরও পাইনি।

কতক্ষণ হেঁটেছিলাম মনে নেই। হঠাৎ দেখি একদল লোক কয়েকটা কলাগাছ, লাঠি আর বর্শা নিয়ে রীতিমত রণসাজে সেজে পশ্চিমদিকের চওড়া একটা রাস্তা ধরে চলেছে। পরে বড় হয়ে জেনেছি, ঐ রাস্তাটা জেলা বোর্ডের সড়ক।

দলটাকে দেখামাত্র বাবা এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর চোখেমুখে অসীম আগ্রহ যেন ঝকমক করছিল। জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কি ব্যাপার, লাঠি-সোটা নিয়ে চলেছ কোথায়?'

মধ্যবয়সী একটা লোক, মাথার চুল কাঁচায়-পাকায় মেশানো, পাথরে-কাটা পেশল দেহ, সম্ভবত দলপতিই হবে, দূর পশ্চিমে আঙুল বাড়িয়ে বলেছিল, 'হুই দিগরে, বিলের কানাত ঘেঁষে একটা জঙ্গল আছে, আমরা সিথানটায় যাচ্ছি বাবুমশায়।'

'কেন, সেখানে কী?'

'পুন্নিমার রাতে ওখানে সাদা 'শ্যাজা' বারোয়। দেখি যদি মারতে পারি। শ্যাজার মাংস খেতে খুব ভাল।'

'শ্যাজা কী?'

লোকটা এবার যে বর্ণনা দিয়েছিল তাতে বোঝা গিয়েছিল প্রাণীটি সজারু। বাবার চোখ চকচকিয়ে উঠেছিল, 'সাদা সজারু বললে না।'

'আজ্ঞা। একেবারে দুধের মত সাদা।'

'কালো সজারু দেখেছি কিন্তু সাদা কোনদিন দেখিনি, দেখবার বড্ড লোভ হচ্ছে। আমরা তোমাদের সঙ্গে গেলে আপত্তি নেই তো?'

বাবার উৎসাহ দেখে লোকটা কিছুক্ষণ অবাক হয়েছিল। তারপর বলেছিল, 'না, আপত্তি আর কিসির। তবে—'

'কী?' বাবা জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলেন।

'উটা হল গে জঙ্গল জায়গা, আপনাদের খুব কষ্ট হবে বাবুমশায়।'

কষ্টের ওজরটা প্রায় টুসকি মেরেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন বাবা, 'না—না' একটুও কষ্ট হবে না। তোমরা দলে একটু জায়গা দিলেই হল।'

'কষ্ট করতে পারলে চলুন।'

কথায় কথায় বাবা জেনে নিয়েছিলেন, দলপতি অথবা সেনাপতি প্রৌঢ় লোকটির

নাম অর্জুন মণ্ডল। তারপর পাঁচজন সঙ্গীর নাম রজনী, রামলাল, নোটন, মহাদেব, নাগু এবং যুধিষ্ঠির। এঁরা এ অঞ্চলের মানুষ নয়, সেই দক্ষিণ বাংলার প্রান্ত থেকে এসে এখানে গ্রাম বসিয়েছে, অরণ্যের মুখ থেকে মাটি ছিনিয়ে এনে ফলে-ফসলে লাবণ্যময়ী করে তুলেছে। ইত্যাদি ইত্যাদি আরো অগণিত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন বাবা।

হঠাৎ কি মনে পড়তে বাবা বলেছিলেন, 'সজারু ধরতে তো চলেছ, তা ঐ কলাগাছ কেন?'

'কলাগাছ কেন, জানেন না?' বাবার অজ্ঞতায় সেনাপতি অর্জুন মণ্ডল যেন হতবাক।

'না।'

এবার অর্জুন মণ্ডল ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিল, শ্বেত সজারুর মত দ্রুতগামী জন্তুর সঙ্গে ছুটে পারা দুঃসাধ্য। কেউ আক্রমণ করলে সর্বাঙ্গের কাঁটা খাড়া করে তারা দৌড়তে থাকে। তখন দূর থেকে কলাগাছ ছুঁড়ে দিলে কাঁটায় গেঁথে যায়। সজারুরা তখন আর চলতে পারে না, অনায়াসেই তাদের ধরে ফেলা যায়।

তাদের সঙ্গে যেতে যেতে গল্প জমিয়ে ফেলেছিলেন বাবা। এই গুণটি হাত-পা-নাক-চোখ ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতই বোধ হয় তাঁর সহজাত। মানুষকে মুগ্ধ করে চমৎকৃত করে মুহূর্তে বশীভূত করে ফেলতে পারতেন।

অবশেষে রাস্তা ফুরোয়। আমরা বিলের পারে নরম জলাভূমিতে চলে এসেছিলাম। অর্জুন মণ্ডল যা আভাস দিয়েছিল তা-ই। যতদূর চোখ যায় গভীর জঙ্গল। কেঁদ, জারুল, বাঁশ, কইওকড়া, পিটুলি এবং আরো অগণিত চেনা অচেনা গাছ বুনো লতার জটিল ফাঁদে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছে।

অর্জুন মণ্ডল এবং তার বাহিনী অরণ্যের দেউড়িতে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বাবার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'কথাটা ভেবে গ্যাখেন বাবুমশায়—'

'কোন কথাটা?'

আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে অর্জুন মণ্ডল বলেছিল, 'এবেরে আমাদের জঙ্গলে সেঁদুতে (ঢুকতে) হবে। ঐ ছেলেমনিষ্যিকে (ছেলে মানুষ) নিয়ে ভেতরে যাবেন?'

নির্ভয়ে বাবা উত্তর দিয়েছিলেন, 'যাব বৈকি। সাদা সজারু দেখার এমন সুযোগ জীবনে আর কখনও আসবে?'

দ্বিধান্বিত সুরে অর্জুন মণ্ডল বলেছিল, 'কিন্তুক—'

'বলছি তো যাব। আবার ফ্যাকড়া তুলছ কেন? নাও, চল—চল—' বাবা

যেন এবার ঈষৎ বিরক্তই।

তবু দাঁড়িয়েই ছিল অর্জুন মণ্ডল, 'বাবুমশায়, জঙ্গলের ভেতর সাপখোপ রয়েছে, দাঁতালও পেরায়ই (প্রায়ই) বারোয়। মাঝে মাঝে এক আধটা চিতাও। কাজেই কইছিলাম—'

'তোমার কিছু বলবার দরকার নেই। মরি তো মরব, আর ও আমার ছেলে। ওর প্রাণের দায়িত্ব আমার। কিছু যদি ওর হয় তোমায় দোষ দেব না।'

'বেশ, তা হলে আর কী করা। আসুন—'

একটা সরু পথের রেখা জঙ্গলের ভেতর চলে গেছে। অর্জুন মণ্ডল প্রথমে ঢুকেছিল, মাঝখানে বাবা আর আমি, আমাদের পেছনে বাকি ক'জন।

যেতে যেতে অর্জুন মণ্ডল সতর্ক করে দিয়েছিল, 'খুব সাবধান, এট্টু আওয়াজ করবেন না। শ্যাজা খুব হোঁশিয়ার জানোয়ার, এট্টু আওয়াজ পেলে কিন্তুক গত্ত থেকে বেরুবে না।'

পা টিপে টিপে অত্যন্ত সন্তর্পণে, এমন কি বুকের ভেতর শ্বাস আটকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম। বনভূমির বাতাসে এতটুকু তরঙ্গও উঠছিল না।

ত্রয়োদশী অথবা চতুর্দশীর চাঁদ ততক্ষণে মাথার ওপর উঠে এসেছে। অমল আলোর ধারাস্নানে সব দিক ধুয়ে যাবার কথা। কিন্তু জঙ্গল এত নিবিড়, এমন ঘনবদ্ধ, মাথার ওপর এমনভাবে সে চাঁদোয়া টাঙিয়ে রেখেছে যে চাঁদটাকে ভালভাবে দেখা যায় না। বনানীর ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে যে আলোটুকু আসছে তা অন্ধকারকে অপসারিত করার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে টুকরো টুকরো জাফরি-কাটা জ্যোৎস্না বনপথে দুলছিল, মনে হচ্ছিল একখানা কালো কুচকুচে জালে অসংখ্য রুপালী মাছ ঝিকমিক করছে।

জঙ্গলের ভেতর কতদূর চলে গিয়েছিলাম, মনে পড়ে না। সেনাপতির নির্দেশে একসময় থামতে হয়েছিল। জায়গাটা আমাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে মনোরম। বৃত্তাকারে ছোট ছোট কিছু গাছ, তার ভেতরে নিভৃত খানিকটা জমি। সেখানে বসলে চারদিকে লক্ষ্য রাখা যায়, অথচ বাইরে থেকে ভেতরের দৃশ্য চোখে পড়ে না। তা ছাড়া এখানে জঙ্গল তেমন নিবিড় নয়, মাথার ওপর চাঁদোয়াটা হঠাৎ যেন অনেকখানি ছিঁড়ে গেছে। ফলে, চাঁদের আলোর ঢল নেমেছে এবং সে আলোর সব দিক থৈ থৈ।

অর্জুন মণ্ডল বলেছিল, 'দিনের বেলা এসে জায়গাটা তাক করে গেছি, চলুন ভেতরে যাওয়া যাক।'

সবাই ভেতরে গিয়ে বসেছিলাম।

অর্জুন মণ্ডল বলেছিল, 'আশেপাশে অনেকগুলোন গর্ত দেখে গেছি। মনে হচ্ছে শুজার গর্ত। সবাই নজর খুলে থেকো হে। অবিশ্যি শুজা বারোসে কাঁটার ঝমঝমানিতেই টের পেয়ে যাবে।'

তারপর শুরু হয়েছিল নিঃশব্দ প্রতীক্ষা, উদ্‌গ্রীব অধীর মুহূর্ত গোণা। মাঝে মাঝে অবশ্য অর্জুনরা ফস করে দেশলাই জেলে বিড়ি ধরিয়ে নিচ্ছিল। যত বারই তারা বিড়ি ধরিয়েছে তত বারই বাবাকে একটি করে দিয়েছে। সাতটি বিড়ির ধোঁয়ায় যে মেঘপুঞ্জ বার বার সৃষ্টি হচ্ছিল, আমার শ্বাস রুদ্ধ করে দেবার পক্ষে তা যথেষ্ট।

বনভূমি প্রায় নীরবই ছিল। মাঝে মাঝে ছন্দপতনের মত একেকটা পাখি ডেকে উঠছিল। যত বার পাখি ডেকেছে তত বারই অর্জুন মণ্ডল জানিয়ে দিয়েছে, কোন কোন পাখি ডাকছে। বাবা অনেকগুলো পাখির নাম শিখিয়েছিলেন। অর্জুন মণ্ডলের কাছেও আরো কয়েকটা নাম শুনেছিলাম। ভীমরাজ, কাটৌরা, জলপিপি, বথারি, মধুটুকরি ইত্যাদি।

থেকে থেকে অরণ্যকে চকিত করে একেকটা দ্রুত আপয়াজ উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছিল। অর্জুন মণ্ডল জানিয়ে দিচ্ছিল, এই শুয়োর গেল, ঐ সাপ ছুটল, ঐ চিতাবাঘ দৌড়ল। আর শোনা যাচ্ছিল, ঝিঁঝিদের অশ্রান্ত কান্না। বনভূমির হৃদয়ের মাঝখানে কোন গুহান্বিত বিলাপের মত তা উঠে এসে চারদিক বিষণ্ণ করে তুলছিল যেন।

এই জঙ্গলে স্তব্ধ রাত্তিরে সময় যেন আর সামনে এগুতে চাইছিল না। তার গতি এত মন্থর, এত শ্লথ যে মনে যচ্ছিল, সে নিশি আর ভোর হবে না। চন্দ্রাহত শুক্লপক্ষের রাত ঝিমঝিম করছিল। আর তা যেন নেশার মত আমার রক্তে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল। একটি জ্যোৎস্নালোকিতরাত মানুষকে যে এতখানি আচ্ছন্ন করতে পারে, আমার ধারণা ছিল না। মনে হচ্ছিল, স্বপ্নের ঘোরে আমরা কুহকের দেশে এসে পড়েছি।

কতক্ষণ বসে ছিলাম, মনে নেই। সম্ভবত দ্বিতীয় প্রহর পার হয়ে গিয়েছিল। রাত তখন আরো নিবিড় আরো আচ্ছন্ন। এতক্ষণ বনভূমির স্তব্ধতা ভেঙে মাঝে মাঝে পাখি ডাকছিল, সরীসৃপের বুক টেনে চলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল, অন্ত জন্তরা ছোটাছুটি করছিল। এখন সব শব্দ থেমে গেছে। এমন কি ঝিঁঝিদের অশ্রান্ত বিলাপও আর পাওয়া যাচ্ছিল না। বিলের পারে জলাভূমি সত্যি সত্যিই এবার ঘুমের অতলে হারিয়ে গিয়েছিল। তার হৃৎপিণ্ডের একটি উত্থান-পতনও

আর শুনতে পাচ্ছিলাম না।

বসে বসে কোমর বুঝি ধরে গিয়েছিল। নিষ্পলকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখও টন টন করতে শুরু করেছিল। হতাশ, বিরক্ত, ব্যর্থ অর্জুন মণ্ডল একসময় বলে উঠেছিল, 'মনে লাগছে, শালার শুয়া আজ আর গত্ত থেকে বারোবে না।'

তার একজন সঙ্গী, নাগু বলেছিল, 'শালার ব্যাটারা বোধ হয় টের পেয়েছে যে আমরা এসেছি।'

'যা বলেছিস্।'

'এখন তা হলে কি করবে মুরুব্বী?'

'কি আর করব। শুচু শুচু চোখ টান করে রাত পুইয়ে তো কোন লাভ নেই। তার চাইতে চল্ যাই ঘরে গে কাঁথা মুড়ি দি।'

'তাই ভালো। চল—'

সঙ্গীদের নিয়ে উঠে পড়েছিল অর্জুন মণ্ডল। বাবা কিন্তু তখনও ওঠেন নি, অতএব আমাকেও দেখাদেখি বসে থাকতে হয়েছিল।

অর্জুন মণ্ডল আমাদের উদ্দেশে বলেছিল, 'চলুন বাবুমশায়রা—'

বাবা বলেছিলেন, 'তোমরা যাও গে, আমরা আরেকটু দেখি।'

'সি কি, এই নিঘোর জঙ্গলে বসে রইবেন।'

'রাত তো অর্ধেকের ওপর কাবার হয়েছে। ভোর হতে আর ক'ঘণ্টাই বা বাকি। ভাবছি একেবারে সকাল হলেই এখান থেকে উঠব। এখন যদি যাই, তারপর যদি সাদা সজারু বেরোয় তা হলে আর জন্তুটাকে দেখা হবে না।'

'কিন্তুক—'

'আবার কী?'

অর্জুন মণ্ডল সম্ভবত তার অর্ধ শতাব্দীর জীবনে বাবার মত বিচিত্র মানুষ আর দেখে নি। বিমূঢ়ের মত খানিক তাকিয়ে থেকে বলেছিল, 'যাবেন না তা হলে!'

'না।'

'তা হলে আমাদেরও থাকতে হয়।'

'তোমরা কষ্ট করে থাকবে কেন? তোমরা যাও।'

'না বাবুমশায়, এই জঙ্গলে অস্তর নেই আপনাদের হাতে। এমন অবস্থায় ফেলে যাই কি করে?' অর্জুন মণ্ডল বিবেকবান সহৃদয় মানুষ। কিছুক্ষণ আগে যার সঙ্গে মাত্র পথের আলাপ তার জন্য লোকে এতখানি করে না। কিন্তু অর্ধেক রাত্রির ঘুম

বিসর্জন দিয়ে দলবল নিয়ে শুধুমাত্র আমাদের নিরাপত্তার জন্য সে আবার বসে পড়েছিল।

সমস্ত রাত জেগে থেকেও শ্বেত সজারুর দেখা মেলেনি, তারা যেন সেদিন প্রতিজ্ঞাই করেছিল, বিবর থেকে বেরুবে না।

ভোরের আলো ফুটতেই অর্জুন মণ্ডল ক্ষোভের সুরে বলেছিল, 'চলুন এবার। দেখলেন তো, শুদু শুদু রাত জাগাই সার হ'ল। সাদা জাজা দেখা দিল না।'

বাবা হেসেছিলেন, 'রাত জাগাটা শুধু শুধু হবে কেন? চাঁদের আলোয় বনের মাঝখানে জেগে বসে থাকা একটা অভিজ্ঞতা বৈকি, চমৎকার অভিজ্ঞতা।'

কথাগুলি সব যে বুঝতে পেরেছিল অর্জুন মণ্ডল, এমন মনে হয়নি। তার মুখ-চোখ দেখে মনে হচ্ছিল, বাবার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়েছে।

বাবা আবার বলেছিলেন, 'মাঝখান থেকে তোমার কষ্ট হ'ল।'

'না, কষ্ট আর কি।'

বনভূমি থেকে বেরিয়ে অর্জুন মণ্ডলরা তাদের গ্রামে ফিরে গিয়েছিল, আমরা বিলে এসে ডোঙায় উঠেছিলাম।

এক রাত জঙ্গলে কাটিয়ে পরের দিন ভোরে বাড়ি ফিরে কপালে কী জুটেছিল আজ আর মনে পড়ে না। তবে অভ্যর্থনাটা যে খুব মনোরম হয়নি, বলাই বাহুল্য। যিনি পোলাওর থালা সাজিয়ে পথের দিকে তাকিয়ে বসে ছিলেন তিনি যে খুব সহজে ছেড়ে দিয়েছেন এমন মনে করার কোন হেতু নেই।

লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, ভর্ৎসনা, অদৃষ্টে যা-ই জুটে থাক, বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। শ্বেত সজারুর সন্ধানে শুক্লপক্ষের রাতে বনভূমিতে নিশিযাপন করে বাবার চরিত্রের প্রধানতম দিকটি আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। চোখের সামনে যা থাকে তা-ই তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, বর্তমানকে নিয়ে তাঁর সর্বক্ষণ মাতামাতি। পেছনে কে পড়ে রহিল, কাকে কখন কী প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন সে কথা তাঁর মনেও থাকে না। চলতে চলতে যা ছাখেন, যা শোনেন, সেই শব্দ-গন্ধ-রূপময় জগৎ প্রতিমুহূর্তে সম্মোহিতের মত দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে, এক ঘটনা থেকে আর এক ঘটনায়, এক স্রোত থেকে আর এক স্রোতে অবিরত ভাসিয়ে নিয়ে যেত তাঁকে।

দশ

বাবার কথা ভাবতে গেলে বাধাবন্ধনহীন একটি মুক্তপুরুষের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বাবা যেন মানস সরোবরের বুনো হাঁসটি, যখন যেদিকে প্রাণ চায়,

ডানা মেলে দিতেন। কে বাধা দিল, কে নিষেধের বেড়ি পায়ে পরাতে চাইল, কোনদিকে তাঁর হুঁশ থাকত না। সমাজে বাস করতে গেলে তার কিছু নিয়ম মানতে হয়, কিন্তু যে সব নিয়ম বসন্ত-শীতে দিবসে-নিশিথে পায়ে পায়ে শৃঙ্খল হয়ে বাজতে চায় তাদের ছিঁড়ে ফেলার মধ্যেই বাবার যত আনন্দ। এ দিক থেকে বাবা পুরোপুরি অসামাজিক।

সে দিন বিল পাড়ি দিয়ে শ্বেত সজারু দেখার জন্য বনভূমিতে রাত কাটানোর ভেতর একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। তারপরও দেখেছি, বাবা হয়ত আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন, হঠাৎ খবর পেলেন দশ মাইল দূরে হরিপুরের হাটে সারারাত যাত্রা হবে। আর কথা নেই, সব পিছুটান ভুলে অমনি সেখানে ছুটে যেতেন। বাবা হয়ত বাড়ির সামনে পায়চারি করছেন, এমন সময় কেউ বলে গেল, মাইল পাঁচেক দূরের এক গ্রামে ময়াল সাপ ধরা পড়েছে, বাবা অমনি সেখানে রওনা হতেন। কোথায় কবির গান, কোথায় তর্জা, মধ্যরাতে কোথায় ভীমরাজ পাখিদের মেলা বসে—এ সব খবর একটু কানে এলেই হল, বাবাকে তখন ধরে রাখে কার সাধ্য। মাধ্যাকর্ষণের মত দুরন্ত গতিতে পৃথিবীর সব রঙ, সব গন্ধ, সব সুষমা, সব মাধুর্য তাঁকে অবিরাম টানতে থাকত।

একটা দুর্বার আবেগ সর্বক্ষণ বাবার মধ্যে যেন ভরপুর ছিল, সেটা যেদিকে তাঁকে ছুটিয়ে নিয়ে যেত তিনিও সেদিকে ছুটতেন। তাকে ঠেকাবার শক্তি বা সাধ্য কোনটাই তাঁর ছিল না।

আমার এই উদ্দাম যাযাবর বাবার পায়ে শেকল পরাবার একটা ষড়যন্ত্র চলছিল নেপথ্যে। ব্যাপারটা অবশ্য এমন কিছু গোপন নয়। দাদু তাঁর জন্য চাকরির তদ্বির করছিলেন এবং তাঁর চেষ্টায় যাতে বিন্দুমাত্র শিথিলতা না আসে সে জন্য মা অবিরত তাগাদা দিয়ে যাচ্ছিলেন।

মনে আছে, একদিন অফিস থেকে ফিরে দাদু বাবাকে বলেছিলেন, 'কাল সকালের দিকে তুমি আর কোথাও বেরিও না মাধব।'

বাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কেন ?'

'তোমার চাকরির ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে এনেছি। আমাদের অফিসের বড় সাহেব তোমার সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলবেন, তারপরেই চাকরি।'

বাবা এবার চুপ করেছিলেন।

দাদু উৎসাহের সুরে আবার বলেছিলেন, 'বড় সাহেবের ভাবগতিক দেখে মনে হল, কাল না হলেও পরশু থেকেই তোমাকে অফিসে জয়েন করতে হবে।'

বাবা এবারও নিরুত্তর।

বাবার নীরবতা বোধ হয় লক্ষ্য করেন নি দাদু। বলেছিলেন, 'তা হলে ওই কথাটা মনে রেখো মাধব, কাল ন'টা নাগাদ বাড়িতেই থাকবে।'

এতক্ষণে অস্ফুটে বাবার গলা সোনা গিয়েছিল, 'আচ্ছা।'

পরের দিন দাদুর সঙ্গে সুবোধ ভাল ছেলের মত গুটি গুটি অফিসে গিয়েছিলেন বাবা। দুপুরের আগেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে নিয়ে ফিরে এসেছিলেন। দাদু বলেছিলেন, সেদিন অথবা তার পরের দিন থেকে অফিসে যেতে হবে। অত তাড়াতাড়ি অবশ্য হয়নি। দু-দিন পর নতুন যে ইংরেজি মাস পড়বে তার প্রথম দিন থেকে তাঁকে হাজিরা দিতে হবে।

বাবা চাকরি পাওয়াতে সবাই খুশি। দাদু খুশি, দিদিমা খুশি। তবে সব চাইতে যাঁর বেশি আনন্দ তিনি মা। মায়ের চোখেমুখে যে দীপ্তি ফুটেছিল তার বুঝি তুলনা নেই। উঠতে-বসতে-চলতে-ফিরতে তাঁর চারপাশের বাতাসে যেন হিল্লোল বয়ে যাচ্ছিল।

চাকরি পাবার পর বাবার প্রতিক্রিয়া কিন্তু বোঝা যায়নি। অসীম নীলাকাশে যিনি ডানা মেলে জীবনের অর্ধেকেরও বেশি পার করে দিয়েছেন, এতকাল পর সাধ করে পায়ে শেকল পরতে তাঁর কেমন লাগছিল, কে বলবে। খুশি বা অখুশির একটি রেখাও তাঁর মুখে ফোটেনি। একই আহ্নিক গতিতে তাঁর সময় কেটে যাচ্ছিল, সেখানে এতটুকু ছেদও পড়েনি।

বাবা যেদিন চাকরি পান সেটা মঙ্গলবার, মাঝখানে বুধবারটা আর অফিসে যেতে হবে না। একেবারে বৃহস্পতিবার থেকে গেলেই চলবে।

মনে আছে, মাঝখানের বুধবারটা যথারীতি আমাকে নিয়ে সূর্যোদয় দেখতে মাঠের মাঝখানে বেড়াতে গিয়েছিলেন বাবা। প্রথম দিনটির মত আমরা সেদিনও শীতের খেজুর রস কিনে খেয়েছিলাম। ফেরার পথে চোখে পড়েছিল দল বেঁধে অনেকগুলো গরুর গাড়ি জেলাবোর্ডের সড়ক ধরে পুব দিকে চলেছে। বাবা বহুদর্শী মানুষ, গাড়িগুলো দেখেই চিনতে পেরেছিলেন। আমরা তখনও মাঠের মাঝখানে। দূর থেকে হাঁক দিয়ে বলেছিলেন, 'যাত্রার দল নাকি হে—'

গরুর গাড়ি থেকে সাড়া এসেছিল, 'হাঁ, বাবু—'

বাবার চোখ চকচকিয়ে উঠেছিল। ব্যস্তভাবে আমাকে বলেছিলেন, 'তাড়াতাড়ি হাঁট খোকা, ওদের গিয়ে ধরি।' বলে আমার হাত ধরে প্রায় উড়িয়েই সড়কে নিয়ে এসেছিলেন।

গরুর গাড়ির যারা সওয়ারী তাদের প্রায় সবারই বাবরি বাবরি চুল, চোখের কোল কালি মাখা, রাতজাগা চোখগুলি ঢুলুঢুলু। তাদের সঙ্গে রয়েছে কালো

কালো অসংখ্য ট্রাঙ্ক। ওগুলোর মধ্যে নিশ্চয়ই সাজপোশাক, পরচুলা, ধনুক-বাণ-গদা-বর্শা ইত্যাদি। তা ছাড়া স্তূপীকৃত বিছানাপত্র লটবহরে ছইএর ভেতরটা ঠাসা।

অনেকদিন আগে মায়ের কি করুণা হয়েছিল, দিদিমার সঙ্গে আমাকে একবার যাত্রা দেখতে দিয়েছিলেন। পালাটার নাম 'লবকুশ'। 'লবকুশ' পালা দেখতে পাঠানোর নেপথ্যে মায়ের কোন গভীর উদ্দেশ্য ছিল কিনা, কে বলবে। বাবাকে দেখার পর মনে হয়েছে, উদ্দেশ্যটা থাকলেও থাকতে পারে। যাই হোক, দূর থেকে যাত্রাদলের আসরে রাজা, রাণী, রাজপুত্রদের দেখে মনে হয়েছিল ওরা মর্তলোকের মানুষ না, কোন মোহময় স্বপ্নরাজ্যের বাসিন্দা। ওদের ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। আসরের বাইরে তাদের কোথাও দেখা পর্যন্ত যায় না। মায়ালোকের দুয়ার খুলে ওরা সরাসরি আসরে নেমে আসে, নিজেদের পালাটুকু গেয়েই আবার সেই অচেনা মোহিনীলোকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

চোখের সামনে সেই মানুষগুলোকে গরুর গাড়ির ভেতর বসে থাকতে দেখেও কিছুতেই যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলাম না। দৃষ্টি আমার অবাক বিস্ময়ে স্থির নিষ্পলক। আমি তাকিয়েই ছিলাম।

এদিকে বাবা তাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছিলেন, কোত্থেকে আসা হচ্ছে?'

'আজ্ঞা, হুই শ্যামগঞ্জের হাট থিকে।'

'ওখানে পালা ছিল নাকি?'

'হাঁ বাবু। দু রাত গাওনা গেয়ে এলাম।'

'কী কী পালা গাইলে?'

'পেরথম রাতে গাইলাম 'রাজপুত্র প্রবীর' আর কাল রাতে গেয়েছি 'কীচক বধ।'

গরুর গাড়িগুলো চলার গতি অনেকখানি শ্লথ করে দিয়েছিল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে প্রায় অজান্তেই হেঁটে যাচ্ছিলাম। আমার বিস্ময় আর বাবার কথা যেন ফুরোচ্ছিল না।

যাত্রার দলটার নাম 'নলপুর ন্যাশনাল অপেরা পার্টি'। বাবা যে লোকটার সঙ্গে কথা বলছিলেন সে অধিকারী, নাম গোলকপতি দলুই। বেশ শৌখিন মানুষ, কানের ওপর দিয়ে লতানো বাবরি। বয়েস পঞ্চাশোর্ধ্বে। অতএব নিয়মানুযায়ী মাথার আধাআধিতে সাদা ছোপ ধরার কথা, কলপের সযত্ন ব্যবহারে তা কিন্তু ভ্রমরকৃষ্ণ হয়েই ছিল। পরনে ভেতরে-তুলো-পোরা আলপাকার কালো কোট আর কুঁচনো দেশী ধুতি। দু-হাতে অন্তত সাতটা আংটির ঝিলিক, গলায় সোনার মফচেন, গোটা

দুই দাঁতও সোনা-বাঁধানো। চোখের দৃষ্টিতে ব্যবসায়ীর ধূর্ততা।

বাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তা এখন চলেছ কোথায়?'

অধিকারী গোলোকপতি পুব দিগন্তে আঙুল দেখিয়ে বলেছিল, 'হুই উদিকে, কেষ্টপুরের মেলায়।'

'এই কাতিক মাসে কিসের মেলা?'

'কাত্তিক সংক্রান্তিতে ওখানে এক সাধু দেহরক্ষা করেছিলেন। মহাপুরুষ ছিলেন, সাক্ষেৎ ভগবান। এক মুঠো বালি নিয়ে ফুঁ দিলে চিনি হয়ে যেত। আতা গাছে পেয়ারা, আমগাছে কলা ফলানো তো তাঁর কাছে কিছু না। ওখানে পুরনো এক মন্দির আছে, কেউ বলে ঐ মন্দিরের বয়েস হাজার বছর। কেউ বলে তারও বেশি। সাধু ওখানে থাকতেন। মন্দিরের সামনে আছে পেল্লায় পুকুর। পুকুরে চান করে এক আঁজলা জল খেলে হেন রোগ নেই যা সারে না।' বলে অধিকারী হাতজোড় করে সাধুর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়েছিল।

বাবা বিস্মিত। বলেছিলেন, 'বল কি হে!'

'আজ্ঞা। ঐ সাধু যেদিন দেহরক্ষা করেছেন সেই দিনে ফী বছর ওখানে মেলা বসে।'

'আজই তো কার্তিক সংক্রান্তি।'

'আজ্ঞা।'

'তা হলে আজই মেলা বসছে?'

'আজ্ঞা।' অধিকারী বলেছিল, 'একটু রোদ চড়লে দেখবেন দলে দলে মানুষ আর সাধু চলেছে উই দিকে।'

বাবা কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন, অধিকারীর কথার উত্তর দ্যান নি।

অধিকারী কিন্তু বলে যাচ্ছিল, 'মেলাটা অবিশ্যি কেষ্টপুরের জমিদারবাবুদের। তেনারা আমাদের বায়না করে গেছে। এক রাতের গাওনা।'

বাবা এবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী পালা গাইবে?'

'সীতার পাতাল প্রবেশ।'

'কেষ্টপুরটা এখান থেকে কতদূর?'

'বেশিদূর না, মাইল পাঁচেক পথ মাত্তর। বিকেলে রওনা দিলে সন্ধ্যেয় পৌঁছে যাবেন। যাবেন না কি বাবু আমাদের গাওনা শুনতে?'

'যাব, নিশ্চয়ই যাব।' বাবা পরম উৎসাহে উত্তর দিয়েছিলেন।

মনে আছে আমরা আর এগুইনি, গরুর গাড়িগুলি ধীরে ধীরে দূর দিগন্তে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। যতক্ষণ সেগুলো দেখা যায় আমরা তাকিয়ে ছিলাম। দৃষ্টির

বাইরে যেতেই বাবা আমার দিকে ফিরেছিলেন, 'চল খোকা, বাড়ি যাই।

'চল।' আমরা বাড়ির পথ ধরেছিলাম।

হাঁটতে হাঁটতে আড়ে আড়ে বাবাকে বার বার দেখছিলাম। যাত্রাওলার সঙ্গে কথা বলার পর থেকেই কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলেন বাবা—দূরমনস্ক, চিন্তান্বিত। কেষ্টপুরে যাত্রার খবরটা তাঁর মধ্যে কতখানি ঢেউ তুলেছে, বার বার তাঁকে দেখে অনুমান করতে চেষ্টা করেছিলাম।

বাবা অন্যমনস্ক, এ সময় তাঁকে ডাকা বোধ হয় ঠিক নয়। অথচ একটা কথা না বলেও থাকতে পারছিলাম না। অনেকক্ষণ ইতস্তত করার পর ডেকেই ফেলে-ছিলাম, 'বাবা—'

বাবা বোধ হয় আমার কথা শুনতে পাননি, আপন মনেই তিনি হেঁটে যাচ্ছিলেন।

কাজেই আমি আবার ডেকেছিলাম।

এবার বাবা চমকে উঠেছিলেন। আমার দিকে ফিরে বলেছিলেন, 'কি রে?'

'ঐ লোকটাকে তুমি বললে না, যাত্রা শুনতে যাবে?'

'বললাম তো।'

'আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে যাব।'

'আচ্ছা যাস।'

বাড়ি ফিরে বাবা মাকে বলেছিলেন, 'আজ রাত্তিরে যাত্রা হবে।'

যে মাকে কোনদিন পরিহাসে মাততে দেখিনি, যাত্রা-বায়স্কোপ সম্বন্ধে যিনি চির-দিন উদাসীন, তাঁকে কিন্তু সেদিন বেশ কৌতূহলী দেখিয়েছিল। বলেছিলেন, 'কোথায় গো, কোথায়?'

'কেষ্টপুরে।'

'কী পালা?'

'সীতার পাতাল প্রবেশ।'

'সীতার পাতাল প্রবেশ!' মায়ের চোখেমুখে চকিতের জন্য কিসের ছায়া পড়ে মুহূর্তে অদৃশ্য। তিনি বলেছিলেন, 'দেখতে ভারি ইচ্ছে করছে। কিন্তু—'

'কী?'

'নিয়ে যাবে কে?'

'কেন, আমি।'

'কিন্তু—'

'আবার কী?'

'কেষ্টপুর তো অনেক দূর।'

'দূর আর কোথায় ? মোটে তো পাঁচ মাইল পথ। বিকিল বেলা রওনা দিলে সন্ধ্যের মুখে পৌঁছে যাব।'

হঠাৎ মায়ের কী মনে পড়ে যাওয়াতে তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিলেন, 'যাত্রা দেখতে তো যাবে বলছ, তা তো হবে না।'

'কেন ?'

'বাঃ রে, কালকের কথা তুমি ভুলে গেছ! কাল থেকে অফিসে যেতে হবে না ?'

বাবা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু মুহূর্তমাত্র। তারপরেই তুড়ি মেরে ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার মত করে লঘু স্বরে বলেছিলেন, 'অফিস তো কাল দশটায়। পালা শেষ হচ্ছে ভোরবেলা, সাতটার ভেতর আমরা বিবিবাজারে ফিরতে পারব। সাত-টায় ফিরে দশটায় অফিস কি আর করতে পারব না ? খুব পারব। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।'

'সারা রাত জেগে এতখানি পথ হেঁটে শরীর খারাপ হবে তোমার, অফিস করতে কষ্ট হবে।'

'আরে না-না। রাতের পর রাত জাগার, মাইলের পর মাইল হাঁটার অভ্যেস আমার আছে!'

'ভাল করে ভেবে দেখ।' মায়ের প্রাণের দুই প্রান্তে তখন দুই বিরুদ্ধ স্রোতের টানাটানি। একদিকে কেষ্টপুরে বাবার সঙ্গে যাত্রা শুনতে যাবার আকর্ষণ, অন্য দিকে রয়েছে বাবার চাকরি। এতকাল পর বাবার মতিগতির যখন সত্যিই পরি-বর্তন হয়েছে তখন সামান্য একটু শখের জন্য ক্ষতি করে বসা কোন কাজের কথা নয়। তাই মায়ের ভাবনা যেন কিছুতেই কাটতে চাইছিল না।

বাবা আশ্বাসের ভঙ্গিতে হেসেছিলেন, 'অনেক বার ভেবে দেখেছি। তোমার চিন্তার কিছু নেই।'

'বেশ, তা হলে যাব।'

বাবা কি বলতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় আমি তাঁর হাত ধরে ঝুঁকিয়ে আমার মুখটা তাঁর কানের কাছে নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলেছিলাম, 'মাকে বল, আমিও যাব।'

বাবা দুষ্টুমি করে হেসেছিলেন, 'কেন, তুই বল্ না।'

অনেক কাল পর বাবা এসেছেন, ফলে মা-ও অনেক বদলে গেছেন। তাঁর নিষ্ঠুরতা নেই বললেই চলে। এখন তিনি স্নেহময়ী, সহৃদয়। তবু তাঁর সম্বন্ধে ছেলেবেলা থেকে আমার প্রাণে ভয়ের একটা সংস্কার তৈরি হয়ে গেছে, সেটা কোনদিনই কাটিয়ে ওঠা আমার পক্ষে বুঝিবা অসম্ভব। মায়ের পরিবর্তন যতই হোক,

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা আমার পক্ষে নিতান্তই অভাবিত, অকল্পনীয়। বাবার সম্মতি আগেই পেয়েছি কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। মা আমার কাছে উচ্চতম আদালত; তাঁর অনুমোদন ছাড়া কেষ্টপুরে যাওয়ার কোন উপায়ই নেই। কাজেই চাপা গলায় বাবাকে বলেছিলাম, 'তুমি মাকে বল—'

আমাদের ফিসফিসানি শুনে মা কিছু একটা অনুমান করতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কিছু বুঝতে না পেরে বলেছিলেন, 'কী ব্যাপার, বকু কী বলছে?'

'কী বলছে, ওকেই জিজ্ঞেস কর।' বাবার হাসি-হাসি মুখে সেই দুষ্টুমিটা ফুটেই ছিল।

ভাল উকিলই যোগাড় করেছিলাম, আমার হয়ে বাবা কোথায় কৌশলে অনুমতিটা আদায় করে নেবেন, তা নয়। আমার সঙ্গে শুধু তামাশাই করে চলেছেন। বাবার ওপর খুব রাগ হয়েছিল আমার, অভিমানে-দুঃখে চোখে জলও এসে গিয়েছিল।

আমার অবস্থা দেখে বাবার এবার করুণাই হয়ে থাকবে। মাকে বলেছিলেন, 'খোকা যাত্রা শুনতে যাবে বলছে।'

মা বলেছিলেন, 'এতখানি হাঁটতে ও পারবে? শুধু যাওয়াই তো নয়, ফিরতেও হবে। তার ওপর আছে রাত জাগা। ঐ তো রোগা শরীর, এতখানি ও পারে কখনও।'

বাবাও গম্ভীরভাবে মাথা নেড়েছিলেন, 'আমিও তো তা-ই ভাবছি। দুর্বল রোগা মানুষ, এত হাঁটাহাঁটি রাত জাগার ধকল ওর পোষাবে না।'

এবার আর সহ্য হয়নি, জেলাবোর্ডের সড়কে দাঁড়িয়ে বাবা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এরই ভেতর তা ভুলে গেছেন? এক ঘণ্টাও তো হয়নি, বাবার স্মৃতি কি এতই দুর্বল? বাবার এই বিশ্বাসঘাতকতা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না। এতক্ষণ চোখদুটি জলে টল টল করছিল, এবার জোরে জোরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলেছিলাম। কাঁদতে কাঁদতে হেঁচকি উঠে গিয়েছিল।

বাবা এবার দু হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, 'কাঁদিস না, একেবারে বোকা, ঠাট্টাও বোঝে না। তখনই তো বলেছি, যাত্রা শুনতে যাবি।'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলেছিলাম, 'মা তো বললে না।'

মায়ের দিকে ফিরে ফিরে বাবা বলেছিলেন, 'কই গো, বল একটু—'

মা সেদিন বরদা। বলেছিলেন, 'যাবি-যাবি। এবার কান্না থামা বাপু। একেবারে কানের পোকা বার করে ছাড়লে।'

মায়ের কাছ থেকে পাকা কথা আদায়ের পর তবে আমার কান্না থেমেছিল।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে বাবা বলেছিলেন, 'কার্তিক মাস, তার ওপর ছেলেটাও সঙ্গে যাবে। বিকেলবেলা বেরুলে কেষ্টপুর পৌঁছুতে পৌঁছুতে সন্ধ্যে পেরিয়ে যাবে। সন্ধ্যেবেলা হিম পড়ে। কার্তিকের হিম লাগলে খোকার অসুখ করতে পারে। তার চাইতে এক কাজ করা যাক।'

মা বলেছিলেন, 'কী ?'

'আর খানিকটা পরই বরং বেরিয়ে পড়ি। সন্ধ্যের আগে আগেই পৌঁছে যাব।'

'সেই ভাল।'

'তা হলে সেজেগুজে নাও।'

মা চোখের তারায় কেমন এক দৃষ্টি ফুটিয়ে ঠোঁট উল্টে বলেছিলেন, 'কি কথা! সেজেগুজে!'

বাবা কিছু না বলে হেসেছিলেন।

মা বলেছিলেন, 'জামাকাপড় পরব একটু পরে, আগে বাসন-কোসনগুলো মেজে নিই।'

'আচ্ছা, তুমি কাজকর্ম সেরে তৈরি হয়ে থেকো, আমি একটু ঘুরে আসছি।'

'বাবারে বাবা, রাতদিন খালি ঘোরা আর ঘোরা। আমার কাজ সারা পর্যন্ত একটু শুয়ে থাকো না বাপু।'

'এই যাব আর আসব।'

'দেরি কোরো না।'

'আরে না-না, দেখবে তুমি কাজ সারবার আগেই ফিরে আসব।'

সেদিন যাত্রা শুনতে যাব, কাজেই স্কুলে যাইনি। পাছে কোন অজুহাতে আমার যাওয়াটা বন্ধ হয়ে যায় সেই আশঙ্কায় বাবার কাছছাড়া হচ্ছিলাম না, একেবারে গায়ের সঙ্গে লেগে ছিলাম।

দুপুরবেলা বাবার ঘুমোবার অভ্যাস নেই। অন্য সব দিন আমি যখন স্কুলে থাকতাম বাবা উদাসীন আনমনে বিবিবাজারে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন কখনও বা স্টেশনে গিয়ে সুরকি বিছানো প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ট্রেনের যাওয়া-আসা দেখতেন। রাত্রিটুকু বাদ দিলে হাত-পা গুটিয়ে সারাদিন দু-ঘণ্টাও তাঁকে স্থির হয়ে বসে থাকতে দেখিনি।

বাবাকে বলেছিলাম, 'বাবা, আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

বাবা বলেছিলেন, 'না-না, আমার সঙ্গে কোথায় যাবি। তুই জামা-প্যান্ট পরতে থাক, আমি এলাম বলে।'

বাবা বেরিয়ে গিয়েছিলেন। অগত্যা কি আর করি, আমি বাড়িতেই থেকে গিয়েছিলাম।

এদিকে মা তাড়াতাড়ি বাসন-কোসন মেজে ঘরদোর ধুয়ে চুল বাঁধতে বসেছিলেন। স্থির হয়েছিল, ছোট ভাইবোন দুটোকে দাদু-দিদিমার কাছে রেখে আমরা যাব।

মায়ের সাজসজ্জার সমারোহটা সেদিন খুব বেশি। বাবার সঙ্গে আগে আর কোনদিন মা বেড়াতে বেরিয়েছেন কিনা আমার জানা নেই। জীবনের এই পরম লগ্নকে মা অবহেলা করেন নি, দু হাত বাড়িয়ে তা মাথায় তুলে নিয়েছিলেন।

বড় একখানা আয়না সামনে বসিয়ে মা চুল বাঁধতে বসেছিলেন। ঘন কুঞ্চিত নিবিড় চুল মায়ের, সেগুলোকে বেণীবদ্ধ করে একটা বিশাল কল্কা খোঁপা তৈরি করেছিলেন। মুখখানি সাবানে ধুয়ে হিমানী মেখে হাল্কা করে পাউডার বুলিয়ে নিয়েছিলেন। চোখের কোণে দিয়েছিলেন দীর্ঘ রেখায় কাজলের টান, কপালে কুমকুমের একটি রক্তাভ বিন্দু। কানে দিয়েছিলেন ঝুমকো, নাকে পান্না-বসানো নাকছাবি, হাতের আঙুলে লখাটে আংটি, গলায় তিন লহর সীতাহার। সাটিনের সায়া আর রেশমী ব্লাউজ গায়ে দিয়ে কুঁচি-দেওয়া নীলাম্বরী পরে, এবং আমাকে সাজিয়ে শুরু হয়েছিল প্রতীক্ষা।

একটু পরেই বাবার ফেরার কথা ছিল। কিন্তু দেখতে দেখতে দুপুরটা চোখের সামনে দিয়ে পার হয়ে গেল। রোদের তাপ ক্রমশ জুড়িয়ে জুড়িয়ে রঙ ধীরে ধীরে হলুদ হয়ে একসময় বিকেল এসে গিয়েছিল।

এদিকে মা অস্থির হয়ে উঠছিলেন, আমারও চাঞ্চল্যের আর যেন শেষ ছিল না।

একসময় দাদামশায় অফিস থেকে ফিরে এসেছিলেন। সকালে কাজে বেরুবার সময়ই তিনি শুনে গিয়েছিলেন, বাবার সঙ্গে কেষ্টপুরে আমরা যাত্রা শুনতে যাব। আমরা তখনও বেরুইনি দেখে খানিক অবাক হয়েই বলেছিলেন, 'কি রে বড় খুকি, এখনও তোরা রওনা হস নি যে?'

মুখ ভার করে মা দাঁড়িয়ে থেকেছেন, উত্তর দেননি।

আমি বলেছিলাম, 'বাবা সেই দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় বলল, এক্ষুনি ফিরে আসবে। এখনও আসছে না।'

দাদু বলেছিলেন, 'বলে যখন গেছে তখন নিশ্চয়ই আসবে। হয়ত কোন কিছু দেখে আটকে গেছে।' বলে হাতমুখ ধুয়ে চা খেতে বসেছিলেন।

এক সময় হেমন্তের স্বল্পায়ু বিকেল ফুরিয়ে এল। আমাদের বাড়ির পেছন দিকে ছিল ঝোপ-ঝাড়। সারাদিন সেখানে একদল হলুদ পাখি ডেকে ডেকে সারা হত। কার্তিকের রোদ নিতে এলে তারা অনিশ্চিত নীড়ের দিকে চলে গিয়েছিল। বুকে

দিগন্ত ঘিরে ফিনফিনে সিল্কের পর্দার মত কুয়াশা জমতে শুরু করেছিল। তবু বাবার দেখা নেই।

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল দাদুর। তিনি বেশ উদ্বিগ্নই হয়ে উঠেছিলেন এবার, 'তাই তো মাধব গেল কোথায়?' বলতে বলতে উঠে পড়েছিলেন. 'যাই, একটু দেখে আসি।'

দাদু বেরুতে যাবেন, মা তীক্ষ্ণস্বরে ডেকেছিলেন, 'বাবা—'

চমকে দাদু মেয়ের দিকে তাকিয়েছিলেন, 'কী ব'ছিস্!'

'তোমাকে কোথাও যেতে হবে না।'

'তুই বললেই হল, যেতে হবে না! ছেলেটার বিপদ-আপদও তো কিছু হতে পারে।'

মা আর বাধা দেননি, দাদুও আর না দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

আমার কথা না বলাই ভাল। কেষ্টপুরের আসর থেকে যাত্রার দলটা মোহময় স্বপ্নের মত আমাকে অবিরাম হাতছানি দিয়ে যাচ্ছিল। আমি অধীর হয়ে পড়ছিলাম, অস্থির হচ্ছিলাম, আশাভঙ্গের মনস্তাপে মনে হচ্ছিল ছোট্ট হৃৎপিণ্ডটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

মায়ের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। জীবনে সেই প্রথম বাবার সঙ্গে বেড়াতে যাবার জন্ম তিনি সাজসজ্জা করে উন্মুখভাবে প্রতীক্ষা করছিলেন। কিন্তু প্রতীক্ষার পুরস্কারটা যে এভাবে আসবে, তা যেন কল্পনাও করতে পারেন নি।

সেই বয়সে আমার পক্ষে মানুষের নিভৃত মনের গভীর গহন তত্ত্ব বুঝতে পারা সম্ভব ছিল না। তবু আড়ে আড়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম ক্ষোভ, অভিমান, দুঃখ, বেদনা, হতাশা এবং আরো অনেক কিছু যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে সে মুখে মুহূর্তে মুহূর্তে রঙবদলের পালা চালিয়ে যাচ্ছিল। অসহ্য আবেগে যে ঠোঁট-দুটি থরথর, প্রাণপণে সে দুটি টিপে টিপে ধরতে চাইছিলেন মা। চোখ ভর্তি তাঁর জল, গাল বেয়ে তা গড়িয়ে আসেনি, প্লাবন-বিলাসী নদীর মত থমকে ছিল।

মনে পড়ে, সন্ধ্যে পার হয়ে রাত্রি নামার সঙ্গে সঙ্গে ঘষে ঘষে কপাল থেকে কুম-কুমের টিপ তুলে ফেলেছিলেন মা, কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুখের পাউডার-হিমানীর প্রসাধন নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন। তারপর একে একে হার-চুড়ি-ঝুমকো-আংটি-নাকছাবি, সর্বাঙ্গের সমস্ত গয়না খুলে খুলে বিছানায় ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। এমন কি নীলাম্বরী শাড়ি আর রেশমী জামাটাও গায়ে রাখেন নি, সে দুটোও খুলে তার বদলে পরেছিলেন সেই পুরনো পোশাক—আধময়লা মিলের শাড়ি আর লংক্লথের সেমিজ। মুহূর্তে মা আমার সেই চিরদিনের চেনা যোগিনী।

দিদিমা কাছাকাছিই ছিলেন। মাকে জামাকাপড় গয়নাগাটি খুলে সন্ন্যাসিনী হতে দেখে বলেছিলেন, 'এ সব খুলে ফেলছিস কেন বড় খুকি ?'

মা নিশ্চুপ।

'মাধব এলে আবার তো পরতে হবে।'

মা নিরুত্তর।

দিদিমা এবার খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন, 'কি রে, কথার জবাব দিচ্ছিস না যে বড়—'

খুব আস্তে মা বলেছিলেন, 'কী জবাব দেব ?'

'মাধব এলে—' দিদিমা তাঁর কথা শেষ করতে পারেন নি।

তার আগেই মা বলে উঠেছিলেন, 'ও আর আসবে না।'

দিদিমা বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, আসবে না। তোকে বলেছে। কাল থেকে বলে তার চাকরি।'

'চাকরির ওপর কত মায়া তার!' মা বলে যাচ্ছিলেন, 'দশ বারো বছর বিয়ে হয়েছে। ছেলেপুলেগুলো আর আমি যাকে ধরে রাখতে পারলাম না সে আবার চাকরির টানে আসবে!'

'তুই থাম্ তো। এ সব অকথা কুকথা তোকে বলতে হবে না।'

'সত্যি কথায় এত ভয় পাও কেন মা? ওর স্বভাব তো তোমার অজানা নয়। দু দিনের জন্যে আসে, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে মন ভেজায়, তারপরেই উধাও। ওর মনে কোথায় কী আছে সব জানি। ওকে দেখে দেখে চোখ আমার পচে গেছে।'

মা বাবার ভেতর-বাইরের সব খবরই তো রাখতেন। তবু দুদিনের জন্য বাবা এলে তাঁর কথায় ভুলতেনই বা কেন, বিপুল সাধে বুক পূর্ণ করে তাঁর সঙ্গে যাত্রা দেখতে যাবার জন্য সেজেগুজেই বা বসে ছিলেন কেন, আমার সেই ছেলেবয়েসে তা এক অসীম রহস্য।

দিদিমা যেন নিজেকে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতেই বলেছিলেন, 'না-না দেখিস, এবার মাধব কিছুতেই পালাবে না। বকুটা বড় হয়েছে, ওর মায়ায় অন্তত থেকে যাবে।'

'তুমি দেখো মা, ও আসবে না। আমার কথা মিলিয়ে নিও।'

বিরক্ত দিদিমা এবার ধমক দিয়েছিলেন, 'তুই চুপ কর—'

'বেশ চুপ করছি।' বলে আমার হাত ধরে মা ফর্সা প্যান্ট-শার্ট ছাড়িয়ে বাড়িতে পরার ময়লা পোশাক পরাতে বসেছিলেন। আর আমি হঠাৎ জোরে জোরে ফুঁপিয়ে উঠেছিলাম।

দিদিমা কি বলতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেইসময় দাদু ফিরে এসেছিলেন। একাই ফিরেছেন তিনি, বাবা সঙ্গে নেই।

উদ্বিগ্ন স্বরে দিদিমা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'মাধব কোথায়?'

বিমর্ষ মুখে দাদু বলেছিলেন, 'জানি না। সারা বিবিবাজার ঘুরে এলাম, কেউ তার খবর বলতে পারল না। আশ্চর্য, গেল কোথায় সে!'

'স্টেশনের দিকটায় গিয়েছিলে?'

'সব—সব জায়গায় গেছি। কিছুই বাকি রাখিনি।'

'তবে কি—'

'কী?'

'ভুল করে একাই যাত্রা শুনতে চলে গেল?'

'তাই বা কী করে হবে।' দাদু অনিশ্চিতভাবে মাথা নেড়ে বলেছিলেন, 'কি জানি, কিছুই বলা যায় না।'

দিদিমা বলেছিলেন, 'দেখ, কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে।'

'তা ছাড়া আর উপায় কি?'

দাদু-দিদিমার কোন কথাই বুঝি মায়ের ওপর রেখাপাত করতে পারেনি। যে মা শাড়িতে-গয়নায়-প্রসাধনে খানিক আগে নিজেকে সাজিয়ে বাবার জন্য একটি একটি করে মুহূর্ত গুণে যাচ্ছিলেন তিনি যেন অন্য কেউ। আশৈশবের চেনা আমার যোগিনী মায়ের সঙ্গে তার কোন মিল নেই।

দাদু আর দিদিমা যখন উৎকণ্ঠা আর দুশ্চিন্তায় মগ্ন মা তখন একান্ত উদাসীনতায় আমাকে ডাক দিয়েছিলেন, 'খাবি আয়।' দাদুকে বলেছিলেন, 'অনেক রাত হয়ে গেছে বাবা, হাত-মুখ ধুয়ে এস, বকুর সঙ্গে তোমাকেও খেতে দিই।'

দাদু কি উত্তর দিয়েছিলেন, মনে নেই।

শুধু এটুকু মনে আছে, সে রাত্রে বাবা আর ফেরেন নি। সে রাত কেন, তার পরের দিনও না। তারপরের দিনও না। দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল, বাবা আর ফিরলেন না।

বাবা নিরুদ্দেশ হবার পর শোবার ব্যবস্থায় আবার পরিবর্তন হয়েছিল। ছোট ভাইবোনেরা ঘর বদল করে মায়ের কাছে শুতে এসেছিল। মা আবার নিষ্ঠুর ক্ষমা-হীন হয়ে উঠেছিলেন।

বাবার বুকের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে ক'রাত শুয়েছি। সজ্ঞানে, পরিপূর্ণভাবে বাবাকে সেই আমার প্রথম পাওয়া। বাবা চলে যাবার পর মনে হয়েছিল আমার

ভুবন শূন্য হয়ে গেছে, দু হাত ভরে জগতের কি এক সম্পদ পেতে যাচ্ছিলাম, পেতে পেতেও পাওয়া হল না।

মনে আছে, রাত্রিবেলা শুয়ে শুয়ে কাঁদতাম। কেউ কাছে না থাকলে নির্জনে চোখে জল এসে যেত। কিছুদিনের জন্য কান্নায় আমাকে পেয়ে বসেছিল।

বাবা আমাকে দেখার চোখ দিয়ে গেছেন, অস্ফুট ইন্দ্রিয়গুলোকে ফুটিয়ে দিয়েছেন। বাবা যখন ছিলেন তখন পৃথিবী আমার চোখে বেগবর্ণময় রমণীয় এক ছবি মনে হ'ত। তখন বিলের বুকে নীলচে কচুরি ফুল তুলতে দেখে মুগ্ধ হতাম। মুগ্ধ হতাম আকাশের মেঘ দেখে, দিগন্তবিসারী ধানের ক্ষেত দেখে, জেলাবোর্ডের আঁকাবাঁকা দূরাভিসারী রাস্তাটা দেখে, ভ্রমরের গুঞ্জন শুনে, গরুর গাড়ির চাকায় ক্যাঁচকোঁচ শব্দ শুনে। পৃথিবীর সব দৃশ্য সব ধ্বনি একাকার হয়ে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলত। কিন্তু বাবা যাবার পর সব কেমন যেন বিবর্ণ, বিস্বাদ হয়ে যেতে শুরু করেছিল। মেঘ-পাখি-মাঠ-ফুল, চোখের সামনের সমস্ত কিছুই আকার বিহীন মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সব একাকার হয়ে অন্ধকার এক ঘূর্ণির মধ্যে একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছে।

এতদিন বাবা আসেন নি, সে একরকম ভাল ছিল। এলেন যদি তবে চিরদিন রইলেন না কেন? কয়েকদিনই যদি থাকবার ছিল তবে ক্ষণস্থায়ী এক উৎসব বাধিয়ে তুললেন কেন? কেন জীবনের সুধাপাত্র আমার মুখের কাছে ধরে চুমুক দেবার আগেই টেনে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন? অভিমানে দুঃখে আমার ছোট্ট হৃৎপিণ্ড যেন চৌচির হয়ে গিয়েছিল।

এগারো

বাবা চলে যাবার পর বাড়ির আবহাওয়া থমথমে হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য মায়ের কোন প্রতিক্রিয়া বোঝা যাচ্ছিল না, বাবাকে দেখার পর যে মানুষ চিরন্তন নিস্পৃহতার আর নিষ্ঠুরতার মলাট খুলে বেরিয়ে এসেছিল, আকস্মিক আত্মপ্রকাশের পর আবার নিজেকে সে আরো কঠিন আবরণের ভেতর লুকিয়ে ফেলেছিল

দাদু-দিদিমার হা-হুতাশ আর ক্ষোভ কিন্তু সর্বক্ষণই বাড়ির হাওয়াকে ভারী করে যেত। দাদু বলতেন, 'ইস, এমন চাকরিটা! লেগে থাকলে দু-চার বছরের ভেতর খুব উন্নতি হত। সাহেব বলেছে, ভাল লেখাপড়া জানা ছেলে, অফিসার হয়ে যেত।'

দিদিমা মায়ের কান বাঁচিয়ে বলতেন, 'কপাল, বড় খুকির কপাল! কি কুক্ষণে

যে হতভাগার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলাম।'

এই সময়কার সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, আমার দ্বিতীয় বন্ধু পাওয়া। এই বন্ধুটির নাম হাবু। হাবু আমাদের ক্লাসেই পড়ত।

মনে আছে, স্কুল ছুটির পর হীরুদের বাড়ি যাওয়া একইভাবে চলছিল। তেমনই নিয়মিত, তেমনই দৈনন্দিন। ওরা আগে আগে ফীটনে করে বাড়ি পৌঁছে দিত। পরে হেঁটেই ঐ পথটুকু চলে আসতাম। কোন কোন দিন হীরুই আমার সঙ্গী হ'ত কোন কোন দিন একাই আসতাম।

একদিন একা ফিরছি, হাবু ডেকেছিল, 'এই চিরন্তন, এই—'

হীরুদের আর আমাদের বাড়ির মাঝামাঝি জায়গায় শীতলাতলা। একটা ঝাঁকড়া অশ্বত্থগাছের গোড়া ঘিরে বাঁধানো বেদী, মন্দির। সেখানে পাড়ার ছোট ছোট ছেলেরা প্রতিদিন গুলি খেলার আসর বসাত। হাবুকেও তাদের মধ্যে দেখেছি।

এ পথ দিয়ে রোজ যাতায়াত কিন্তু কোনদিন হাবু আমাকে ডাকেনি। এক ক্লাসে পড়তাম বলে মুখচেনাটা ছিলই, এক আধটা কথাও যে না হয়েছে তা নয়। ঐ পর্যন্তই।

হাবু ছেলেটা কালো, ছোট ছোট চোখ। খাড়া চুল, গোলগাল শরীর। পরনের ইজেরটা সর্বক্ষণই মাধ্যাকর্ষণের টানে নিচের দিকে নেমে যেতে চাইত, হাবু তা হতে দেবে না। প্রতি মুহূর্তে একটা করে হ্যাঁচকা টান মেরে ইজেরের নিম্নগামী চল ঠেকাত। নাক দিয়ে গঙ্গা-যমুনার দু'টি ধারা সব সময়েই বেরিয়ে আছে, সে দুটোর ওপর বড় মায়া হাবুর। ইজেরের মতই টান দিয়ে সে সে-দুটো ভেতরে নিয়ে যেত। আরেকটা লক্ষণীয় ব্যাপার ছিল তার আঙুল চোষা। অন্যমনস্কের মত বাঁ হাতের মধ্যমা আর অনামিকা এই দুটি মুখে পুরেই আছে।

হঠাৎ সেদিন আমাকে ডাকাতে অবাকই হয়েছিলাম। থমকে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম, 'কি, ডাকছ কেন?'

মুখের ভেতর থেকে আঙুল বার করে হাবু বলেছিল, 'রোজই তুমি হীরুদের বাড়ি যাও, তা কিন্তু তাই হবে না।'

হাবু কি বলতে চায় বুঝতে না পেরে তাকিয়েই ছিলাম।

হাবু এবার বলেছিল, 'আমি বুঝি তোমার বন্ধু না?'

হঠাৎ এভাবে বন্ধুত্বের দাবিতে হকচকিয়ে গিয়েছিলাম, 'কে বললে বন্ধু না!'

'তা হলে আজ আমাদের বাড়ি যেতে হবে, চল।'

'আজ কি করে যাব?'

'কেন?'

'সন্ধ্যে হয়ে এল, দেরি হলে মা বকবে।' বকুনি না, বিশুদ্ধ স্বারই যে মায়ের হাতে খেতে হবে সে কথাটা আর বলিনি।

হাবু বলেছিল, 'তা হলে কাল আসবে তো?'

তার কথায় এমন এক আন্তরিকতা ছিল যাতে কথা না দিয়ে পারিনি। বলেছিলাম, 'আচ্ছা।'

পরের দিন হীরুদের বাড়ি থেকে একটু আগে আগে বেরিয়ে হাবুদের বাড়ি গিয়েছিলাম। শুধু পরের দিনই না, মাঝে মাঝেই সেখানে যেতাম। হাবুদের বাড়ি যাতায়াতের কথাটা সবার কাছেই গোপন রেখেছি, এমন কি প্রাণের বন্ধু হীরুকে পর্যন্ত জানতে দিইনি। হাবুকে বলে দিয়েছিলাম, সে যেন এ কথা কাউকে না বলে। মাকে বলার কোন প্রশ্নই নেই। হীরুদের বাড়ি পর্যন্ত আমার গতিবিধির যে সীমারেখা তিনি টেনে দিয়েছিলেন, তার বাইরে আর কোথাও যাবার অনুমতি চাইতে গেলে হয়ত বিপদ ঘটতে পারে। অতএব ব্যাপারটা সঙ্গোপনেই রাখতে হয়েছিল। জীবনে মায়ের সঙ্গে সেই বোধ হয় আমার প্রথম লুকোচুরি।

হাবুদের বাড়ি গেলে আদর যত্নের অভাব ঘটত না। হাবুর মা, যেদিনই যেতাম সেদিনই ঘরে-তৈরি জিবে-গজা খেতে দিতেন। একেক দিন আমার মনে হত, ওদের বাড়িতে জিবে-গজার বিশাল একখানা আড়ত আছে।

কিন্তু-জিবে গজার লোভেই শুধু নয়, হাবুর বাবা-মায়ের টানেও ওখানে না গিয়ে পারতাম না। হীরুদের বাড়ির মত সেটা রোজকার ব্যাপার না হলেও প্রায়ই যেতাম।

হাবুর বাবার ছিল ব্যবসা। বাড়ির সামনের দিকে রাস্তার ওপর যে ঘরখানা সেখানে বংশ পরম্পরায় একটা মুদি দোকান ছিল। হাবুর বাবা প্রায় সমস্ত দিনই দোকানে বসে বিকিকিনি করতেন আর লালরঙের খেরো খাতায় হিসাব লিখে যেতেন।

দোকান থেকে সারাদিনে চার বার বাড়ির ভেতর যেতেন হাবুর বাবা। সকাল ন'টা নাগাদ একবার, দুপুরে একবার, বিকেলে একবার এবং শেষবার গভীর রাত্রে জমাখরচ মিলিয়ে। সকাল-দুপুর-বিকেলে বাড়ির ভেতর থেকে খেয়ে আবার দোকানে আসতেন। রাত্রিবেলা যে যেতেন, সেদিন আর ফিরতেন না। ফিরতে ফিরতে একেবারে পরের দিন ভোর। এ সব খবর বার বার যাওয়া-আসার পর আমি জানতে পেরেছি।

দোকানদারির কাছেই হাবুর বাবার সারা জীবনের সর্বস্ব বিকিয়ে-দেওয়া। যেটুকু সময় বাড়িতে থাকতেন তার সারাক্ষণই তিনি নিশব্দ। বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে

সঙ্গে হাবুর মায়ের সঙ্গে তাঁর তুলকালাম লেগে যেত। কারণ নেই অকারণ নেই, চোখোচোখি হলেই তাঁর চিৎকার, গর্জন। মুখ দিয়ে দু-জনের যা নিঃসৃত হয়ে আসত আর যাই হোক তা সুধা নয়, সুশ্রাব্য তো নয়ই। গলার জোরও দু-জনের অপরিসীম। তাঁদের কর্কশ কুৎসিত চিৎকারে বিবিবাজারের তাবৎ কাক ছিল সাত-পুরুষের ভিটেমাটি থেকে উদ্বাস্তু হয়ে যেত।

যে কেউ সামনে থাকুক, তাঁদের ভ্রূক্ষেপ নেই। ঝগড়া তাঁরা করবেনই। এমন কি আমার সামনেই যে কতবার তাঁদের যুদ্ধ হয়ে গেছে তার হিসেব নেই। প্রথম প্রথম ভয় পেয়ে যেতাম। হাবু অবশ্য অভয় দিয়ে বলত, 'ভয় পেও না, আমার মা-বাবা ঐ রকমই।' দেখতে দেখতে এই দু জনের সংঘর্ষ শেষ পর্যন্ত গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল।

বড় হয়ে এককে সময় আমার মনে হয়েছে, একটা চিরন্তন ঝগড়ার শর্তে হাবুর মা-বাবার মিলন বুঝি সম্ভব হয়েছিল।

যতক্ষণ ফুসফুসে শক্তি থাকত, দু-জনে পাল্লা দিয়ে চেঁচাতেন। তারপর শরীরে যখন আর কুলোত না তখন চুপ করে যেতেন। শারীরিক অবসাদ আর অপরিসীম ক্লান্তিই তাঁদের মধ্যে সাময়িক একটা সন্ধি নিয়ে আসত।

ঝগড়া-চিৎকার-খিস্তি, যাই হোক না, হাবুর বাবা এবং মায়ের মধ্যে তবু পরিষ্কার একটা সম্পর্ক ছিল। ঝগড়া তাঁরা করতেন স্বভাবের নির্দেশে। তাই বলে কেউ কারো প্রতি উদাসীন ছিলেন না। শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়ে এলেই একে অন্যের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতেন।

হাবুর মা বলতেন, 'আমাদের কী হয় বল তো?'

হাবুর বাবা বলতেন, 'ঝগড়ার ভূত ঘাড়ে চাপে।'

'যা বলেছ!' হাবুর মা লজ্জিত মুখে বলে যেতেন, 'দু-জনের দেখা হলেই আমরা হুলো বেড়াল হয়ে যাই। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খালি গর্জাই, এঁ্যাও—এঁ্যাও—'

হাবুর বাবা হেসে ফেলতেন, 'খুব বলেছ, হুলো বেড়াল—'

দেখাদেখি হাবুর মা-ও হেসে ফেলতেন।

হাবুর বাবা বলতেন, 'এখন তো হাসছ, একটু আগে হাসতে কি হয়েছিল?'

তুমিও তো হাসছ, একটু আগে তোমার হাসতে কি হয়েছিল?'

'খুব হয়েছে! এবার খেতে দেবে চল।'

'চল।'

পরিণত বয়েসে বিশ্লেষণ করে দেখেছি, এ-ও বুঝি এক ধরনের অনুরাগ। তার প্রকাশ যদিও হাঁরুর মা-বাবার মত হাসি-গল্প-উচ্ছলতার মধ্যে নয়, বরং তার বিপরীত বিচিত্র পথে, তবু তা প্রেমই।

সেই শৈশবে কষ্টকর এক অনুভূতির ভেতর ভাবতাম হীরুর বাবা-মায়ের মত দুরন্ত আবেগে ভেসে গিয়ে না হোক, হাবুর মা-বাবার মত মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করেও যদি বাবা আমাদের মধ্যে থেকে যেতেন, হা ঈশ্বর, যদি থেকে যেতেন—

বারো

বাবা নিরুদ্দেশ হবার পর আমাদের বাড়ির আকাশ-বাতাস মাত্র কয়েকটা দিন বিমর্ষ হয়ে ছিল। সংসারের আহ্নিক গতিতে খানিক তাল কেটেই আবার পুরনো অভ্রান্ত নিয়মটা ফিরে এসেছিল। দাদু আবার আগের মত রসোচ্ছল, আগের মতই মায়ের চোখের আড়ালে দিদিমা এবং নাতি-নাতনীদের নিয়ে মেতে উঠেছিলেন।

দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছিল, মাসের পিছু পিছু আসছিল মাস। মাত্র কয়েকটা দিনে বাবা সংসার জুড়ে যে ঢেউ তুলে গেছেন ধীরে ধীরে তা বিলীন হয়ে যেতে শুরু করেছিল। গভীর রেখায় যে ছাপটি এঁকে দিয়ে গিয়েছেন তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল।

বাবার নাম কারো মুখে আর উচ্চারিত হতে শুনতাম না। তাঁর কথা কেউ আর বলতেন না। দাদু না, দিদিমা না, মা তো ননই। একটা দীর্ঘদেহ প্রাণবন্ত মানুষ সবার স্মৃতি থেকে একেবারে মুছে গিয়েছিলেন। কিন্তু সত্যিই কি এভাবে কেউ মুছে যেতে পারে?

আমি তো আর অন্তর্যামী নই, দাদু-দিদিমা আর মায়ের মনের গভীর গহন প্রান্তে বাবা সম্বন্ধে কোন স্রোত খেলছে, আমার পক্ষে তা জানা সম্ভব ছিল না। তবে নিজের কথা তো জানি। রাত্তিরবেলা বালিশে মুখ গুঁজে আগে আগে বাবার জন্য কাঁদতাম, পরে অবশ্য চোখ বেয়ে জল নামত না। তবে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুম-না-আসা চোখ দুটি জ্বালা জ্বালা করত।

আমার সত্তায় চারপাশে বাবার স্মৃতি ছিল ছড়ানো। দূর আকাশে সাদা মেঘের ভেলা যখন ভেসে যেত কিংবা বাড়ির পেছন দিকের ঝোপে নীলকণ্ঠ পাখিটা ল্যাজ দুলিয়ে দুলিয়ে নাচতে থাকত অথবা খুব ভোরে সোনার টোপর মাথায় দিয়ে সূর্য যখন উঠে আসত সেই সময় বাবাকে খুব মনে পড়ত। সেইসময় জেলাবোর্ডের যে সড়কটা এঁকেবেঁকে অনেক দূরের মাঠে হারিয়ে গেছে, সেই পথটা, কচুরিপানায় ভর্তি দিগন্তবিসারী বিল অথবা বনের ভেতর সজারুর সন্ধানে সেই নিশিযাপনের স্মৃতি আমাকে হাতছানি দিতে থাকত। মনটা আমার তখন অত্যন্ত ভারী আর উদাস হয়ে যেত। বাবার জন্য কষ্টকর এক অনুভূতি ধীরে ধীরে আমার সত্তাকে আচ্ছন্ন করে

ফেলত। তখন কিছুই আর ভাল লাগত না। মা আমার স্বভাবের চারদিকে উঁচু উঁচু দেওয়াল তুলে দিয়ে বাইরের সঙ্গে প্রায় সব যোগাযোগই বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন। বাবা যেন সেই দেওয়ালের একটা দিক ভেঙেচুরে তার ভেতরে সজীব হাওয়া বইয়ে দিয়েছিলেন। আর সেই হাওয়াটা প্রায়ই আমাকে দুলিয়ে দিয়ে যেত।

এরই মধ্যে একদিন আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে গেল। লেখাপড়ায় আমি ভালই, একেবারে ফার্স্ট হয়ে নতুন ক্লাসে উঠেছিলাম।

নতুন ক্লাস অর্থাৎ থ্রী। থ্রীতে ওঠার কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন চোখে পড়েছিল, মা বড্ড রোগা হয়ে গেছেন। চোখের কোলে গাঢ় কালির ছোপ। কিছু খেতে পারতেন না, খেলেই বমি হয়ে যেত। মেজাজটা আরও খিটখিটে হয়ে উঠেছিল, আমাদের ওপর মারধোরের মাত্রাটাও গিয়েছিল অনেক গুণ বেড়ে। দু-চোখ নিষ্ঠুর ঘৃণায় সর্বক্ষণ যেন জ্বলত তাঁর।

শরীর ভেঙে যাচ্ছিল তবু মা কিন্তু সংসারের সব কাজই করে যাচ্ছিলেন। দিদিমা বলতেন, 'এ অবস্থায় কাজ আর না-ই করলি বড় খুকি—'বলে তাঁর হাত থেকে বাসন কোসন কেড়ে নিতে চাইতেন।

মা কিন্তু দিতেন না। বিরক্ত রূঢ় স্বরে বলতেন, 'তুমি যাও তো মা, এখন ঝামেলা ক'রো না।'

দিদিমা বলতেন, 'শেষে তুই একটা কেলেঙ্কারি করবি। কোথায় এখন বিশ্রাম করবে তা নয়, দিনরাত কাজ আর কাজ। হে ভগবান, আমার মরণও হয় না।'

মা উত্তর দিতেন না।

শুধু কাজকর্মের ব্যাপারেই না, খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধেও একই জেদ বজায় রেখে যাচ্ছিলেন। দাদু মায়ের জন্য দুধের ব্যবস্থা করেছিলেন, ভাল ফল, সন্দেশ, মাছ বাজার থেকে কিনে আনতেন। দিদিমা সে-সব সাজিয়ে মায়ের কাছে ধরতেন, 'খা—'

মুখ ফিরিয়ে মা বলতেন, 'না—'

'কী না?'

'ওসব আমি কখনও খাই যে নিয়ে এসেছ?'

'অন্য সময় না খাস, এখন খেতেই হবে। যে আসছে তার কল্যাণ-অকল্যাণের কথাটা তো ভাবা দরকার।'

মায়ের মুখের রেখা কঠিনতর হয়ে উঠত। তীব্র জ্বালাময় স্বরে বলতেন, 'সব কথা আমাকেই শুধু ভাবতে হবে। সমস্ত পাপের বোঝা আমাকেই বইতে হবে। পারব না, পারব না।' প্রখর বিদ্বেষে চোখের তারা দুটো যেন জ্বলতে থাকত মায়ের। রুগ্ন

শিরাপ্রকট শরীরের ভেতর থেকে আগুনের তাপের মত কি যেন বেরিয়ে আসতে থাকত।

'পারব না বললে তো হবে না।' দিদিমা বোঝাতে চেষ্টা করতেন, 'মেয়ে হয়ে জন্মেছিস, পারতে যে হবেই বড় খুকি।'

মা আরো অসহিষ্ণু আরো উত্তেজিত হয়ে উঠতেন, 'নিয়ে যাও, নিয়ে যাও এই সব ছাইভস্ম।' টান মেরে ফল, দুধ, সন্দেশ ছুঁড়ে দিতেন।

দিদিমা শেষ চেষ্টা করতেন, 'কেন পাগলামি করছিস বাপু, এতে ক্ষতিটা কার? তোর না মাধবের?'

মা উত্তর দিতেন না।

দিদিমা আবার বলতেন, 'আত্মঘাতী হস নি বড় খুকি, এমন করে অবুঝ হওয়া ভাল না।'

মা এবার চেঁচিয়ে উঠতেন, 'তুমি এখান থেকে ওঠো তো মা, ওঠো। আমায় কাজ করতে দাও। একটা কথা তোমায় বলে দি।'

'কী?'

'আর কোনদিন ঐ সব ছাইভস্ম নিয়ে সোহাগ জানাতে এসো না।'

দিদিমা বিরক্ত, বিক্ষুব্ধ, অসন্তুষ্ট। উঠতে উঠতে বলতেন, 'তুই মরবি মরবি। নিজের ভাল পাগলেও বোঝে, তুই পাগলেরও অধম।'

অতএব মা যখন ফল-দুধ মিষ্টি খাবেন না তখন দাদু দিদিমা আর কি করতে পারেন। ওসব বাড়িতে আনাই তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

মা আর দিদিমার মধ্যে যা কথা হ'ত তার সবটুকু বুঝতে পারতাম না। সেটা বুঝবার বয়েসও নয়। তবে এটুকু বুঝেছিলাম মায়ের তীব্র মেজাজ, পাগলামি, ক্ষিপ্ততা—এ সবের কেন্দ্রে বাবা। বিবিবাজার থেকে নিরুদ্দেশ হবার আগে মায়ের কোন গভীর-গহন-দুর্বহ যন্ত্রণার কারণ হয়ে গেছেন তিনি।

যত দিন যাচ্ছিল, মায়ের শরীর আরো খারাপ হয়ে পড়ছিল। রুগ্ণ, অসুস্থ, অস্থিসার। চোখের তারায় জীবনের দীপ্তি ছিল না, মুখ নিষ্প্রভ। অমন যে উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ তা স্তিমিত। অবশ্য রাগটা একই রকম ছিল। নিয়মিত আমাদের মারতেন, বকাবকি করতেন। তবে শরীর দুর্বল বলে মারটা গায়ে লাগত না, বকুনিটাও অত্যন্ত নির্জীব শোনাত। একটু হাঁটলেই হাঁপিয়ে পড়তেন। জীর্ণ বুক সর্বক্ষণই ওঠানামা করত। পৃথিবীর সবটুকু ক্লান্তি যেন মায়ের ওপর ভর করে বসেছিল।

মনে পড়ে, একদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়েছি। সেদিন অনেকক্ষণ জেগে ছিলাম। আমাদের বাড়ির সবাইকার খাওয়া চুকলে ঘর ধোয়া বাসন মাজার

আওয়াজ কানে এসেছিল। তারপর টের পেয়েছিলাম, মা ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছেন। শোয়া মাত্র ঘুম। পাশের ঘরে দিদিমা-দাদুও গিয়ে খিল দিয়েছেন। তাঁদের ফিসফিসানি টুকরো টুকরো ভাবে কিছুক্ষণ কানে এসেছে। এক সময় কখন যেন দু-জনে থেমে গেছেন, ঘুমিয়ে পড়েছেন নিশ্চয়ই। বাইরের রাস্তায় কদাচিৎ দু-একটা ঘোড়ার গাড়ি যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে এক-আধটা মাতাল, তাদের টলটলায়মান পায়ের শব্দ এবং জড়িত কণ্ঠস্বর কানে আসছিল। শিয়রের দিকে একটা ঝোপ, সেখানে একটানা ঝিঁঝিদের কণ্ঠসাধনা চলছিল। কোতোয়ালী থানার পেটা ঘড়িটা খানিক পর পরই রাতের বয়েস ঘোষণা করে যাচ্ছিল। দশটা, সাড়ে দশটা, এগার, সাড়ে এগার। অবশেষে বারো।

রাত যত বেড়েছে বিবিবাজার ক্রমশ নিষুতিপুর হয়ে যাচ্ছিল। ঝিঁঝিদের জলসা থেমে গিয়েছিল, মাতালদের জড়িত পদক্ষেপ আর শোনা যাচ্ছিল না, ঘোড়ার গাড়িগুলোও যে কোথায় অদৃশ্য হয়েছিল কে বলবে। ধীরে ধীরে বিবিবাজারের স্তব্ধতা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল, ঘুমের অথৈ জলে কখন ডুবে গিয়েছিলাম মনে নেই।

জেগে উঠেছিলাম দিদিমার চেঁচামেচিতে। দু হাত ধরে আমাকে ঝাঁকুনি দিতে দিতে সোল্লাসে ডাকাডাকি জুড়েছিলেন, 'এই বকু, এই দাদাভাই, শিগ্গীর করে ওঠ—'

বাবা যে বলে গিয়েছিলেন, আমি বড্ড ঘুমকাতুরে। বিশেষণটা আমার সম্বন্ধে পুরোপুরিই খাটে। বিছানা কি সহজে ছাড়ি কিন্তু দিদিমা ছাড়বার পাত্রী নন। কাতুকুতু দিয়ে, ঠেলে, ধাক্কিয়ে উচ্ছ্বসিত স্বরে সমানে বলে যাচ্ছিলেন, 'ওঠ, ওঠ, ওঠ রে ভাই—'

আমি তাঁর হাতখানা ঠেলে দিয়ে দুই হাঁটু বুকের কাছে জড়ো করে জড়িত স্বরে বলেছিলাম, 'তুমি এখান থেকে যাও।'

'যাব কিরে, দেখবি আয় আমাদের বাড়ি কে এসেছে?'

এবার মন্ত্রের মত কাজ হয়েছিল। তবে কি বাবা ফিরে এসেছেন? পলকে চোখ থেকে ঘুম ছুটে গিয়েছিল। আমি ধড়মড় করে উঠে বসেছিলাম, 'কে এসেছে গো দিদিমা, কে?'

'চাঁদ।' চোখের কোণে রহস্যময় মধুর একটু হেসেছিলেন দিদিমা।

'কে এসেছে—বাবা?

'বলব না, নিজের চোখে দেখবি আয়।'

আমি বিছানা থেকে নেমে সম্মোহিতের মত পায়ে পায়ে দিদিমার সঙ্গে চলতে

শুরু করেছিলাম। তখনও ভাল করে ভোর হয়নি। অন্ধকার তেমন গাঢ় না হলেও সবেমাত্র ফিকে হতে শুরু করেছে। সময়টা ভোর আর রাত্রির মাঝখানে থমকানো, আকাশে চাঁদ ছিল না, তবে চন্দনের ফোঁটার মত তারার মেলা সাজানো ছিল

এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। দিদিমার সঙ্গে যে কথা বলেছি তা তাঁর পিছু পিছু যে হেঁটে চলেছি—সবই যেন ঘোরের মধ্যে, সজ্ঞানে নয়। হঠাৎ খেয়াল হল, দিদিমা ঘুম ভাঙিয়ে দেবার পর মাকে তো দেখিনি, তা ছাড়া আমাদের ঘরে দিদিমা এলেনই বা কী করে?

মনের ভেতর যে প্রশ্নগুলো নড়াচড়া করছিল সেগুলো মুখ ফুটে বলেই ফেলে ছিলাম।

দিদিমা বলেছিলেন, 'মন্তর দিয়ে তোদের ঘরে ঢুকেছি।'

দিদিমা যে আধেক ঢেকে আধেক রেখে আমার সঙ্গে রহস্য করেছিলেন, বুঝতে অসুবিধা হয়নি। তাঁর একটা হাত ধরে বলেছিলাম, 'বলো না দিদিমা?'

'ঐ বললাম তো।'

'মন্তর না হাতী।'

দিদিমা মুখ টিপে হেসেছিলেন, 'বেশ হাতীই।'

আমি আর এ প্রসঙ্গে কোন প্রশ্ন না করে অন্য কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ম কোথায়?'

'আর না। খালি মা কোথায়' তুমি কি করে এ ঘরে এলে? এত বকবক ন করে আমার সঙ্গে এলেই সব দেখতে পাবি।'

দিদিমার পিছু পিছু এক সময় দীর্ঘ বারান্দার শেষ প্রান্তে চলে গিয়েছিলাম। বারান্দাটার দু-দিকে দেওয়াল ছিল। আর দুটো দিকে দরমার বেড়া লাগিয়ে কখন যে সেটাকে একটা ছোটখাটো ঘর করে তোলা হয়েছিল, তা কে জানত। আমি রাত্তিরে খেয়ে দেয়ে শুতে যাবার সময়ও তো ঘরটাকে দেখিনি।

আমার ঘুমের সুযোগ নিয়ে রাতারাতি বারান্দার কোণে অস্থায়ী নতুন যে ঘরখানা তোলা হয়েছে খুব বেশিক্ষণ সেটা আমাকে বিস্মিত বিমূঢ় করে রাখতে পারেনি। তার চাইতেও হাজার গুণ বিস্ময় চোখের সামনেই ছিল।

সেই দরমায়-ঘেরা ঘরখানার ভেতরে যেন মেলা বসে গিয়েছিল। আমাদের প্রতিবেশিনীরা কচিৎ আমাদের বাড়ি আসতেন, কিন্তু সেদিন ভোর আর রাত্রির মাঝামাঝি সময়টায় সবাই ছুটে এসেছিলেন। গয়লা-বৌ, যে রোজ সকালে আমাদের দুধ দিয়ে যেত, তাকেও দেখতে পেয়েছিলাম।

আমাকে দেখে সবাই, বিশেষ করে গয়লা বৌ হৈ হৈ করে উঠেছিল, 'এসো

বকুবাবু, দেখবে এসো—'

এই অসময়ে গয়লা-বৌ কেন আমাদের বাড়ি এসেছে, সেটা আমার বুদ্ধির অগম্য। প্রতিবেশিনীরাও কেন এসেছেন তা-ও বুঝতে পারছিলাম না। যাই হোক, গয়লা-বৌর মাতামাতির ঘটাটা আমাকে অবাক করে তুলেছিল। পায়ে পায়ে অনেকটা ঘরের মধ্যে এগিয়েও গিয়েছিলাম।

ঘরটার এক কোণে তেলের প্রদীপ জ্বলছিল। মা কাত হয়ে নির্জীব. অনুভূতিশূন্যের মত শুয়ে ছিলেন, তাঁর পাশে ছোট্ট তুলতুলে মাখনের ডেলার মত নরম ধবধবে একটি শিশু। বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে তাকিয়ে আমি দেখে যাচ্ছিলাম। শিশুটি কোথা থেকে এল, মা-ই বা কেন ছেঁড়া শাড়ি পরে ওখানে শুয়ে—সবই আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হচ্ছিল।

এদিকে গয়লা-বৌ কাঁথায় জড়িয়ে শিশুটিকে তুলে আমার সামনে নিয়ে এসেছিল, 'কেন বল তো?

বিভ্রান্তের মত জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কে?'

'কি বোকা ছেলে গো, তোমার ভাই।'

'ভাই!'

'হ্যাঁ গো বকুবাবু। ভাই দেখালাম, এবার বখশিস দাও। এক টাকার কম কিন্তু নেব না।' বলে হাত পেতেছিল গয়লা-বৌ। বলতে ভুলেছি, গয়লা-বৌ দাই-এর কাজও করত।

এদিকে দিদিমা উচ্ছ্বসিত স্বরে বলেছিলেন, 'কেমন দাদাভাই, বলেছিলাম না, আমাদের বাড়ি সোনার চাঁদ এসেছে। কেমন?'

ঠিক এই সময় দাদু কোত্থেকে যেন এসে চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছিলেন, 'তোমরা সব চুপ করে বসে কেন? শাঁখ বাজাও, উলু দাও। সাত রাজার ধন এসেছে আমার ঘরে।'

প্রতিবেশিনীরা সঙ্গে সঙ্গে শাঁখ বাজাতে, উলু দিতে শুরু করেছিলেন। আমাদের সেই ছোট্ট বাড়িখানা ঘিরে উৎসব যেন মুখর হয়ে উঠেছিল।

আমার ভাই হয়েছে, খুশি হবারই কথা। কিন্তু আনন্দের চাইতে যা বেশি করে আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল তার নাম বিমূঢ়তা।

গয়লা-বৌ আবার বলেছিল, 'কই বকুবাবু, আমার বখশিস কই?'

দিদিমা আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, 'দাদাভাই কি আর চাকরি করে যে বখশিস দেবে! আমিই দিয়ে দেব।'

গয়লা-বৌ খুব খুশি, 'বেশ তো। আমার পাওনা নিয়ে কথা। বকুবাবুর নাক

করে আপনিই না হয় দিও।' আমার দিকে ফিরে বলেছিল, 'কি গো, ভাইকে কোলে নেবে নাকি?'

'হ্যাঁ।' আমি তৎক্ষণাৎ রাজী।

দিদিমা কিন্তু বাধা দিয়েছিলেন, 'না-না, এখন থাক। আঁতুর ছুঁলে আবার চান করতে হবে।'

'দাদা হয়েছে। ভাইকে ছুঁয়ে না হয় একটু চান করলই। নাও গো বকুবাবু, ভাইকে কোলে নাও।' গয়লা-বৌ কাঁথাজড়ানো তুলতুলে পুতুলটিকে আমার দিকে এগিয়ে দিয়েছিল।

আমি হাত বাড়াতে যাব, সেই সময় মায়ের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গিয়েছিল মায়ের চোখ আমার আজন্মের চেনা। মনের অতল স্তর থেকে সেখানে কখন কোন ছায়া পড়ে, দেখামাত্র আমি তা বলে দিতে পারতাম। ঐ চোখদুটির দিকে তাকিয়ে টের পেতাম মা কখন রাগ করেছেন, কখন খুশি হয়েছেন। কখন নিস্পৃহ, কখন ক্ষিপ্ত, কখন অসন্তুষ্ট—সে কথা মুখ ফুটে আর বলতে হ'ত না মাকে। চোখের তারায় তা লেখা থাকত।

সেদিন নতুন ভাইকে কোলে নিতে নিয়ে থমকে গিয়েছিলাম। এক কোণে শায়িতা আমার মা ছিলেন অত্যন্ত ক্লান্ত, নির্জীব, প্রায় নিস্পন্দ। কিন্তু তাঁর চোখদুটিতে পৃথিবীর সবটুকু বিতৃষ্ণা, উদাসীনতা, বিদ্বেষ এবং নিষ্ঠুরতা একাকার হয়ে ছিল। তবে কি সেদিন রাতে আমাদের বাড়িতে নতুন যে আগন্তুক এসেছে সে নেহাতই অবাঞ্ছিত? তাকে অভ্যর্থনা করে নেবার মতো সামান্য ইচ্ছাটুকু তো মায়ের চোখে দেখা যায়নি। নিতান্তই এসে গেছে, তাই কী আর করবেন? তাই কি প্রাণের সবটুকু অবহেলা, বিরূপতা আর উপেক্ষা দিয়ে তাকে গ্রহণ করেছেন?

চিরদিনই জানি, পৃথিবীতে নবজাতক যখনই আসে তখনই উৎসব। গয়লা-বৌ, দিদিমা, দাদু এবং প্রতিবেশিনীরা তো সেই উৎসবই বাধিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মা ছিলেন একান্ত বিরূপ।

সেদিন নতুন ভাইটাকে শেষ পর্যন্ত কোলে নিয়েছিলাম কিনা আজ আর মনে নেই।

বড় হয়ে কিন্তু ভাইটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একেক সময় ভেবেছি, বাবা নিরুদ্দেশ হবার পর সংসারের সবাই তাঁকে ভুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, বাবা জীবনের গভীর মর্মমূলে কি নির্ভুলভাবেই বা না তাঁর ছাপ রেখে

গেছেন, তাঁর স্মৃতির জীবন্ত প্রতিনিধিকে আমাদের চোখের ওপর রেখে তবেই না অদৃশ্য হয়েছিলেন!

বাবাকে কেউ ভুলবে, সাধ্য কি!

তেরো

শেষ রাতে সেই যে একদিন দিদিমা ঘুম ভাঙিয়ে আমাদের সংসারে নতুন আগন্তুক ছোট্ট ভাইটাকে দেখিয়েছিলেন, তারপর বিবিবাজারের ওপর দিয়ে কত সূর্যোদয় কত সূর্যাস্তই না ঘটে গেছে। দিনের পিছু পিছু এসেছে মাস, মাসকে অনুসরণ করে বছর। একই পালা বার বার গাওয়ার মত করে বর্ষায়-বসন্তে, হেমন্তে-শীতে অথবা গ্রীষ্মে-শরতে বছরের পর বছর সেই চিরদিনের চেনা ছ'টি ঋতুই আসরে নেমে অভ্রান্ত নিয়মে দেখা দিয়ে গেছে।

দেখতে দেখতে আমি আরো বড় হয়ে উঠেছি। জ্ঞান হবার পর বাবাকে আমার প্রথম দেখা আট বছর বয়েসে, তখন আমি ক্লাস টু'-তে পড়ি। তারপর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে কখন যে মাঝখানের ছ'টা বছর কেটে গেছে, মনেই পড়ে না। একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করে বসলাম, আমি ক্লাস এইটে উঠে বসে আছি।

একদা দুপুরে যাত্রা দেখাতে নিয়ে যাবেন এই আশা দিয়ে এবং মাকে সাজতে বলে বাবা সেই যে নিরুদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছিলেন, সেদিন আর ফেরেন নি। সে-দিন কেন, তারপর কত দিনই তো চলে গেছে, ফেরার কথা তাঁর বোধ হয় মনেও হয়নি। আমরা ভেবেছিলাম, সে-ই তাঁর শেষ যাওয়া। কিন্তু হঠাৎ দু-বছর পর আবার একদিন তিনি ফিরে এসেছিলেন।

ক্লাস টু থেকে ক্লাস এইট। এই ছ'বছরে বাবা তিন বার এসেছেন, তিন বার নিরুদ্দেশ হয়েছেন। একেক বার এসেছেন, আমার মনে হয়েছে—আরো যেন কালো হয়ে গেছেন তিনি। ভারতবর্ষের সূর্য তাঁর গায়ের রঙ জ্বালিয়ে দিয়েছিল, ভারতবর্ষের শীত তাঁর হাত-পা-মুখের চামড়া ফাটিয়ে দিয়েছিল। যখন ফিরতেন মনে হ'ত কামরূপ থেকে প্রভাস, তরাই থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সারা দেশের সমস্ত পথের ধুলো গায়ে মেখে এসেছেন। তাঁর বিশাল উজ্জ্বল চোখে থাকত রূপময় ভারতের ধ্যান। তাঁর রুক্ষ কর্কশ দেহের চামড়ায়, তাঁর কপালের গভীর রেখায়, তাঁর সর্বাঙ্গের প্রতিটি কুঞ্চনে প্রতি বার এই দেশ পরম যত্নে নতুন নতুন শিলালিপি এঁকে দিত।

বাবা এলে প্রতি বারই এক প্রতিক্রিয়া ঘটে যেত আমাদের সংসারটার ওপর দিয়ে। দাদু উচ্ছ্বসিত হয়ে নতুন গুড়, কড়াইশুটি অথবা চিতল মাছের পেটির সন্ধানে ছুটতেন, দিদিমা কোমর বেঁধে রাঁধতে বসতেন। মা প্রথমটা ধরা দিতেন না। কঠিন, নিস্পৃহ অভিমানের মলাটে নিজেকে মুড়ে রেখে দূরে সরিয়ে রাখতেন। তা-ও মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা, বড় জোর একটা দিন। তারপর সন্ধি হয়ে যেত। আমার বোকা মা নিজে এসেই ধরা দিতেন। তাঁর যোগিনী রূপের তলা থেকে ঝিলিক দিয়ে বেরিয়ে আসত এমন এক সোহাগিনী যে সাজে-সজ্জায়-প্রসাধনে-অলঙ্কারে লীলায়িত ভ্রূভঙ্গে মধুর হাসিতে স্বামীকে পরিপূর্ণভাবে অধিকার করতে চাইত।

আমার প্রতিক্রিয়াটা হ'ত অন্য রকম। মা আমার চারপাশে সযত্নে সতর্কভাবে যত দেওয়াল তুলতেন, যত দুর্গ সাজাতেন, এক ফুঁয়ে সেগুলোকে উড়িয়ে দিতেন বাবা। আমার বন্দী প্রাণভ্রমরাকে তিনি আদিগন্ত প্রান্তরে অবাধ মুক্তির ভেতর ছেড়ে দিতেন। একটা হাল্কা পাখির মত আমি বিশাল আকাশে ডানা মেলে দিতাম। বাবা যে ক'টা দিন থাকতেন সেই দিন ক'টিই আমার স্বাধীনতা। একবার আসার পর দ্বিতীয় বার আসার মাঝখানের সময়টুকু আমার প্রাণ অস্থির উন্মুখ হয়ে থাকত। কবে বাবা আসবেন, সেই অনিশ্চিত দিনটির জন্য লালায়িত হয়ে থাকতাম।

ছ'বছরে তিন বার এসেছেন বাবা, তিন বারই আমাদের সংসারটার ওপর দিয়ে আনন্দের ঘূর্ণি বয়ে গেছে। কয়েকটা দিন খেলাচ্ছলে আমাদের হাসিয়ে, মাতিয়ে, আমাদের প্রাণকে আলোড়িত করে আবার কোথায় যেন পাড়ি দিয়েছেন।

বাবা চলে যাবার পর আমাদের সংসার ঘিরে সেই পুরনো রুটিন ফিরে এসেছে। বালিশে মুখ রেখে আমি কেঁদেছি। ভাইবোনেরা ততদিনে বড় হয়েছে, বুঝতে শিখেছে—তারাও কেঁদেছে। দাদু-দিদিমা আক্ষেপ করেছেন, মা দুঃখে অভিমানে সাজসজ্জা ছুঁড়ে দিয়ে আবার যোগিনী হয়ে গেছেন। আমাদের ওপর তাঁর নিষ্ঠুরতা আরো বেড়েছে। আর এই তিন বার বাবা চলে যাবার কয়েকমাস পর দিদিমা মধ্যরাতে অথবা ভোরে আমার ঘুম ভাঙিয়ে বারান্দার শেষ প্রান্তে দরমায়-ঘেরা অস্থায়ী একটি ঘরে ডেকে নিয়ে গেছেন, যেখানে গয়লা-বৌ আর প্রতিবেশিনীদের মাতামাতি চোখে পড়েছে। আর ঘরের ভেতর প্রদীপের স্বল্পালোকে আচ্ছন্ন নির্জীব মায়ের পাশে ছোট্ট তুলতুলে একটি করে ভাই অথবা বোন চোখে পড়েছে।

ভাই-বোনেরা পৃথিবীতে এসেছে আর মা আরো কঠিন আর হৃদয়হীন হয়ে গেছেন। নতুন আগন্তুকদের প্রতি তাঁর উপেক্ষা আর অবহেলার বুঝিবা তুলনা

নেই। আমাদের ওপর মায়ের বিরূপতা যত বেড়েছে, দাদু-দিদিমা ততই স্নেহের উৎস খুলে দিয়ে আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছেন।

মনে পড়ছে, ক্লাস এইটে ওঠার পর বাবা সেই যে এসেছিলেন সেটাই তাঁর শেষ আসা, তারপর আর আসেন নি।

সেদিন বাবা এসেছিলেন সকালবেলায়, আমি বারান্দায় বসে পড়ছিলাম, দাদু হুঁকো-কলকে-তামাক ইত্যাদি সরঞ্জাম নিয়ে বসেছিলেন। মা ঘর মুছছিলেন আর দিদিমা কুয়োপারে কি যেন করছিলেন। ভাইবোনগুলো দাদুকে ঘিরে বসে ছিল।

বাবাকে দেখেই দাদু লাফিয়ে উঠেছিলেন। খুশিতে চিৎকার করেছিলেন, 'ওরে—ওরে, মাধব এসেছে।'

তারপর চিরদিনের সেই পুরনো পালাটা নতুন করে ঝালিয়ে নেওয়া হচ্ছিল। দিন দুয়েক পর মা যখন সাজসজ্জায় মন দিয়েছেন, দাদু মাছ-মিষ্টির খোঁজে ছোটাছুটি করছেন, আমি আর ভাইবোনেরা সম্মোহিতের মত বাবাকে সর্বক্ষণ ঘিরে আছি সেই সময় আচমকা সেই ভয়াবহ রুদ্ধশ্বাস ঘটনাটা ঘটে গিয়েছিল।

মনে আছে, তখন আমি বড় হয়েছি। রাত্তিরে বাবা-মায়ের কাছে আর শুতাম না। আমার শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল দাদুর ঘরের এককোণে, আলাদা তক্তাপোষে।

সেদিন রাত্তিরে বাবার কাছে অনেকক্ষণ গল্প শুনে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়েছিলাম। শোওয়ামাত্র ঘুম এসে গিয়েছিল। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম মনে নেই। হঠাৎ মায়ের চিৎকারে ধড়মড় করে জেগে উঠেছিলাম। আর উঠেই চোখে পড়েছিল, দাদু-দিদিমা তার আগেই জেগে আলো জ্বালিয়েছেন। বাইরে বেরুবেন কিনা ঠিক করতে পারছিলেন না, তাঁদের চোখেমুখে দ্বিধা। হয়ত মেয়ে-জামাইয়ের দাম্পত্য কলহের ভেতর যেতে ইতস্তত করছিলেন।

মায়ের গলাটাই শুধু শোনা যাচ্ছিল, অবশ্য কী বলছিলেন বোঝা যাচ্ছিল না। বাবা কিন্তু নীরব, কিংবা কিছু বললেও এত নীচু স্বরে বলছিলেন শোনা যায় নি।

উদ্বিগ্ন মুখে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী হয়েছে দাদু?'

দাদুকে খুব চিন্তান্বিত দেখিয়েছিল। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলেছিলেন, 'কি জানি, বুঝতে পারছি না।'

মায়ের চিৎকার ক্রমশ বাড়ছিল। আমি বলেছিলাম, 'চল দাদু, কী হয়েছে দেখি—'

'যাওয়াটা কি ঠিক হবে?'

'কেন?'

দাদু উত্তর দেন নি।

দিদিমা বলেছিলেন, 'এত রাত্তিরে বড় খুকি কেন যে ক্ষেপে উঠল! চল, বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে শান্ত করে আসি।'

দাদুর দ্বিধাটা কিন্তু কিছুতেই কাটছিল না। তিনি বলেছিলেন, 'কী নিয়ে কী হচ্ছে, কিছুই জানি না। মাঝখান থেকে ওদের দু'জনের ভেতর মাথা বাড়িয়ে লজ্জায় পড়ি আর কি। বরং আরেকটু দেখি, তারপর না হয় বেরুনো যাবে।'

'সে-ই ভাল।'

কিন্তু শান্ত হবার আদৌ কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। মায়ের উত্তেজনা আরো প্রবল হয়ে উঠছিল, চিৎকার আরো নিদারুণ। সাঙ্ঘাতিক কিছু যে একটা ঘটেছে তাতে সংশয় ছিল না।

একসময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও দাদু দরজা খুলেছিলেন। আমরা নিঃশব্দে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম। বাইরে তো এসেছি, এবার বাবা-মাকে ডাকব কিনা সেটাই স্থির করে উঠতে পারছিলাম না।

ঘরের ভেতরে থাকতে মা-বাবার কথা বুঝতে পারছিলাম না, বাইরে আসতে সেগুলো পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল।

মা বলছিলেন, 'শেষ পর্যন্ত মনে এই ছিল?'

বাবা গোঙানির মত আওয়াজ করে কি উত্তর দিয়েছিলেন, বুঝতে পারিনি।

'কেন, কেন এভাবে তুমি আমার সর্বনাশ করলে? কেন? তার জবাবদিহি তোমাকে করতে হবে।'

বাবা কিন্তু এবার নিশ্চুপ।

মা সমানে বলে যাচ্ছিলেন, 'আর আমার সর্বনাশ করার ইচ্ছাই যদি তোমার মনে ছিল তবে আবার এলে কেন? আমার কাছে আসার মত এত বড় সাহস তোমার কোত্থেকে হল?'

এবার বাবা বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন, 'শান্ত হও, শান্ত হও।'

'শান্ত হব!' মায়ের গলার স্বর আর এক পর্দা চড়েছিল, 'আমার সর্বস্ব যাবে আর মাথা ঠিক রেখে আমি মুখ বুজে থাকব। তুমি যা খুশি করবে আমাকে তা-ই মেনে নিতে হবে? কেন?'

বাবা চাপা গলায় বিড় বিড় করে কি উত্তর দিয়েছিলেন, শুনতে পাইনি।

মা সমানে বলে যাচ্ছিলেন, 'সারাটা জীবন তুমি আমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছ। বিয়ে হয়ে যাবার পর বাপের বাড়িতে মেয়েদের পড়ে থাকা কতখানি গ্লানির, কি যে অসম্মানের সেটুকু বুঝবার মত মন তোমার নেই। বিয়ে করেছ, ছেলেমেয়ে হয়েছে।

অথচ তাদের দায়িত্ব তুমি চিরকাল এড়িয়ে গেছ। তুমি অমানুষ, স্বার্থপর, দায়িত্বজ্ঞানহীন। নেহাত আমার মা-বাবার মত শ্বশুর শাশুড়ি পেয়েছিলে, তাই তরে গেলে। অন্য কোথাও বিয়ে করলে নাকের জলে চোখের জলে দুর্গতির একশেষ হ'ত তোমার।'

বাবা এবারও নীরব।

মা থামেন নি, 'তবু সে সব আমি মেনে নিয়েছি। দূরে দূরে ঘুরে বেড়াতে, তবু ভরসা ছিল একদিন না একদিন তুমি আমার কাছে এসে থাকবে। না থাকলেও ভাবতাম, যেখানেই থাকো তুমি আমারই আছ। কিন্তু তোমাকে ঘিরে আমার সব কিছু ছাই হয়ে গেছে।'

বাবা বলেছিলেন, 'তোমাকে সবই বলেছি, আমার কথাটা বুঝতে চেষ্টা কর। কি অবস্থায় পড়ে আমাকে ও কাজ করতে হয়েছে, সেটা একবার ভাবো—'

মা গলা ফাটিয়ে উন্মাদিনীর মত চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, 'ভাবার কিছু নেই। কেন ভাববো? সারা জীবন তোমার কাছে কী পেয়েছি যে তোমার দোষ আমায় ঢেকে রাখতে হবে? তোমার কথা আমায় বিবেচনা করতে হবে? কোন অধিকারে তুমি আমাকে এসব কথা বলতে সাহস পাও?'

'স্বামী-স্ত্রীর অধিকারে।'

'সে সম্পর্ক তোমার সঙ্গে ঘুচে গেছে।'

'পাগলের মত কী বলছ?'

'ঠিকই বলছি।' হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মত মা বলে যাচ্ছিলেন, 'আজ থেকে ভাবব আমি বিধবা, ছেলেমেয়েদের বলব, তোদের বাপ মরে গেছে। যে লোককে কোনদিন শ্রদ্ধা করতে পারব না, ভালবাসতে পারব না, ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারব না তার সঙ্গে নিজেকে আর ছেলেমেয়েদের পরিচয় জড়িয়ে রেখে কী লাভ? বরং তা চূড়ান্ত অসম্মানের ব্যাপার। তাই বলছি তুমি যাও, চিরজীবনের মত তোমাকে মুক্তি দিলাম।'

বাবা চুপ।

মা আবার বলেছিলেন, 'এখন মাঝরাত, কেউ জেগে নেই। অন্ধকারে নিশ্চিন্তে চলে যেতে পারবে, কেউ টেরও পাবে না। অবিশ্যি দিনের বেলা সবার সামনে তোমার মুখে চুনকালি মাখিয়ে পাড়া ঘুরিয়ে দেখানো দরকার। নেহাত একদিন তুমি আমার স্বামী ছিলে, তাই অন্ধকারে চলে যাবার মত করুণাটুকু করলাম। যাও, আর কোনদিন আমার কাছে আসবে না।'

একটু পর দরজা খুলে গিয়েছিল। বাবা বেরিয়ে এসেছিলেন, মা কিন্তু বেরোন নি। অন্ধকারে সবার অগোচরে, নিঃশব্দে এবং চরম উপেক্ষার মধ্যে বাবা বিদায় নিন—এটাই বোধ হয় তাঁর কাম্য।

বেরিয়ে এসেই আমাদের দেখে বাবা থমকে গিয়েছিলেন। এক মুহূর্ত আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন হয়ত। তারপরেই ঘাড়টা ভেঙে ঝুলে পড়েছিল, চোয়াল যেন বেঁকে গিয়েছিল, রগের কাছে অনেকগুলো সাদা চুল অল্প অল্প নড়ছিল। হঠাৎ মনে হয়েছিল, বাবা যেন অনেক বুড়ো হয়ে গেছেন। তাঁর করুণ দীন চেহারাখানা দেখতে দেখতে আমার ভয়ানক কান্না পাচ্ছিল।

ক্লাস এইটে পড়ি, তখন বুঝবার মত বয়েস হয়েছে। একদৃষ্টে বাবার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তখনো পর্যন্ত আমার জীবনের সব চাইতে বেগবর্ণময় চমকপ্রদ মানুষটি নীরবে মুখ লুকিয়ে চলে যাবার জন্য ঘরের বাইরে এসেছেন, এর ভেতরে কতখানি গ্লানি, কতখানি দুর্বহ যন্ত্রণা আর অসহ্য অসম্মান তা কিছু কিছু বুঝতে পারছিলাম। বাবার জন্য বুকের ভেতর একটা দুরন্ত কষ্টকর আবেগ ফুলে ফেঁপে ফেনায়িত হয়ে আমার শ্বাস যেন রুদ্ধ করে আনছিল।

প্রথমে কথা বলেছিলেন দাদু। মাকে ডেকেছিলেন, 'বড় খুকি—'

আমরা যে বাইরে দাঁড়িয়ে আছি বোধ হয় আশা করেন নি মা। চমকে সাড়া দিয়েছিলেন, 'কী বলছ?'

'তোদের কথা সব শুনেছি। কী এমন অন্যায় করেছে যে এত রাত্তিরে মাধবকে তাড়িয়ে দিচ্ছিস? মনে রাখিস এ বাড়ি আমার।' কঠিন স্বরে দাদু বলেছিলেন, তাঁর চোখেমুখে অদ্ভুত দৃঢ়তা ফুটে উঠেছিল। চিরদিন মেয়ের খেয়ালের কাছে তাঁকে মাথা নীচু করে থাকতে হয়েছে কিন্তু সেদিনের সেই চরম মুহূর্তে তিনি অনেকখানি নির্ভয় হয়েই মায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন।

ঘরের ভেতর থেকেই মা বলেছিলেন, 'এটা তোমার বাড়ি আমি জানি। সেই জন্যেই তো ছেলেপুলে নিয়ে দাসীবাঁদীর মত থাকি, নিজের বাড়ি হলে নিজের কাছে নিজের এই লাঞ্ছনা সহ্য করতাম নাকি!'

দাদু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, 'ঐ দেখ, কী কথার কী মানে করে বসল!'

মা হয়ত তা শুনতে পাননি। কিংবা শুনলেও গ্রাহ্য করেন নি। আপন মনেই বলে যাচ্ছিলেন, 'আর অন্যায়ের কথা বললে না? সেটা ওকেই জিজ্ঞেস কর।'

দাদু বলেছিলেন, 'যা জিজ্ঞেস করবার কাল সকালে করব। আর করবই বা কেন, স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার, নিজেরাই তোরা তা মিটিয়ে নিবি।' বলতে বলতে বাবার

দিকে ফিরে বলেছিলেন, 'যাও মাধব, ঘরে যাও।'

নিষ্ঠুর গলায় মা বলেছিলেন, 'না।'

'কী না?' দাদু হতবাক।

'ও আর এক মুহূর্ত এ বাড়িতে থাকবে না।'

'হ্যাঁ, থাকবে।'

'যদি থাকে, আমি আত্মহত্যা করব।'

এতক্ষণে মুখ তুলেছিলেন বাবা। বিব্রত, ভয়ার্ত, লাঞ্ছিত অপমানিত মানুষটি ক্লান্ত করুণ সুরে বলেছিলেন, 'না—না, আমি যাচ্ছি।' বলে আর অপেক্ষা করেন নি। নির্জীব পা টেনে টেনে সদর দরজা খুলে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির বাইরের সুদূর-ব্যাপ্ত বিশাল পৃথিবীর সঙ্গে আমার সংযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

সেই আমার বাবাকে শেষ দেখা, আমাদের জীবনে তাঁর ভূমিকা ফুরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সত্যিই কি গিয়েছিল?

কোন অপরাধের জন্য বাবাকে লাঞ্ছিত হয়ে সেদিন চলে যেতে হয়েছিল তখন বুঝতে পারিনি। বুঝেছিলাম, স্কুলের সীমানা ছাড়িয়ে কলেজে এসে। কিন্তু সে কথা পরে।

দ্বিতীয় তরঙ্গ

জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়টার শুরু কোথা থেকে ? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে চোখ কান বুজে নিজের একটা গোপন অহঙ্কারের কথা ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে বলতে হয়।

লেখাপড়ায় আমি অসাধারণ, ক্লাসের ফার্স্ট বয়। স্কুলে ভর্তি হবার পর থেকেই প্রথম স্থানটা চিরকালের মত আমার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

আয়ুটাকে সময়ের হিসেবে মোটামুটি ভাগাভাগি করে মনে হয়েছে, ক্লাস টেনের টেস্টের পর থেকেই আমার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা। মনে আছে ক্লাস টু থেকে টেন—এই ন'বছর ন'টি এ্যানুয়েল আর ন'টি হাফ ইয়ারলি, মোট আঠারোটি পরীক্ষায় আমি একবারও সেকেণ্ড হই নি।

পরীক্ষায় শুধু নয়, আচারে-ব্যবহারেও বিবিবাজারের ছেলেদের মধ্যে আমি তখন ফার্স্ট বয়। বয়স্কদের সামনে কোনদিন মুখ তুলে কথা বলতাম না। সবাই বলাবলি করত, আমার স্বভাবটি নাকি অত্যন্ত নম্র আর শান্ত। গুড কণ্ডাক্টের প্রাইজ শুধু স্কুল থেকেই পাইনি, বিবিবাজারের বাসিন্দারা আমার স্বভাবের জন্য প্রশংসার মুকুট মাথায় তুলে দিয়েছিল।

খেলাধুলো বা আড্ডা, কোন কিছুতেই আমার আগ্রহ ছিল না। স্কুলের সময়টুকু আর হীরুদের বাড়ি একবার করে যাওয়া—এ ছাড়া সারাদিন বাড়ি থেকে বেরুতামই না। তবু আমার খ্যাতি কেমন করে যেন বিবিবাজারের দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছিল।

মনে পড়ে প্রায় ছেলেবেলা থেকে ভালত্বের জন্য প্রশংসা শুনে আসছিলাম। শুনতে শুনতে এই প্রশংসাটার ওপর স্বাভাবিক একটা দাবি জন্মে গিয়েছিল যেন এবং এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতনও ছিলাম। আমি যে অসাধারণ এবং আর দশটা ছেলের চাইতে আলাদা—এই কথাটা বিবিবাজারের প্রতিটি মানুষ চোখের দৃষ্টি দিয়ে বুঝিয়ে দিত।

স্কুলে ভর্তি হবার দিনটি থেকেই আমার স্তুতির সূত্রপাত। তারপর একেকটি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছি, সেই সঙ্গে আমার খ্যাতির দিগন্তও প্রসারিত হয়েছে। ভাল ছেলে কী, তা বোঝাবার জন্য সবাই আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিত। ভাল ছেলের সত্যিকারের সংজ্ঞাই যেন ছিলাম আমি। বিবিবাজারের ঘরে ঘরে আমার নাম সে সময় প্রবাদের মত উচ্চারিত হ'ত।

মনে আছে, জীবনের এই আলোকিত উজ্জ্বল পথ ধরেই ঝুলন আমার কাছে আরো নিবিড় হয়ে এসেছিল। ঝুলন—কুমারী নলিনী চট্টোপাধ্যায়। মোমের পুতুলের মত হীরুর সেই বোনটা।

ওদের বাড়ি প্রথম আমি যাই হীরুর বন্ধু হিসেবে। প্রায় একটা বছর ঝুলনের সঙ্গে আমার বিশেষ সম্পর্ক ছিল না, সন্ধিগ্ধ গোয়েন্দার চোখে সে আমার গতিবিধি

কথাবার্তা লক্ষ্য করত। তারপর হঠাৎ একদিন আমার বন্ধুত্বের স্বত্ব নিয়ে দুই ভাই বোনের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে গিয়েছিল। সে যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল ঝুলনই। ধীরে ধীরে কবে যে হীরুর কাছ থেকে ঝুলনের দিকে সরে এসেছিলাম মনে নেই। আমার এই এক দিক থেকে আরেক দিকে যাওয়া ঘটেছিল নিজের অলক্ষ্যে, নিঃশব্দে, অজ্ঞাতসারে।

যে ঘটনাটি প্রথম আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল কৈশোরের সীমান্ত পেরিয়ে যৌবনে পৌঁছে গেছি, রোমাঞ্চিত বিস্ময়ে আজও তা মনে করতে পারি। ঘটনাটা যেন হাত ধরে কৈশোরের রূপকথা থেকে যৌবনের রূপকথায়, জীবনের প্রথম পর্ব থেকে দ্বিতীয় পর্বের অপার রহস্যময়তায় আমাকে নিয়ে এসেছিল।

আমার স্মৃতির ভেতর সেই দিনটা নিভুর্লভাবে রয়েছে। একটুও না ভেবে তার খুঁটিনাটি বিবরণ আমি দিয়ে যেতে পারি। পরে আমার বাকি জীবনের গ্লানির অন্ধকারে ঐ দিনটা ছিল সোনালী রেখার মত।

প্রথম প্রথম হীরুদের বাড়ি যেতাম দুটি সুস্পষ্ট কারণে। একটা কারণ হীরুর বন্ধুত্ব, দ্বিতীয় কারণ হীরুর বাবা-মায়ের আচ্ছন্ন-করা ভালবাসার খেলা। তৃতীয় আরেকটি কারণ ছিল অলক্ষ্যে। আমার অনুভূতির অনেক স্তর নিচে। নিঃশব্দে, এতটুকু হৈ-চৈ না করে, বিন্দুমাত্র জানান না দিয়ে সেটা কবে যে অঙ্কুরিত হয়েছিল— নিজেই তার খবর রাখতাম না। সেই সোনার দিনটা এক টানে সব আবরণ সরিয়ে দিয়ে প্রাণের ভেতরকার অবচেতন সাধটাকে বাইরের আলোয় মেলে ধরেছিল।

মনে পড়ে, সেবার স্কুল জীবন আমার শেষ হতে চলেছে। টেস্টে যথারীতি ফার্স্ট হয়েছিলাম। রেজাল্ট যেদিন বেরোয় সেদিন স্কুল থেকে প্রথমে বাড়ি ফিরে মাকে, দাদুকে আর দিদিমাকে প্রণাম করেছিলাম। তারপর ছুটতে ছুটতে গিয়েছিলাম হীরুদের বাড়ি। সেবার হীরুরও ম্যাট্রিকুলেশনের বছর, টেস্টের দরজা সে-ও পার হয়েছিল।

হীরুদের বাড়ির লোহার প্রকাণ্ড ফটকটা পার হলেই যে ঝাউবন—সে কথা আগেই বলেছি। সেখানে আসতেই হাল্কা গলায় কে যেন ডেকে উঠেছিল।

চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই আমার সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গিয়েছিল। ঝাউবনের ছায়ায়, নিরালা এক কোণে, লাল সিমেন্টের বেদীতে ঝুলন বসে আছে।

ঝুলন ডেকেছিল, 'এদিকে এসো বকুদা।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। এগিয়েও যাইনি, পিছিয়েও আসিনি। শুধু জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'হীরু কোথায়?'

'স্কুল থেকে বাড়িতেই তো এসেছিল। একটু আগে দোতলার বারান্দায় ঘুর-

স্থুর করতে দেখেছি। এখন কোথায় আছে বলতে পারব না।'

'আচ্ছা যাই, দেখি হীরু কোথায়।'

'বাবা রে বাবা, খালি বন্ধু, বন্ধু আর বন্ধু। আমরা যেন নদীর জলে ভেসে এসেছি।'

কথাটা ঠিক বলেনি ঝুলন। এ বাড়িতে এসে হীরুকে ইদানীং আর বিশেষ পাওয়া যেত না। কেননা বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তার আর আমার মধ্যে তফাতটা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছিল। হীরু উদ্দাম, বেপরোয়া, প্রাণবন্ত। এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের দুরন্ত দূত সে। আমি যেখানে ঘরের কোণে জীবনের কোমল আবেগে, মৃদু কম্পনে দোল খেতে ভালবাসি সেখানে হীরু দুর্দম বেগে জলোচ্ছ্বাসের মত, ঢলের মত অথবা অন্য কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মত দিগ্বিদিকে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে আনন্দ পায়।

বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তার বন্ধুত্বের পরিধি বেড়েছে। ফুটবল-ক্রিকেট-রোয়িং-পিকনিক, কত দিকে কত মাতামাতির মুখে যে নিজেকে হীরু ছড়িয়ে দিয়েছে তার হিসেব নেই। আমি কিন্তু প্রায় তেমনই আছি। তেমনই গৃহলোলুপ, নিশ্চল, নিস্তরঙ্গ, ভীরু, কুণ্ঠিত। দুর্দম স্রোতের খেয়ালে নিজেকে ভাসিয়ে দেবার মত অপরিমিত প্রাণশক্তি আমার নেই। হীরু আর আমি স্বভাবের দিক থেকে দুই মেরুর বাসিন্দা, তাই বলে আমাদের বন্ধুত্বের রং বিন্দুমাত্র ফিকে হয়নি। বরং আগের মতই গাঢ় রয়েছে।

হীরু রোজই তার অভ্যাস বদলে যাচ্ছিল। একদিন যদি সে ক্রিকেট খেলে, পরের দিন সে ছুটবে সাঁতার দিয়ে নদী পেরুতে। আমি কিন্তু পুরনো অভ্যাসেরই ক্রীতদাস হয়ে আছি। স্কুলে যাওয়া, বাড়িতে থাকা আর হীরুদের বাড়ি হাজিরা দেওয়া (হীরু না থাকলে তার মা-বাবা কিংবা ঝুলনের সঙ্গে গল্প করতাম)—জীবন এই অভ্যাসের কক্ষপথে নিয়ত বয়ে যাচ্ছিল।

বিব্রত মুখে বলেছিলাম, 'না, মানে—'

ঝুলন হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল, 'বন্ধুর কাছে একটু পরে গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। এখন এদিকে এসো দেখি।'

প্রথম যেদিন হীরুদের বাড়ি আসি সেদিন থেকেই ঝুলন সম্পর্কে মনে মনে খানিকটা ভীতি পোষণ করে আসছি। সেটা নিতান্ত অকারণে নয়। প্রথম দিনেই ঝুলনের যে পরিচয় পাওয়া গেছে, আমার পক্ষে তা খুব একটা স্বস্তির হয়নি।

পরে অবশ্য আমার ওপরে দখলের স্বত্ব হীরুর হাত থেকে অনেকখানিই ছিনিয়ে নিয়েছিল ঝুলন। তবু তাকে আমি ভয় করতাম। অনেক মিশেছি তার সঙ্গে। চোখের সামনে মোমের পুতুলের মত মেয়েটা আস্তে আস্তে বেড়ে উঠেছে। কিন্তু

যত সে বড় হয়েছে রসনা তত শাণিত হয়েছে, কৌতুক আর পরিহাসবোধ ততই তীক্ষ্ণ হয়েছে। আমি ও বাড়িতে পা দিলেই ঝুলন পিছনে লাগত।

ছেলেবেলা থেকেই আমি লাজুক, মুখচোরা। কথা বলতাম খুব কম। যদিও মনে মনে তার সঙ্গ কামনা করতাম কিন্তু রসনার জন্য সভয় একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলতাম। তাকে দেখলেই মুখ আরক্ত হয়ে উঠত। হাত-পা গুটিয়ে যেত, অপরিসীম অস্বস্তিতে স্নায়ুগুলো আসত আড়ষ্ট হয়ে।

কিন্তু এড়াতে চাইলে কি হবে, মোমের পুতুলটার হাত থেকে নিস্তার নেই। দাদার মুখচোরা লাজুক বন্ধুটিকে নিয়ে প্রথম দিন থেকেই তার বিচিত্র কৌতুকের খেলা শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমাকে নাস্তানাবুদ করেই ঝুলনের যত সুখ, যত আনন্দ।

ঝুলন তখন তের বছরের কিশোরী, বয়ঃসন্ধির মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার দেহ. যৌবনের দুরন্ত ঢলের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। গার্লস স্কুলে ক্লাস সেভেনে উঠতেই ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছিল।

মনে আছে, বার বার ডাকা সত্ত্বেও ঝাউবনের ভেতর লাল সিমেন্টের বেদীটার দিকে যাব কিনা কিছুতেই স্থির করে উঠতে পারছিলাম না।

এবার ধমকে উঠেছিল ঝুলন, 'আমার কাছে আসতে ভয় করছে নাকি! আমি বাঘ না ভালুক! এসো বলছি।'

অগত্যা কি আর করা। প্রায় মন্ত্রচালিতের মত পায়ে পায়ে ঝাউবনের ছায়ায় ঝুলনের পাশে গিয়ে বসেছিলাম।

একটুক্ষণ চুপচাপ। তারপর ঝুলনই নীরবতা ভেঙে বলেছিল, 'আজ তো তোমাদের রেজাল্ট বেরুল, তাই না বকুদা?'

'হ্যাঁ।' ঝুলনের মুখের দিকে তাকিয়ে কোনদিন কথা বলতে পারিনি। সেদিনও পারলাম না। নত চোখে খুব আস্তে আস্তে ফিসফিসিয়ে বলেছিলাম, 'আমি ফার্স্ট হয়েছি।'

'জানি বাবা, জানি। দাদা বাড়ি ফিরে নিজের খবর দিক আর না দিক, বন্ধুর খবরটি ঠিক দিয়েছে।' ঝুলন বলে যাচ্ছিল, 'তুমি যে ফার্স্ট হবে, এ আর নতুন কথা কি। দাদা কী বলে জানো?'

'কী?'

'ভগবানের কাছ থেকে ফার্স্ট প্লেসের মৌরুসী পাট্টা নিয়ে চিরন্তনটা পৃথিবীতে এসেছে। ওখান থেকে ওকে হটানো কারো সাধ্য নয়।' বলেই হেসে উঠেছিল ঝুলন।

আমিও হেসে ফেলেছিলাম। ঝুলনের সামনে জীবনে সেই আমার প্রথম সহজ হওয়া।

হাসি থামিয়ে একটু চুপ করে থেকে কি ভেবে ঝুলন আবার বলেছিল, 'জানো বকুদা, তোমার জন্যে আমাদের বিবিবাজার ছাড়তে হবে।'

'আমার জন্যে!' আমি চকিত হয়ে উঠেছিলাম।

'নয়তো কার?'

'কেন, কী করেছি আমি?'

'কী করো নি, বল!' নিরীহ স্বরে ঝুলন বলে যাচ্ছিল, 'বছর বছর ফার্স্ট হচ্ছ। তার ওপর আড্ডা নেই, ফাজলামি নেই, বাঁদরামি নেই, বাজে দিকে মন নেই। তুমি ভাল-ছেলে আছ, আরো ভাল হও, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার ভাল হওয়ার জ্বালায় আমাদের মতন খারাপ ছেলেমেয়েদের যে প্রাণ যেতে বসেছে বকুদা!'

চোখ নামিয়ে বিব্রত স্বরে বলেছিলাম, 'কি রকম?'

'রকম জানতে চাইছ! বেশ, তা হলে শোন। স্কুলে যাই, দিদিমণিরা তোমার নাম করে বলে, চিরন্তনের মত হতে চেষ্টা কর। ক্লাসের বন্ধুদের বাড়ি যাই, তাদের মা-বাবার মুখেও ঐ এক কথা। বিবিবাজারের কোথাও যাবার উপায় নেই। যেখানেই যাই শুধু চিরন্তন, চিরন্তন আর চিরন্তন। তোমারই খালি জয়জয়কার। আমরা যেন বানের জলে ভেসে এসেছি। আমাদের জন্যে খালি উপদেশ আর ছি-ছি।' বলেই মুখখানা করুণ করে ফেলেছিল ঝুলন এবং সেটা যে নিতান্তই কপটতা, বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি।

খুব হাসি পেয়ে গিয়েছিল আমার। হয়ত হাসিটা চলকে উঠে আমার মুখে ছড়িয়েও পড়েছিল। ঝুলনের চোখ থেকে তা লুকোবার জন্য মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিয়েছিলাম।

মুখ ফেরালে কি হবে, ঝুলনের হাতে ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। ঝুলন বলেছিল, 'ভাল ছেলে বলে খুব গর্ব, তাই না! আবার হাসি হচ্ছে?'

আমি কিন্তু হাসি থামাই নি, সমানে হেসেই যাচ্ছিলাম।

এরপর খানিকক্ষণ চুপচাপ।

হঠাৎ একসময় ঝুলন ডেকে উঠেছিল, 'বকুদা—'

ডাকটা যেমন আকস্মিক গলার স্বরটা তেমনই অভাবিত। বিচিত্র এক দোলা ছিল সেই স্বরে, তার সঙ্গে অনেকখানি গভীরতা। মুখ ফেরাতে গিয়ে ঝুলনের চোখে চোখ পড়ে গিয়েছিল আমার।

ঝুলনের চোখ ছুটি যেন অতল কৃষ্ণ সরোবর। কি যেন ছিল সেখানে? সে কি নিবিড়তা? সে কি সম্মোহন? সে কি অথৈ অপার কোন রহস্যময়তা? আমি কিন্তু দৃষ্টি ফেরাতে পারিনি। শুধু অনুভব করেছিলাম, আমার সম্মোহিত চেতনার ভেতর থেকে বুদ্বুদের মত ছুটি শব্দ ভেসে উঠেছিল, 'কী বলছ?'

'তোমাকে সবাই ভাল বলে, আমার কি যে ভাল লাগে!' ঝুলন ফিসফিসিয়ে বলেছিল। মনে হচ্ছিল, সে যেন পাশে বসে কথা বলছে না। অনেক—অনেক দূর থেকে তার কণ্ঠস্বর হাওয়ার স্রোতকে আশ্রয় করে ভেসে আসছে।

আমি উত্তর দিইনি।

ঝুলন আবার বলে উঠেছিল, 'জানো বকুদা—'

'বল—'

'আমার মা-বাবাও তোমার কথা খুব বলে। বলে চিরন্তনের মতন ছেলে হয় না।'

আমি এবারও নিরুত্তর। প্রশংসায় ভয়ানক লজ্জা লাগছিল আমার। ঘাড়টা প্রায় ভেঙে ঝুলে পড়েছিল, মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়ে নখ খুঁটতে শুরু করেছিলাম।

একটু ইতস্তত করে ঝুলন আবার বলেছিল, 'মা-বাবা আরো একটা কথা বলে।'

'কী?'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়নি ঝুলন। এমন যে সঙ্কোচহীনা সাবলীলা মেয়েটি, কৌতুকের রসে সর্বক্ষণ ডগমগ—তার মাথাটা কিনা ঝুঁকে পড়েছিল। ফর্সা মুখখানায় রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গিয়েছিল। ছোট্ট মসৃণ কপালে মুক্তোর মত কণা কণা ঘাম জমেছিল।

আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। চোখেমুখে অপার বিস্ময় ফুটিয়ে থতিয়ে থতিয়ে বলেছিলাম, 'কী বলে তোমার মা-বাবা?'

দু-হাতে এবার মুখ ঢেকে ফেলেছিল ঝুলন।

আমার বিস্ময় প্রায় শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছে। তার দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে বলেছিলাম, 'মুখ ঢাকলে যে? কী হল তোমার?'

'আমি জানি না, জানি না—' কোঁচকানো কালো চুলের সমুদ্রে ঢেউ তুলে জোরে জোরে প্রবলবেগে মাথা নেড়ে ঝাউবন থেকে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল ঝুলন।

আর ঝুলনের এই পালানোর পেছনে যে দুর্ভেদ্য রহস্য তার কিছুটা বুঝে এবং অনেকখানি না বুঝে বিমূঢ়ের মত আমি চুপচাপ বসে ছিলাম।

মনে আছে পরের দিনও ঝাউবনের সেই জায়গাটিতে ঝুলনের সঙ্গে দেখা হয়ে-

ছিল। আমার জন্তই বুঝি ঐ ছায়াচ্ছন্ন ঝাউবনের নিরালা প্রান্তটিতে অপেক্ষা করছিল সে।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কাল ও-রকম করে পালিয়ে গেলে কেন?'

ঝুলনের ফর্সা মুখ আগের মতই আরক্ত হয়ে উঠেছিল। পাতলা রক্তবর্ণ ঠোঁটের ফাঁকে জীবন-রহস্তের বিচিত্র একটু হাসি ফুটিয়ে সে বলেছিল, 'সে কথা আমি বলতে পারব না।'

'কেন?'

'আহা, আমার লজ্জা করে না যেন?'

এই দু-দিনে আমার আড়ষ্টতা, সঙ্কোচ, কুণ্ঠা—প্রায় সমস্তটুকুই কেটে গিয়েছিল। আর নিজের হৃৎপিণ্ডের অবিরাম উত্থান পতনে একটা অনাবিষ্কৃত সত্যকে হঠাৎই খুঁজে পেয়েছিলেন যেন। হীরু বা তার মা-বাবার জন্তই শুধু না, ঝুলন নামে কৌতুকময়ী সাবলীলা মেয়েটির জন্তও নিজের অজ্ঞাতসারে এ বাড়িতে আমার যাওয়া-আসা। দু-দিনে স্বাচ্ছন্দ্য অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল, সেই সঙ্গে দুঃসাহসও। জেদের স্বরে বলেছিলাম, 'তোমার মা-বাবা কি এমন লজ্জার কথা বলেছে?'

চকিত দৃষ্টিক্ষেপে আমাকে বিদ্ধ করে ঝুলন বলেছিল, 'অতই যখন জানবার ইচ্ছে, মা-বাবাকেই জিজ্ঞেস কর না। তবে একটা কথা জেনে রেখো—'

'কী?'

'বাবা শিগ্‌গীরই একদিন তোমাদের বাড়ি যাবে।'

'কেন?'

'আমি জানি না, জানি না।' বলে ঝুলন সেদিনও পালিয়ে গিয়েছিল।

ঝুলনের বাবা অবশ্য খুব তাড়াতাড়িই যাননি। গিয়েছিলেন অনেক পরে, আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুলে। কিন্তু সে-সব পরের কথা।

তবে সেই দিনটা ঝুলনের পালিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চকিত রেখায় আমার প্রাণে নতুন এক অনুভূতির ছোঁয়া লাগিয়ে দিয়েছিল। আর সেই স্পর্শে তরঙ্গিত আমি, শিহরিত আমি, বিহ্বল আমি—দোল খেতে খেতে এক ছুটে কৈশোর পেরিয়ে যৌবনের মায়াপুরীতে পৌঁছে গিয়েছিলাম।

দুই

জীবনের দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে কত অফুরন্ত ভাবনাই না ভিড় করে আসছে। মনে পড়ে, যেবার টেস্ট দিলাম সেটা উনিশ শ বত্রিশ সাল।

সারা দেশ জুড়ে তখন ঢেউ উঠেছে। নন-কোঅপারেশনের ঢেউ, অসহযোগের বাঁধন-ছেঁড়া বন্যায় চারদিক ভেসে যেতে শুরু করেছে। তার ছোটখাটো দু-চারটে ধাক্কা এসে লেগেছিল বিবিবাজারে। যে সামান্য ক'টি সরকারী অফিস-আদালত এখানে ছিল সে-সব জায়গায় চাকরি ছাড়ার ধুম পড়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া সারা শহরের সর্বত্র পিকেটিং, নির্বিচার ধরপাকড়, বন্দে মাতরম্ আর বিলিতি জামা-কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব—এ সবের মধ্যেই স্বাধীনতার নবীন মন্ত্রকে বরণ করে নিয়েছিল বিবিবাজার। সেবার স্বয়ং গান্ধীজী এসেছিলেন আমাদের শহরে। তাঁকে পেয়ে বিবিবাজারের সে কি উন্মাদনা!

শুধু কি অসহযোগের বেগবর্ণময় প্রবাহই, বিবিবাজারকে ঘিরে আরো কত ছবিই তো মিছিল করে অন্তহীন ধারায় চোখের সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে।

ছেলেবেলায়, চেতনার সেই প্রত্যূষে বিবিবাজারকে সামান্য এক কারখানা-শহর দেখেছিলাম। শহর হিসেবে তখন সে নিতান্তই ব্রাত্য, অন্ত্যজ, অনভিজাত। কিন্তু যৌবনের শুরুতে অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনায় তার চেহারাটা দ্রুত বদলে যেতে শুরু করেছিল। আরো অনেক নতুন নতুন কারখানা বসেছিল চারদিকে, বিবিবাজার তার সীমানাকে দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিল। এতদিন কলকাতার সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ, সমস্ত দিনে দুটো ডাউন আর দুটো আপ লোকাল ট্রেন বিবিবাজারকে ছুঁয়ে যেত মাত্র। কিন্তু উনিশ শ বত্রিশে দু-খানার জায়গায় ছ'খানা আপ আর ছ'খানা ডাউন ট্রেন বিবিবাজারে হানা দিয়ে যাচ্ছিল। দূর থেকে কলকাতা লোকাল ট্রেনের দূত পাঠিয়ে ক্রমাগত বিবিবাজারকে ডাক দিয়ে যেতে শুরু করেছিল।

ছেলেবেলায় বিবিবাজারের রাস্তায় যে মিটমিটে কেরোসিনের আলো-গুলোকে দেখেছিলাম, কবেই তারা বিদায় নিয়েছে। তাদের জায়গায় বিজলী আলোর দাক্ষিণ্য এসে গিয়েছিল। আর বেড়েছিল মানুষ, কলকারখানায় কাজের জন্য বাঙালী তো ছিলই, পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা—সারা ভারতবর্ষ দিগ্‌দিগন্ত থেকে তার প্রতিনিধিদের পাঠিয়ে যাচ্ছিল। কুলি লাইন আরো বেড়ে গিয়েছিল, বস্তিগুলো সংখ্যায় তিনগুণ হয়ে উঠেছিল। একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ মিউনিসি-প্যালিটি শহরের স্বাস্থ্য এবং শ্রী রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিল। ফলে নতুন নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছিল, বাড়ি উঠেছিল অগুনতি। আগে আগে খানকয়েক মোটর আর ফীটন দেখেছি এ শহরে, সে জায়গায় মোটরের ঢল নেমেছিল। রাস্তায় রাস্তায় নতুন অচেনা লোকের মেলা বসে গিয়েছিল যেন। ফলে বিবিবাজারের জীবন

দুর্দম দুরন্ত বেগে ছুটতে শুরু করেছিল। তার ধমনীর স্পন্দন, হৃৎপিণ্ডের কলধ্বনি আরো প্রমত্ত হয়ে উঠেছিল।

চারদিক ঘিরে এত যে পরিবর্তন, আমি কিন্তু তেমনটিই ছিলাম। তেমনই ভীরু, কুণ্ঠিত, গৃহকোণলোভী, কিছুটা বা আত্মসমাহিত। অসহযোগ আন্দোলন, গান্ধীজীকে কেন্দ্র করে উন্মাদনা অথবা বিবিবাজারের দ্রুত উত্তেজনাময় পরিবর্তন, কোন কিছুই আমাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। আমার চারদিকে যে আত্ম-কেন্দ্রিকতা দেওয়াল তুলে আছে সেখানে পৃথিবীর সব উচ্ছ্বাস, সব মত্ততা, সমস্ত ফেনায়িত কলরব আঘাত হেনে হেনে ফিরে গেছে। ভেতরে ঢোকার মত সামান্য একটা পথও পায়নি।

এ তো গেল বাইরের পৃথিবীর কথা। এবার ভেতরের জগৎ অর্থাৎ আমাদের সংসারটার দিকে চোখ ফেরানো যাক। কোন আহ্নিক গতি কোন বার্ষিক গতি সেটাকে চালু রেখেছিল, সে কথা বলতে গেলে নতুন করে সংসারটার একটা রূপ-রেখা আঁকা দরকার।

দাদু আগের মতই চাকরি করে যাচ্ছিলেন। তবে ক'বছরে শরীর শিথিল হয়ে গিয়েছিল তাঁর। মুখময় অজস্র কুঞ্চনে, কপালের গভীর রেখায়, ঢিলে চামড়ায়, নিষ্প্রভ-হয়ে-আসা চোখে বয়স তার নির্ভুল ছায়া ফেলেছিল। মাথার একটা চুলও তাঁর কালো ছিল না। দাদু যে বুড়ো হয়ে গেছেন—তার ভেতর সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না। কিন্তু বার্ধক্য ঐ দেহেই, জরা ঐ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেই, প্রাণে আগের মতই রসের হাট বসানো ছিল।

নিয়ম অনুযায়ী দাদু, মা, দিদিমাকেও তাই হতে হবে। দাদুর চুল যতটুকু সাদা হবে, নির্ভুল হিসেবে দিদিমার চুলেও ততটুকুই পাক ধরতে হবে। দাদুর চামড়া যতখানি শিথিল হবে দিদিমার চামড়াও সেই অনুপাতেই ঢিলে হবে। দাদুর চোখ যতখানি নিষ্প্রভ হবে ঠিক সেই মাপেই দিদিমার দৃষ্টি দীপ্তি হারাবে। এত সবের পরেও দাদু যখন 'রসের খনি' হয়ে ছিলেন তখন দিদিমাকেও সুরসিকা হয়ে থাকতে হয়েছে।

ছোট ভাইবোনগুলো ক'বছরে বড় হয়ে উঠেছিল। তারা আমার স্কুলেই পড়ছিল।

সবশেষে মায়ের কথা। মায়ের শরীরে আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। উজ্জ্বল মসৃণ গাত্রবর্ণ মলিন হয়ে গিয়েছিল। চোখ দু'টি কোটরে বিলীন, গাল ভেঙে চোয়ালের হাড় ফুটে বেরিয়েছিল। হাত-পায়ে নীল নীল অসংখ্য শিরা জটিল জালের

মত দেখা দিয়েছিল। মাথার চুলের অর্ধেকটাই প্রায় উঠে গিয়েছিল। প্রতিমার মত লাবণ্যময়ী আমার মায়ের সর্বাঙ্গ জুড়ে সৌন্দর্যের চিতা জ্বলতে শুরু করেছিল। ক'বছর আগেও মায়ের যে রূপ সারা দেহে ঐশ্বর্যের মত ঝলমল করত তা যেন সুদূর স্মৃতি মাত্র। সমস্ত রূপ ধ্বংস হয়ে যা অবশিষ্ট ছিল সেদিকে তাকিয়ে আমার শুধু কান্নাই পেত।

যাই হোক, টেস্টের রেজাল্ট যেদিন বেরুল সেদিন যেমন স্কুলন হাত ধরে আমাকে জীবনের নতুন পর্বে পৌঁছে দিয়েছিল তেমনি মা-ও আমার সামনে অজানা অনুভূতির দরজা খুলে দিয়েছিলেন।

মনে আছে, টেস্টের রেজাল্ট বেরুবার পরদিন থেকেই মা অসুখে পড়েছিলেন। জ্বর, শ্বাসকষ্ট, সেই সঙ্গে বমি। যা খেতেন কিছুই হজম হ'ত না। এতদিন শরীরের ওপর অবিচার করেছিলেন। এবার শরীর সুদে আসলে তার প্রতিশোধ নিতে শুরু করেছিল। দেখতে দেখতে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন।

আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। বলেছিলাম, 'মা, ডাক্তার নিয়ে আসি?'

মা নির্জীব স্বরে বলেছিলেন, 'না, ডাক্তার আনতে হবে না। শরীর সামান্য খারাপ হয়েছে, ও কিছু নয়। এমনিই সেরে যাবে।'

'এমনি সারবে না। আর তোমার শরীর সামান্য খারাপ হয়নি।'

'তুই আমার চাইতে বেশি জানিস?'

কোথা থেকে যেন অসীম দুঃসাহস আমার ওপর ভর করেছিল। কোনদিন যে মায়ের মুখের ওপর কথা বলিনি সেদিন তা মনে ছিল না। বলেছিলাম, 'হ্যাঁ, জানি।'

মা দুর্বল অথচ বিরক্ত স্বরে বলেছিলেন, 'কী জানিস?'

'তোমার ঐ অসুখ ডাক্তার না আনলে ওষুধ না খেলে সারবে না।'

'কিন্তু—'

'কী?'

উত্তর দিতে গিয়ে মা রেগে উঠেছিলেন, 'আমার জন্যে তোকে অত ভাবতে হবে না। মন দিয়ে নিজের পড়া পড়্‌গে। খেয়াল থাকে যেন আর ক'দিন পর ফাইন্যাল পরীক্ষা।'

আগেই বলেছি সেদিন কোত্থেকে যেন অনেকখানি দুঃসাহস আমার ওপর ভর করেছিল। জীবনে সেদিন প্রথম অবাধ্য হতে চেয়েছিলাম, 'তুমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে কষ্ট পাবে, পড়াশোনায় যে আমার মন বসবে না মা। রাগ কর আর যাই

কর, ডাক্তার আমি আনবই।’

‘আঃ বকু—’

‘না মা, কিছুতেই না। তোমার বারণ আমি অনেক শুনেছি, সারা জীবন শুনে আসছি। আজ কিন্তু পারব না।’ জোরে জোরে প্রবলবেগে মাথা নেড়েছিলাম।

একটুক্ষণ কি ভেবে মা বলেছিলেন, ‘ডাক্তার যে আনবি, ওষুধ যে খাওয়াবি, —টাকা কোথায়?’

‘কেন, দাদু দেবে।’

‘না।’

‘কী, না?’

‘খাওয়া-পরা ছাড়া তোর দাদুর কাছ থেকে আর কিছুই নিতে পারব না।’ মায়ের মুখচোখ কঠিন হয়ে উঠেছিল।

মায়ের কণ্ঠস্বরে এমন একটা কিছু ছিল যার ওপরে কথা চলে না। মলিন মুখে কিছুক্ষণ বসে থেকে বলেছিলাম, ‘তা হলে—’

‘কী?’

এবার বিদ্যুৎচমকের মত কথাটা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল। বলেছিলাম, ‘ঐ—ঐ টাকাটা থেকে দাও না।’

‘কোন টাকাটা?’

প্রায় মরিয়া হয়ে বলেছিলাম, ‘ঐ যে পরীক্ষার ‘ফীজ’ দেবে বলে টাকাটা রেখেছ তা—’

কথা আর শেষ করতে পারিনি। তার আগেই প্রায় তীরের মত উঠে বসেছিলেন মা, চিৎকার করে বলেছিলেন, ‘কী, কী বললি! ফীয়ের টাকা ভেঙে আমি রোগ সারাব! দু-বছর ধরে একটা একটা করে পয়সা জমিয়েছি, সে কি ডাক্তারের হাতে তুলে দেব বলে। এমন কথা তুই বললি কি করে! বুকের পাটা তোর বড্ড বেড়ে গেছে।’

সবই জানতাম। ফীয়ের টাকা দেবেন বলে কত কাল ধরে যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন তিনি। আমার মা অসামাজিক, কারো সঙ্গে মেলামেশা করতেন না। কিন্তু আমার টেস্টের দু-বছর আগে থেকে সংসারের সব কাজ সারা হলে লোকের বাড়ি বাড়ি বাড়ি ঘুরে জামা-প্যান্ট সেলাই করে কিছু কিছু করে সংগ্রহ করতে শুরু করেছিলেন। দাদু-দিদিমা এ নিয়ে রাগারাগি করতেন, অসন্তুষ্ট হতেন। বলতেন, ‘তোর ছেলের পরীক্ষার ফী-টা আমি দিতে পারব না? না, দিলে মহাভারত

অশুদ্ধ হয়ে যাবে ?' মা উত্তর দিতেন না, নিজের কাজ করে যেতেন। ঐ ভাবে চল্লিশটা টাকা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন। মৃত্যুপথে প্রায় যখের মত সেটাকে তিনি আগলে রেখেছেন।

দুঃখে অভিমানে এবার কেঁদে ফেলেছিলাম। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ভারী রুদ্ধ গলায় বলেছিলাম, 'তুমি মরে যাবে আর আমি আনন্দ করে পরীক্ষা দিতে বসব ! এমন পরীক্ষায় আমার দরকার নেই।'

সংসারের কাছে থেকে সারা জীবন কিছুই যিনি পাননি, সেই মুহূর্তে সেই মায়ের হয়ত মনে হয়েছিল, সেটা একেবারেই মিথ্যে। আমার শেষ কথাগুলোতে খুব সম্ভব দু-হাত ভরে তাঁর অনেক পাওয়া হয়ে গিয়েছিল। হাত বাড়িয়ে আমাকে কাছে টেনে সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। গাঢ় স্বরে বলেছিলেন, 'পাগল ছেলে, আমি মরব না। মরা কি এতই সহজ রে ! তুই পরীক্ষা দিবি, ভাল রেজাল্ট করবি, গর্বে মায়ের বুক ভরে উঠবে। সেই তো আমার বাঁচার মত বাঁচা। তুই মন খারাপ করিস না বাবা।'

কে জানত, মায়ের ওপরকার কঠিন আবরণটায় সামান্য একটু আঘাত হানতে পারলে ভেতর থেকে উচ্ছ্বসিত একটা ফোয়ারা বেরিয়ে আসবে ! আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। মা যেমন সেদিন অনেক পেয়েছিলেন, আমিও দু-হাত ভরে অনেক পেয়েছিলাম।

সেদিন ডাক্তার আর ডাকা হয়নি। আত্মবিশ্বাসের জোরেই বুঝি মা সেবার সেরে উঠেছিলেন।

তিন

টেস্টের পর মায়ের আরেকটা রূপ আমাকে অভিভূত করে ফেলেছিল।

মনে আছে, দাদু আর আমি পাশাপাশি খেতে বসেছি। মা ডাল-ভাত-তরকারি নিয়ে একধারে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছেন। দরকার মত দেবেন।

ভাত মাখতে মাখতে হঠাৎ একসময় দাদু ডেকেছিলেন, 'বড় খুকি—'

মা কিছু বলেন নি, শুধু তাঁর দৃষ্টি জিজ্ঞাসু হয়ে উঠেছিল।

দাদু প্রথমটা ইতস্তত করেছিলেন। তারপর খুক খুক করে কেশেছিলেন, খাকারি দিয়েছিলেন গলায়। বোঝা গিয়েছিল, এ-সব ভূমিকা। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলেছিলেন, 'বুঝলি না, আমার হাল তো দেখছিসই—'

বুঝতে না পেরে মা বলেছিলেন, 'কিসের হাল ?'

'তুই যদি রাগ না করিস তো বলি।'

'রাগের কথা নাকি!'

'না, মানে—' দাদু থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন।

মা এবার হেসেছিলেন, মৃদু গলায় বলেছিলেন, 'তোমরা আমার রাগটাই শুধু দেখ। নাও, কী বলবে বলে ফেল।'

দাদুর দ্বিধা তবু যায়নি। খানিক চুপ করে থেকে একসময় বলেছিলেন, 'বয়েস হল অনেক। শরীরও যে ভাবে ভেঙে পড়ছে তাতে কতদিন বাঁচব, ঠিক নেই। টিকে যে আছি, নিতান্ত মনের জোরে। তাই বলছিলাম, আমি থাকতে থাকতে একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যাই।'

'কিসের ব্যবস্থা?'

'দাদাভাই ম্যাট্রিকটা পাশ করলে—' এই পর্যন্ত বলে দাদু হঠাৎ থেমে গিয়েছিলেন।

অবরুদ্ধ স্বরে মা বলেছিলেন, 'পাশ করলে কী?'

'মানে আমি না থাকলে তোরা অসুবিধেয় পড়বি। তাই ভাবছি, ওর রেজাল্ট বেরুলে আমাদের অফিসে ঢুকিয়ে দেব।'

মা হঠাৎ চিৎকার করে উঠেছিলেন, 'বাবা!'

দাদু চমকিত। একদৃষ্টে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থতিয়ে থতিয়ে বলেছিলেন, 'কী বলছিস?'

'না-না-না, কিছুতেই তা হবে না। এই কচি বয়েসে কোনমতেই আমি ওকে চাকরিতে পাঠাতে পারব না।'

'কিন্তু আমার শরীরের অবস্থাটা তো দেখছিস। আমি থাকতে থাকতে দাদাভাইকে একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়ে যেতে পারলে তোদেরই ভাল।'

'না বাবা—' মা প্রবল বেগে মাথা নেড়েছিলেন।

'কী না!?' দাদু বিভ্রান্ত চোখে তাকিয়েছিলেন।

'তুমি তো জানো বকু লেখাপড়ায় ছেলেবেলা থেকে কত ভাল। চিরদিন ক্লাসে ফার্স্ট হয়েই আসছে।'

'তা তো জানি।'

'নিজেদের স্বার্থের জন্যে ওকে পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত করতে পারব না।'

দাদু চোখ নামিয়ে অস্ফুট স্বরে বলেছিলেন, 'কিন্তু—'

মা বলেছিলেন, 'তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি বাবা। কিন্তু বকুর ক্ষতি করতে মন সায় দিচ্ছে না। যত কষ্টই হোক, ওকে পড়িয়ে যেতেই হবে। জগতে

নিয়ে এসে ছেলেপুলেকে যদি মানুষই করতে না পারলাম, সে ভারি অধর্ম।'

'একটা কথা ভেবে ভাখ মা।' দাহ্ শেষ চেষ্টা করছিলেন, 'ম্যাট্রিক পাশ করলে কলেজে পাঠাতে হবে দাদাভাইকে। আমাদের বিবিবাজারে একটাও কলেজ নেই। পড়তে হলে ওকে পাঠাতে হবে জেলা শহরে। সেখানে অনেক খরচ। আমি যদি না থাকি, তখন কে খরচ চালাবে?'

মা বলেছিলেন, 'সে জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। যেমন করে হোক চলে যাবে।'

মা কী ভেবে চলে যাবার কথাটা বলেছিলেন, সেদিন বুঝিনি। তাঁর নিশ্চিন্ত হবার উৎসটা যে কোথায়, তাই বা কে বলবে।

চিন্তিত মুখে দাহ্ বলেছিলেন, 'বেশ, তোর যখন ইচ্ছে তখন দাদাভাই পড়ুক।'

খাওয়া বন্ধ করে আমি কিন্তু অবাক হয়ে মাকে দেখে যাচ্ছিলাম। এই কি আমার সেই মা, চিরদিন যিনি বলে আসছিলেন, ম্যাট্রিক পাশ করলেই আমাকে চাকরি করতে হবে আর চাকরি পেলেই নতুন বাসা করে উঠে যেতে হবে? মায়ের এই নতুন রূপ আমাকে বিহ্বল করে ফেলেছিল।

মা যা ভাল বুঝেছিলেন তাই করেছিলেন। তার ফল হয়েছিল এই, আমাকে আর মার্চেন্ট অফিসের কেরানীগিরির আসনে বসতে হয়নি।

চার

মনে পড়ে, ম্যাট্রিক পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুতে দেখা গিয়েছিল, আমি ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়েছি। স্কলারশিপের খবরটা মুহূর্তে বিবিবাজারের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর এতকাল ধরে আমার নামে যত স্তুতির কথা শোনা গেছে সেগুলো একাকার হয়ে এক লাফে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে গিয়েছিল।

রেজাল্ট বেরুবার পর তিন দিন নিজেদের বাড়ির লোকজন ছেড়ে কোথাও বেরুতে পারিনি। যাবার সুযোগই পাইনি। প্রথম দিন মা আমাকে ঘিরে ছিলেন। রান্নাঘরের এককোণে একটা পিঁড়িতে আমাকে বসিয়ে বলেছিলেন, 'আজ আর কোথাও বেরিয়ে কাজ নেই। সারাদিন আমার কাছে থাকবি।'

'সারাদিন—' আমি হেসে ফেলেছিলাম।

'হ্যাঁ, সারাদিন—' ছেলেমানুষের মত মা-ও হেসে ফেলেছিলেন। তারপর একটু থেমে গাঢ় গলায় বলেছিলেন, 'আজ তোর কাছ থেকে যা পেলাম বাবা, সারা জীবনে কারো কাছ থেকে কোনদিন তা পাইনি। বুক আমার ভরে গেছে।'

সমস্ত দিন ধরে দু-তিন রকমের পিঠে এবং পায়েস বেঁধেছিলেন মা। তারপর ম্যাট্রিক পাশ অতবড় ছেলেকে কোলে বসিয়ে নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছিলেন।

আমি লজ্জা পেয়ে বলেছিলাম, 'কোলে বসব না।'

'হ্যাঁ, তোকে বসতেই হবে।'

'উঁহু—'

'আমার কাছে তোর লজ্জা কি রে!' বলে একটু চুপ করেছিলেন মা। তার পর আবার গাঢ় গলায় শুরু করেছিলেন, 'চিরদিন তো তোকে মারধোরই করেছি আর দাঁতে কেটেছি। আজ একটু আদর করি, তুই তাতে বারণ করিস না বাবা।'

সারাদিন কাছে রাখা, কোলে বসিয়ে খাওয়ানো—এর মধ্য দিয়ে ছেলের গৌরবকে তিনি বোধ হয় স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন।

রেজাল্ট বেরিয়েছিল দুপুরবেলা। দাদু তখন অফিসে। বিকেলে ফেরার সময় কার কাছে যেন খবরটা পেয়েছিলেন। আর পাওয়ামাত্র ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে সদর থেকেই ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছিলেন, 'দাদাভাই, দাদাভাই—'

দাদু মানুষটা সর্বক্ষণ আবেগে টলমল, উচ্ছ্বাসে ভরপুর। অকারণেই তিনি মেতে উঠতে পারতেন। আর নিতান্ত তুচ্ছ কোন কারণ পেলে তো কথাই নেই। তখন দুরন্ত ঢলের মুখে ভেসে যেতেন।

আমি রান্নাঘরে মায়ের কাছে বসেছিলাম। ডাক শুনে বাইরে আসতেই দাদু আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, 'অফিস ফেরার পথে রাস্তার লোক তোর রেজাল্টের খবরটা দিলে। শুধু কি খবরই দিলে, তোর কত গুণগান কত প্রশংসা করলে। তুই বিবিবাজারের মুখ উজ্জল করেছিস, বংশের মুখ আলো করেছিস। শুনতে শুনতে বুক আমার দশহাত হয়ে উঠল। তোর মা তোর ওপর কোন কর্তব্যই করতে দেয় নি, এমন কি পরীক্ষার ফী-টা পর্যন্ত দিতে দেয় নি। তবু—তবু বলছি দাদাভাই, তোর গৌরবের ছটা আমার গায়েও লেগেছে।'

আমি নীচু হয়ে দাদুকে প্রণাম করেছিলাম। দাদু আশীর্বাদের সুরে বলেছিলেন, 'বেঁচে থাকো দাদা, চিরদিন এমনি করে সবার মুখ আলো করো।'

ওদিকে রান্নাঘর থেকে মা বেরিয়ে এসেছিলেন। অভিভূত আপ্লুত সুরে দাদুকে ডেকেছিলেন, 'বাবা—'

দাদু মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'কী বলছিস?'

'বকুর ফী যে দিতে দিই নি সে কি তোমার ওপর রাগ করে?'

'আমি জানি কার ওপর রাগ করে দিতে দিস নি।' দাদু মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন, 'মাধবটা যদি এখন থাকত!'

মা আস্তে আস্তে বলেছিলেন 'ও নাম তুমি আর উচ্চারণ করো না বাবা।'

দাদু উত্তর দেন নি, শুধু আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছিলেন।

কয়েকটা নীরব মুহূর্ত। তারপর ব্যস্তভাবে দাদু বলেছিলেন, 'হ্যাঁ রে বড় খুকি, দাদাভাই এমন একটা কাণ্ড করলে, তার জন্যে কী করেছিস বল্?'

'কী করব?'

'এই খাবার-টাবার—'

'করেছি।'

'কী খাবার করেছিস?'

'সেদ্ধ পুলি, পাটিসাপ্টা আর পায়েস।'

'উঁহু—উঁহু—'জোরে জোরে মাথা নেড়েছিলেন দাদু, 'ওতে হবে না। এত বড় একটা কাণ্ডের পর ঐটুকুতে আমার কিন্তু তৃপ্তি হচ্ছে না বড় খুকি।'

মা হেসে ফেলেছিলেন, 'তোমার তৃপ্তি কিসে, আমি জানি। কিন্তু—'

'আজকের দিনটা অন্তত তোর কোন কথা শুনতে চাই না।' দাদু বলেছিলেন, 'আমার যা ইচ্ছে আজ তাই করব।'

বাবা শেষ বার সেই যে এসেছিলেন তারপর থেকে আমাদের বাড়িটার ওপর দিয়ে সর্বক্ষণ বিষাদের হাওয়া বইতে থাকত। এতকাল পর বাড়িটার গায়ে যেন সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগেছিল।

মা কিছু উত্তর না দিয়ে হেসেই যাচ্ছিলেন।

দাদু এবার রেগে উঠেছিলেন, 'হাসছিস যে বড়?'

'তোমার কাণ্ড দেখে।'

'কাণ্ডটা আর দেখলি কোথায়? দাদাভাই এক কাণ্ড করেছে, আমি করব আর একটা। তুই যদি বাধা দিস, আমি কিছুতেই মেনে নেব না। আমার ওপরে যদি সর্দারি ফলাতে যাস তা হলে হয় যেদিকে দু চোখ যায় চলে যাব, নয় তোরা যাবি। কোনদিন তোদের আর মুখদর্শন করব না।'

মা সমানে হেসেই যাচ্ছিলেন, 'বেশ তো, তোমার যা ইচ্ছে কর না।'

'সত্যি বলছিস?' আজ কোন ব্যাপারেই যে মা বাধা দেবেন না, বরং সব ব্যাপারেই তাঁর পুরোপুরি সায় আছে সেটা তাঁর মুখের হাসিতেই লেখা ছিল। তবু দাদুর সংশয় কাটছিল না। সেটা অকারণে নয়। কোনদিন নাতি-নাতনীদের ঘিরে দাদুর একটা সাধও মেটেনি, সেদিন সেটা মেটাতে গিয়ে মা যদি শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসেন? অতএব আগে থেকেই তাঁর অনুমোদন আদায় করে নেওয়া ভাল।

মা বলেছিলেন, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ, সত্যি—সত্যি—সত্যি। প্রাণভরে যা মনে আসে তা মিটিয়ে নাও।'

দাদু তখন সম্ভরের দেউড়িতে। বয়েসের কথা ভুলে প্রায় একটা লাফই দিয়েছিলেন তিনি। তারপরই ছুট। ফিরে এসেছিলেন ঘণ্টা দুয়েক পর। একাই আসেন নি, পেছন পেছন একটা মুটে বিরাট গন্ধমাদন মাথায় চাপিয়ে এসেছিল।

বোঝা নামাতে দেখা গিয়েছিল, প্রকাণ্ড একটা রুই মাছ, গাওয়া ঘি, পোলাওর চাল, সন্দেশের বাক্স, রসগোল্লার হাঁড়ি, বাড়ির সবার জন্য নতুন জামাকাপড়, ইত্যাদি ইত্যাদি কত কিছু যে এনেছেন তার হিসেব নেই।

মুটেটা চলে গেলে মা বলেছিলেন, 'এ কী করেছ বাবা।'

দাদু মাথা নেড়ে বলেছিলেন, 'উঁহু—'

'উঁহু কী ?'

'তুই তখনই তো বলেছিস, আজ আমি যা করব তাতে বাধা দিবি না।'

'তাই বলে চোখের সামনে গলায় কোপ বসালেও কিছু বলব না ?'

'গলায় কোপটা দেখলি কোথায় ?'

'দেখলাম কোথায় ?'

'হ্যাঁ।'

'তার আগে বল, আজ মাসের ক' তারিখ ?'

মায়ের প্রশ্নটার মর্মার্থ পুরোপুরি বুঝতে না পেরে দাদু কণ্ঠস্বরে খানিক বিস্ময় খানিক বিমূঢ়তা মিশিয়ে বলেছিলেন, 'কেন, তারিখ দিয়ে কী হবে ?'

মা যেন ছেলেমানুষের মত জেদই ধরেছিলেন, 'বলই না।'

অগত্যা কি আর করা, দাদু বলেছিলেন, 'ছাব্বিশ তারিখ।'

'মাস কাবারের মুখে এত সব আনলে কোত্থেকে ? টাকা পেলে কোথায় ?'

'সে যেখানেই পাই, তোকে অত ভাবতে হবে না।'

'ভাবতে হবে না বললেই হল ?' মা এবার রেগে উঠেছিলেন।

দাদু বিপন্ন স্বরে বলেছিলেন, 'বলছি বাবা, বলছি। ধার করে এসব এনেছি।'

'ধার করে !'

দাদু কী উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, দেওয়া হয়নি। তার আগেই দিদিমা বলে উঠেছিলেন, 'বেশ করেছে ধার করেছে। আজকের দিনটায় চুরি, ডাকাতি যা খুশি করবে। আজ সাত খুন মাপ। তুই বাপু আজ এ নিয়ে ঝগড়াঝাটি বাধাবি না বড় খুকি।'

দিদিমা যে কখন নিঃশব্দে দাদু আর মায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, টের

পাওয়া যায় নি। এতক্ষণ মায়ের কাছে দাদু বিব্রত, ম্রিয়মাণ কোণঠাসা হয়ে ছিলেন। কিন্তু দিদিমার সমর্থন পেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলেন। গলার স্বর চড়া পর্দায় তুলে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বেশ করেছি। তোর কোন কথা আমি শুনব না।'

মা এবার দাদু-দিদিমার সঙ্গে খুনসুটি করেছিলেন। হেসে বলেছিলেন, 'তোমাদের একজন যা করবে, আর একজন তাতে সায় তো দেবেই। যা খুশি করো গিয়ে, আমি আর কিছু বলতে যাচ্ছি না। ছেলে পরীক্ষায় পাশ করে একেবারে রাজত্ব উদ্ধার করে বসে আছে।'

দাদু বলেছিলেন, 'আছেই তো।'

দিদিমার হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ রে. বড় খুকি—'

'কী?' মা জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলেন।

'কি বেভুলো মন রে তোদের? ছেলেটা পাশ করল আর পঞ্চাননতলায় পুজো দেবার কথাটা তোদের কারো খেয়াল নেই?'

'তাই তো, তাই তো।'

আমাদের বিবিবাজার থেকে দুটো স্টেশন পরে নবীপুর। সেখানে জাগ্রত শিবের মন্দির আছে। পরীক্ষার আগে দিদিমা মানত করেছিলেন, আমি পাশ করলে যোল আনার পুজো দিয়ে আসবেন।

অতএব তৎক্ষণাৎ স্থির হয়েছিল, দাদু পরের দিন অফিসে ছুটি নেবেন এবং আমাদের নিয়ে নবীপুরে পুজো দিতে যাবেন।

কথামত পরের দিন আমরা বাড়ির সবাই নবীপুর গিয়েছিলাম। জায়গাটি চমৎকার। রান্নাবাড়া করে খেয়ে, সারাদিন সেখানে কাটিয়ে সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরেছিলাম।

পরের দিনও দাদু অফিসে যাননি। সেদিন তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকিয়ে আমরা গিয়েছিলাম কলকাতায়। মা প্রথমটা আমাদের সঙ্গে আসতে চান নি। জোর করে তাঁকে ধরে এনেছিলাম। (মায়ের ওপর জীবনে সেই আমার প্রথম জোর খাটানো।)

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত আমরা কলকাতায় রাস্তায় রাস্তায় নেশার ঘোরে আচ্ছন্নের মত ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। চিড়িয়াখানা দেখেছিলাম, মনুমেন্ট দেখেছিলাম, হাওড়ার পুল দেখেছিলাম, হাইকোর্ট দেখেছিলাম। এমন কি একটা সার্কাসও দেখে এসেছিলাম। মনে আছে, সার্কাসে বাঘের খেলা দেখে আমার ভাইবোনগুলো ভয়ে

জড়সড় হয়ে গিয়েছিল, আবার ক্লাউনের পোশাক আর নাচ দেখে হেসে কুটিপাটি।

নেশার ঘোরটা মায়ের গায়েও বুঝি লেগেছিল। ঘুরতে ঘুরতে একসময় সবার অলক্ষ্যে মা বলেছিলেন, 'কেউ তো আমায় কোথাও নিয়ে যায়নি, ভোক দিয়ে সাজতে বলে শুধু পালিয়েই গেছে। তোর জন্যে আমার ঘরের বাইরে আসা হল। কি ভাল যে লাগছে!'

তখন বড় হয়েছি, বুঝবার বয়েস হয়েছে। অনুভব করেছিলাম, মায়ের ব্যথাটা কোথায়, অভিমানটা হৃদয়ের কোন প্রান্তে। মুখ ফুটে না হলেও কার কথা মা বলছিলেন, টের পেয়েছিলাম। আর এ-ও বুঝেছিলাম, ছেলের গৌরবের অস্ত্রে বাবার সঙ্গে মনে মনে তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন।

সেদিন অনেক রাত্রে অবসন্ন দেহে, কিন্তু কানায় কানায় পূর্ণ মন নিয়ে সুখের সরোবরে ভাসতে ভাসতে লাস্ট ডাউন ট্রেনে আমরা বিবিবাজার ফিরে এসেছিলাম।

পাঁচ

মনে আছে, সে সময় ক'টা দিনের গায়ে যেন স্পর্শমণির ছোঁয়া লেগে গিয়েছিল। প্রতিটি মুহূর্ত বুঝিবা স্বপ্নময় আচ্ছন্নতার মধ্যে কেটে যাচ্ছিল।

রেজাল্ট বেরুবার পর প্রথম তিনটে দিন মা-দাদু-দিদিমা-ভাইবোনেরা এমনভাবে আমাকে ঘিরে ছিল যাতে অন্য দিকে চোখ ফেরাবার অবকাশটুকু পর্যন্ত পাইনি।

চতুর্থ দিন সকালে ঝুলনদের কথা মনে পড়েছিল। অবশ্য এই তিন দিনের ভেতর কিছুক্ষণের জন্য হীরু একবার আমাদের বাড়ি এসেছিল।

ঝুলনদের কথা মনে পড়তে আর অপেক্ষা করিনি। সোজা চলে গিয়েছিলাম। গিয়েছিলাম দ্বিধান্বিত অপরাধীর ভঙ্গিতে। অপরাধী, কেননা এর মধ্যে নিশ্চয়ই একবার যাওয়া উচিত ছিল। ক্লাস টু থেকে টেন—এই ন'টা বছরের প্রায় প্রত্যহই ঝুলনদের বাড়ি গেছি। কচিৎ দু-একটা দিন বাদ গেছে কি যায়নি। কিন্তু একসঙ্গে একেবারে তিনটে দিন আমি অদৃশ্য—এমন ব্যাপার কখনও ঘটেনি।

ঝুলনরা অবশ্যই হীরুর মুখে আমার স্কলারশিপের খবর পেয়েছে। তবুও নিজের মুখে সে কথা বলে আসা একান্ত উচিত ছিল আমার।

হীরুদের বাড়ির কাছে এসে লোহার গেটটার সামনে একটুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তারপর ভয়ে ভয়েই ভেতরে ঢুকেছি। ভয়টা অবশ্য হীরুর মা-বাবার দিক থেকে ছিল না; ছিল ঝুলনের দিক থেকে। সেটা যে অকারণে নয়, একটু পরেই টের পাওয়া গিয়েছিল।

সেই ঝাউবনটার কাছাকাছি আসতেই দেখা হয়ে গিয়েছিল। চোখোচোখি হতেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল ঝুলন।

অন্য সব দিন ঝুলনই যেচে কথা বলত। সেদিন কিন্তু আমিই নিজে থেকে এগিয়ে গিয়েছিলাম। কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে ডেকেছিলাম, 'ঝুলন—'

ঝুলন উত্তর দেয়নি। ঝাউগাছের ছোট একটি ডাল ভেঙে নিয়ে উদাসীনের মত নখ দিয়ে কুটি কুটি করে ফেলছিল।

একটা কিছু ঝড়ের আভাস যেন পেয়েছিলাম। ঈষৎ কাঁপা সুরে বলেছিলাম, 'আগেই আমার আসা উচিত ছিল। কিন্তু—'

এবার বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল ঝুলন। যেন কত বিস্মিত হয়েছে এমনভাবে বলেছিল, 'আসা উচিত ছিল নাকি!'

'হ্যাঁ।'

'ও মা, কেন?'

থতমত খেয়েছিলাম, 'কেন, তুমি কিছু শোন নি?'

'কী?' কিছুই যেন জানে না এমন নিরীহ ভালমানুষের মত মুখ করে জিজ্ঞেস করেছিল ঝুলন।

'মানে, আমাদের ম্যাট্রিকের রেজাল্ট বেরিয়েছে।'

'তাই নাকি?' বলেই আবার মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ঝুলন।

এক মুহূর্ত থমকে ছিলাম। তার পরেই কি যেন হয়ে গিয়েছিল, নিদারুণ এক আত্মবিস্মৃতি আমাকে হঠাৎ পেয়ে বসেছিল। প্রথম যৌবনের প্রগলভ ঈশ্বর হঠাৎ আমার ওপর ভর করে বসেছিল। দুই হাতে ঝুলনের কাঁধ ধরে নিজের দিকে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। জীবনে ঝুলনকে সেই আমার প্রথম স্পর্শ। মনে হয়েছিল, হৃৎপিণ্ডের অতলে রক্ত যেন ফেনায়িত হয়ে উঠছে।

বলেছিলাম, 'আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে।'

'অন্যায়? কিসের অন্যায়? আমরা তোমার কে? আমাদের সঙ্গে তোমার কিসের সম্পর্ক?' গলার স্বর কেঁপে গিয়েছিল ঝুলনের। রক্তাভ পাতলা ঠোঁটদুটো স্ফুরিত হয়ে উঠেছিল, 'তিন দিনে একবারও আসার সময় হল না। অথচ বাবা-মা এ ক'দিন তোমার পথ চেয়ে বসে ছিলেন।'

নিজের অজান্তেই প্রগলভ হয়ে উঠেছিলাম, 'শুধু মা-বাবাই কী, আর তুমি?'

'আমি কেন তোমার পথের দিকে তাকিয়ে থাকব? নাঃ, কোন কারণ তো নেই।'

'তাই বুঝি? বেশ।' আমি হেসে ফেলেছিলাম।

এবার কোন এক যাদুকরের নির্দেশে কেঁদে ফেলেছিল ঝুলন। ঝাপসা ভারী গলায় বলেছিল, 'আমার কথা এখন আর তোমার মনে থাকবে কেন? স্কলারশিপ পেয়েছ, আমার মত সামান্য মেয়ের দিকে তাকানোই তো তোমার উচিত নয়।'

বলেছিলাম, 'বোকা কোথাকার, মনে না থাকলে এলাম কেন?'

'সে তো দায় সারতে।'

আরো দু-চারটে কথার পর সন্ধি হয়ে গিয়েছিল।

মনে আছে, ঝাউবনের নিভৃতে খানিকক্ষণ কাটিয়ে ঝুলনের সঙ্গে একসময় বাড়ির ভেতর গিয়েছিলাম। ঝুলনের বাবা-মা আমাকে সন্ধ্যের পরও বেশ কিছুক্ষণ আটকে রেখেছিলেন।

সেদিন এসেছিলাম সকালে। দুপুরবেলা ঝুলনদের বাড়িতেই খেতে হয়েছিল। অবশ্য আমি যে দুপুরে বাড়ি ফিরব না হীরুকে দিয়ে সে খবরটা হীরুর মা আমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

সবাই একসঙ্গে খেতে বসেছিল। ঝুলন, হীরু, হীরুর বাবা, মা এবং আমি। সে যুগে স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে বসে খাওয়ার রীতি ছিল না। হীরুর বাবা-মা ওসব মানতেন না।

খেতে খেতে হীরুর বাবা বলেছিলেন, 'আমি খুব খুশী হয়েছি বকু।'

পাতের দিক থেকে চোখ তুলে তাকিয়েছিলাম কিছু বলিনি।

'এই বিবিবাজারে যতদূর জানি তুমিই প্রথম স্কলারশিপ পেলে। সেদিক থেকে তুমি আমাদের গর্ব। খুব আনন্দ পেয়েছি বাবা, খুব আনন্দ পেয়েছি।'

প্রশংসার কথাগুলো শুনতে শুনতে ঘাড় স্বভাবতই নুয়ে পড়েছিল। কোন উত্তর দিতে পারিনি।

হীরুর বাবা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে কি ভেবে আবার বলেছিলেন, 'বুঝলে বকু—'

চোখ না তুলেই সাড়া দিয়েছিলাম।

'তোমাদের বাড়ি অনেকদিন থেকেই যাব যাব ভাবছি। এতদিন যাওয়া হয়নি। এবার আর না গেলেই নয়।'

চকিতে চোখ তুলে ঝুলনের দিকে তাকিয়েছিলাম। বছর দেড়েক আগে যখন ক্লাস টেনে প্রোমোশন পেয়েছি সেই সময় ঝুলন এ সম্বন্ধে আভাস দিয়েছিল। বলেছিল শিগ্গীরই একদিন তার বাবা আমাদের বাড়ি যাবেন। যাবার কারণ অবশ্য ঝুলন বলেনি।

চোখে চোখ পড়তে মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছিল ঝুলনের। সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিকে

মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল সে।

'ম্যাট্রিক তো হল।' হীরুর বাবা আবার বলে উঠেছিলেন, 'এবার কী পড়বে কিছু ঠিক করেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কী?'

'বি. এস-সি-টা পাশ করে ভাবছি ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ব। আজকাল তো ইঞ্জিনীয়ারদের খুবই চাহিদা।'

'খুব ভাল লাইন।' হীরুর বাবা মাথা নেড়েছিলেন।

আমি চুপ।

হীরুর বাবা আবার বলেছিলেন, 'বেশ বাবা, বেশ। অনেক ছেলে তো ম্যাট্রিকের পর ঠিকই করতে পারে না, কী করবে। তুমি যে আগে থাকতে ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করেছ, এতে ভারি ভাল লাগল। সব ছেলেরই উচিত প্রথম থেকেই জীবনের একটা লক্ষ্য স্থির করে নেওয়া। তাতে লাইফকে গড়ে নিতে সুবিধে হয়।'

এরপর কিছুক্ষণ নীরবতা।

আমি আবার দৃষ্টিটা ঝুলনের দিকে ফিরিয়েছিলাম। পাতের ওপর সে আঁকি-বুকি কেটে যাচ্ছিল। একটুক্ষণ তাই দেখে আবার তার বাবার দিকে তাকিয়েছিলাম। খানিক ইতস্তত করে বলেছিলাম, 'আমাদের বাড়ি যাবেন বললেন—'

'হ্যাঁ।'

'কবে যাবেন?'

'পরশু টরশু একদিন যাব।'

মনে মনে হিসেব করে বলেছিলাম, 'পরশু টরশু মানে আসছে শনি কি রবিবার?'

'হ্যাঁ।' হীরুর বাবা বলেছিলেন, 'তুমি আবার আমার যাবার ব্যাপারে বাড়ির সবাইকে গিয়ে ব্যস্ত করে তুলো না।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিইনি। কী একটু ভেবে হঠাৎ বলে ফেলেছিলাম, 'আমাদের বাড়ি যাবেন, কিছু দরকার আছে?'

সস্নেহে হেসেছিলেন হীরুর বাবা। লক্ষ্য করেছিলেন, হীরুর মায়ের চোখেও ইঙ্গিতময় হাসির লহর তিরতিরিয়ে নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে। আর ঝুলনের মাথা পাতের ওপর আরো ঝুঁকে পড়েছে।

হীরুর বাবা বলেছিলেন, 'দরকার আছে বৈকি বাবা, নিশ্চয়ই আছে। আচ্ছা বকু—'

'আজ্ঞে—'

'তোমার বাবা বোধ হয় এখন বিবিবাজারে নেই।'

অনুভব করেছিলাম, বাবার কথায় বুকের কোথায় যেন ব্যথা বাজতে শুরু করেছিল। মুখখানা মলিন হয়ে উঠেছিল, প্রায় অস্ফুটে বলেছিলাম, 'আজ্ঞে না।'

হীরুর বাবা সাগ্রহে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'উনি এখন কোথায়?'

বাবার ব্যাপারে এ বাড়িতে চিরদিনই লুকোচুরি খেলেছি। এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠলে এড়িয়েই গেছি। অবশ্য বাবা সম্বন্ধে কোনদিন ওঁরা খুব একটা কৌতূহল প্রকাশ করেন নি।

আধফোটা স্বরে বলেছিলাম, 'বাংলা দেশের বাইরে আছেন।'

'বাংলা দেশের বাইরে কোথায়?'

কোথায়, আমি তা কেমন করে জানব? ভূগোলের কোন্ প্রান্তে এই মুহূর্তে তিনি আছেন, আমার পক্ষে জানা অসম্ভব। চোখকান বুজে কোনরকমে বলেছিলাম, 'পাঞ্জাবে আছেন।' ভারতবর্ষে এত জায়গা থাকতে হঠাৎ পাঞ্জাবের নামটা কেন যে মনে এসেছিল বলতে পারব না, তার কোন সঙ্গত ব্যাখ্যাও বোধ হয় নেই। অবশ্য পাঞ্জাব ছাড়া যে জায়গার নামই বলতাম, কেন বলেছি, তার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারতাম না।

হীরুর বাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমার বাবা কি শিগ্‌গীরই ফিরবেন?'

কেমন করে তাঁকে জানাব, শিগ্‌গীর কেন, আর কোনদিনই বাবা বিবিবাজারে ফিরে আসবেন না। মধ্যরাতে বাবার সেই লাঞ্ছিত অপমানিত বিপন্ন বিষণ্ণ মুখের ছবিটি বার বার আমার মনে পড়ছিল। চিরদিনের মত আমাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি চলে গেছেন। আমাদের সংসারের যে দরজা মা তাঁর মুখের ওপর বন্ধ করে দিয়েছেন, কোনদিন আর তা খুলবে না।

হীরুর বাবার প্রশ্নে আমার হৃৎপিণ্ড মুচড়ে মুচড়ে যেন রক্ত ঝরছিল। পরিবারিক সেই অগৌরবের কথা যত মনে পড়ছিল ততই লজ্জাকর এক অস্বস্তি আমার সেদিনের সমস্ত আনন্দকে মলিন করে দিচ্ছিল, আমাকে ঘিরে যে উৎসব শুরু হয়েছিল বাবার প্রসঙ্গ আসতে তা ম্রিয়মাণ হয়ে যাচ্ছিল।

বলেছিলাম, 'বাবা এখন ফিরবেন না।'

'তা হলে—' বক্তব্য অসম্পূর্ণ রেখে হীরুর বাবা হঠাৎ থেমে গিয়েছিলেন।

জিজ্ঞাসু স্বরে বলেছিলাম, 'কী?'

'তোমাদের বাড়ি গেলে কার সঙ্গে কথা বলব?'

'কেন, আমার মা আছেন, দাদু আছেন।'

'ওঁদের সঙ্গে কথা বললে কি হবে?' একটু সংশয়ের স্বরই যেন ফুটেছিল

হীরুর বাবার গলায়।

আমি বলেছিলাম, 'আপনার কী দরকার তা তো জানি না। যদি আপত্তি না থাকে দরকারের কথাটা আমাকে বলতে পারেন। কী দরকার জানতে পারলে বলতে পারতাম, কার সঙ্গে কথা বলবেন।'

খানিক ইতস্তত করেছিলেন হীরুর বাবা। হীরুর মায়ের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতময় একটু হেসে বলেছিলেন, 'এই তোমার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করতে হবে।'

'আমার সম্বন্ধে ?' আমি চকিত হয়ে উঠেছিলাম।

'হ্যাঁ।' হীরুর বাবা আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছিলেন।

খানিকক্ষণ ভেবে বলেছিলাম, 'আমার সম্বন্ধে আপনার যদি কিছু আলোচনা করবার থাকে তা হলে বাবাকে দরকার নেই।'

অবাক হয়ে গিয়েছিলেন হীরুর বাবা। বিমূঢ়ের মত প্রশ্ন করেছিলেন 'তোমার বাবাকে দরকার নেই !'

'আজ্ঞে না।'

'তবে কার সঙ্গে আলোচনা করব ?'

'আমার মায়ের সঙ্গে। আমার ব্যাপারে মা ছাড়া আর কারো কিছু বলবার অধিকার নেই।'

স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হীরুর বাবা বলেছিলেন 'বেশ, তোমার মাকে বোলো পরশু-টরশুই তোমাদের বাড়ি যাব।'

ছয়

মনে আছে, কথামত সেই পরশুদিনই আমাদের বাড়ি এসেছিলেন হীরুর বাবা। এসেছিলেন দুপুরের দিকে। তাঁর আসার খবরটা অবশ্য আগেই মাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম।

দিনটা ছিল রবিবার। খাওয়া-দাওয়ার পর পরিপাটি একটু দিবা নিদ্রা দিচ্ছিলেন দাদু। আমাদের ভাইবোনদেরও খাওয়ার পালা চুকে গিয়েছিল। আর মা সংসারের যাবতীয় কাজ সেরে সবেমাত্র স্নান সেরে এসেছেন। তখনও তাঁর খাওয়া হয়নি, দিদিমাও অবশ্য খান নি। দু-জনে একসঙ্গে খাবেন।

হীরুর বাবা আসতে ধড়মড় করে উঠে বসেছিলেন দাদু, সারা বাড়ি জুড়ে

সাড়া পড়ে গিয়েছিল। ভাইবোনগুলো দূর থেকে দৃষ্টিতে অপার কৌতূহল, বিস্ময় আর কিছুটা বা ভয় ফুটিয়ে দেখছিল। দূর থেকেই, কিন্তু কাছে আসছিল না।

এদিকে দাদু হীরুর বাবাকে নিজের ঘরে নিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়েছিলেন, নিজে বসেছিলেন বিছানার ওপর। মা কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টেনে দরজার বাইরে খানিক আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর ঠিক পেছনে দিদিমা। আর আমি ঘরের ভেতর দাদুর পাশ ঘেঁষে বসে ছিলাম।

মনে পড়ে, হীরুর বাবা ফীটনে করে একাই এসেছিলেন। দাদুর ঘরে বসে চারদিকে তাকিয়ে খানিক ইতস্তত করেছিলেন তিনি। কিভাবে আলোচনাটা শুরু করবেন, সেটাই বোধ হয় ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না। কিছুক্ষণ ভূমিকার পর অবশেষে শুরু করেছিলেন, 'অনেক দিন থেকেই ইচ্ছে, আপনাদের বাড়ি আসি কিন্তু কিছুতেই সাহস করে উঠতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত না এসে পারলাম না। ভাবলাম, এর পর গেলে দেরি হয়ে যাবে।'

কথাগুলো অবশ্য দাদুর দিকে তাকিয়েই বলেছিলেন হীরুর বাবা। কিন্তু লক্ষ্য ছিলেন মা। সেদিন জানিয়ে এসেছিলাম আমার সম্বন্ধে শেষ কথা বলার অধিকার একমাত্র মায়ের। তাতেই কি প্রভাবিত হয়েছিলেন হীরুর বাবা? হয়ত, হয়ত।

দাদু কী জবাব দিয়েছিলেন, মনে নেই। মায়ের উত্তরটা কিন্তু হুবহু স্মরণ করতে পারি। মা বলেছিলেন, 'আপনি আসবেন আমাদের বাড়ি, এ তো পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। এর মধ্যে সাহসের কথা তুললে আমরা খুবই বিব্রত হব। তা ছাড়া—'

'কী?' হীরুর বাবা উন্মুখ হয়েছিলেন।

'আপনি তো এ বাড়িতে অপরিচিত না। যদিও অনেক দিন আগে একবার মাত্র আপনাকে দেখেছি তবু বকুর মুখে দশ বছর ধরে আপনাদের কথা শুনে আসছি। শুনতে শুনতে আপনাদের মনে মনে শ্রদ্ধা করে আসছি। কত বার ইচ্ছে হয়েছে আপনাদের সঙ্গে আলাপ করি কিন্তু বুঝতেই তো পারেন, ঘরের বউ আমি, ছোট জগতে বাস—'

আমি চমৎকৃত। মা যে এত সুন্দর কথা বলতে পারতেন, ধারণা ছিল না।

এদিকে সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলেন নি হীরুর বাবা। স্মিতমুখে বসে ছিলেন। অনেক ক্ষণ পর মুখ তুলে বলেছিলেন, 'তা তো বটেই। সে যাই হোক, আমি কিন্তু আজ একটা বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি।'

'বিশেষ প্রয়োজন!' মায়ের চোখে-মুখে এবং কণ্ঠস্বরে বিস্ময় ফুটে বেরিয়েছিল।

ঘোমটার তলা দিয়ে হীরুর বাবার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'বেশ তো, বলুন—'

'যদি অভয় দ্যান, বলতে পারি।'

'কোন ভয়ের ব্যাপার আছে নাকি?'

'সেটাই ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

মৃদু হেসে মা এবার আশ্বাস দিয়েছিলেন, 'আপনি নির্ভয়ে বলুন।'

প্রথমটা একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন হীরুর বাবা। তারপর খানিক সামলে নিয়ে দরজার ওপারে মায়ের কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন। দুই হাত যুক্ত করে দীন ভঙ্গিতে বলেছিলেন, 'আমি আপনার কাছে একটা ভিক্ষে চাইতে এসেছি।'

'ভিক্ষে!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমি বড় গরীব। আপনার মত মানুষকে ভিক্ষে দিতে পারি, এমন সাধ্য আমার নেই। এ কথা বলে আমাকে অপরাধী করবেন না।'

'আপনি বোধ হয় জানেন না—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিলেন হীরুর বাবা।

'কি জানি না?' মা জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলেন।

'বিবিবাজারে আপনার চাইতে ঐশ্বর্যময়ী আর কেউ নেই। আপনার ঘরে সাত রাজার ধন এক মানিক আছে।' বলে আমার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন হীরুর বাবা।

মা ইঙ্গিতটা বুঝেছিলেন। খানিক গর্বে আর খানিক সঙ্কোচে, দুটো একাকার হয়ে অনেকগুলো বিচিত্র ঢেউ তাঁর মুখের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে নিচু স্বরে বলেছিলেন, 'কিন্তু আমার কাছে আপনি কী চাইছেন, এখনও বুঝতে পারছি না। দয়া করে যদি বুঝিয়ে বলেন—'

হীরুর বাবা বলেছিলেন, 'বকু যেদিন প্রথম স্কুলে ভর্তি হয় সেদিন থেকেই আমাদের বাড়ি যাচ্ছে। দশ বছর ধরে আমাদের ওখানে ওর যাওয়া-আসা। আমার স্ত্রী আর আমি ওকে খুব ভালবাসি, খুব স্নেহ করি।'

'সে আমি জানি।' গাঢ় কৃতজ্ঞ স্বরে মা বলেছিলেন, 'ভালই যদি না বাসবেন, স্নেহই যদি না করবেন, দশ বছর ধরে বকু আপনাদের বাড়ি যাবে কেন? এই বিবিবাজারে কত লোকই তো আছে। আর কারো কাছেই তো যায় না। তা ছাড়া—'

'কী ?'

'আর তো আমাদের কিছুই নেই। একটু সম্মানবোধই যা আছে। সেই সম্মানে ঘা লাগলে দেখতেন ছেলে আমার কবেই আপনাদের বাড়ি যাওয়া ছেড়ে দিত।'

হীরুর বাবা বলেছিলেন, 'আর কিছুর দরকার কি। সম্মানবোধই তো আসল কথা।'

'সেই সম্মানবোধ বাঁচিয়ে টিকে থাকাই মুশকিল।'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর কুণ্ঠিত মুখে মা বলেছিলেন, 'এবার তা হলে দয়া করে বলুন আমার কাছে কী জন্যে—'

দু-হাত কচলে হীরুর বাবা বলেছিলেন, 'তার আগে আমাকে একটা কথা দিতে হবে।'

'কী কথা ?'

'আপনি আমায় ফেরাবেন না।'

মায়ের চোখের দৃষ্টি নিষ্পলক হয়ে গিয়েছিল। একটু আগের হাসির রেখাটা ঠোঁটের প্রান্ত থেকে গিয়েছিল বিলীন হয়ে।

হীরুর বাবা বলেছিলেন, 'আমি জানি বকুর ব্যাপারে আপনার কথাই শেষ কথা। তাই বলছিলাম, বকুকে আমায় দিতে হবে।'

'দিতে হবে মানে ?' মা খুব আস্তে আস্তে অথচ দৃঢ় স্বরে বলেছিলেন, 'ঠিক বুঝতে পারলাম না তো !'

'আমার একটি মেয়ে আছে। এবার ক্লাস নাইনে পড়ছে। আমার ইচ্ছে—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়েছিলেন হীরুর বাবা।

মায়ের মুখে সেই হারানো হাসিটি আবার ফিরে এসেছিল, 'আপনি কী বলতে চান আমি বোধ হয় বুঝতে পেরেছি। ঝুলন মায়ের কথা আমি অনেক শুনেছি। আমার কোন আপত্তি নেই। তবে—'

'কী ?'

'এখন ওরা ছোট, শিক্ষার বয়েস। এ সময় তো—'

'সে তো নিশ্চয়। এখন বিয়ের কথাই ওঠে না। তবে আপনার মুখের একটা কথা পাওয়া, সেই জন্যেই আর কি—' হীরুর বাবা বলে যাচ্ছিলেন, 'তা সেদিক থেকে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। আপনাদের আত্মীয় হিসেবে পাব, এ আমার পরম সৌভাগ্য।'

'বুলন মা আমার ঘরে আসবে, আমার সৌভাগ্যও কি কম !' মা হেসেছিলেন।

একটু চুপ করে থেকে হীরুর বাবা বলেছিলেন, 'বকুর ব্যাপারে আমার একটা ইচ্ছে আছে।'

'কী ইচ্ছে ?'

'এত ভাল রেজাল্ট করেছে ও, যতদূর ইচ্ছে পড়াশোনা চালিয়ে যাক।'

'আমারও তাই ইচ্ছে।'

'যদি অভয় দ্যান আর একটা কথা নিবেদন করতে চাই।'

'বলুন।'

'পরশুদিন কথায় কথায় বকুর কাছে জানলাম, বি. এস-সি পাশ করে ও ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে চায়।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই রকমই ওর বাসনা।' মা অনিশ্চিতভাবে মাথা নেড়েছিলেন, 'দেখি কতদূর কী হয়। আমাদের অবস্থা তো আপনি জানেন—'

খুক খুক করে খানিক কেশে দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে হীরুর বাবা বলেছিলেন, 'বলছিলাম আপনাদের আশীর্বাদে আমার তো অভাব নেই। অনেকগুলো টাকা ব্যাঙ্কে পড়ে পড়ে পচছে। আপনি যদি অনুমতি দ্যান—'

মা মুখে কিছু বলেন নি, পরিপূর্ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে ছিলেন। আশ্চর্য, নিজের অজান্তে কখন যেন তাঁর মাথা থেকে ঘোমটাটা খসে পড়েছিল।

হীরুর বাবা সে সব লক্ষ্য করেন নি। আপন মনে তিনি বলে যাচ্ছিলেন, 'আমার বড় ইচ্ছে, এখন থেকে বকুর পড়াশোনার যা খরচ লাগে, আমিই দেব। মানে আপনি কথা দিয়েছেন, এখন থেকে বকু তো আমার ছেলের মতনই। ছেলের মতন কেন, ছেলেই। এতদিন আমার এক ছেলে ছিল। এখন থেকে দুই ছেলে।'

মা এবারও নিশ্চুপ। মুখখানা ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠেছিল তাঁর। চোখ দুটি স্থির, নিষ্কম্প। ঠোঁট শক্তবদ্ধ। নাকের কাছটা খুব কাঁপছিল। মায়ের দিকে তাকিয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম। বুঝতে পারছিলাম, তাঁর অদৃশ্য গভীরে কোথায় যেন নিদারুণ আলোড়ন চলছে।

হীরুর বাবা নিজের মনেই বলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হয়েছিল, মা একেবারে নীরব। একটি কথাও তিনি বলছেন না।

হীরুর বাবা হঠাৎ থমকে গিয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। একটু ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি তো কিছুই বলছেন না।'

'কী বলব, ভাবছি।' এতক্ষণে মায়ের গলার স্বর ফুটেছিল।

'তবে কি—'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন।' কঠিন স্বরে মা বলেছিলেন, 'আপনার এই ইচ্ছেটা কিন্তু পূরণ হবার নয়।'

'মানে, আপনি—' থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন হীরুর বাবা।

মাকে অবিচলিত দেখিয়েছিল। হীরুর বাবার মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তিনি বলেছিলেন, 'আপনি আমাদের সংসারের সব খবর জানেন না, জানা সম্ভবও নয়। আমার পক্ষে বলাও অসম্ভব। ম্যাট্রিক পর্যন্ত কিভাবে বকুর পড়াশোনা চলছে তা আমিই জানি। যাই হোক, একটা কথাই শুধু আমার বলবার আছে, লেখাপড়ার ব্যাপারে বকুকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে, একটা প্রাইভেট টিউটর পর্যন্ত ওর ছিল না।'

ঠিক এই সময় আহত মুখে দাদু বলে উঠেছিলেন, 'দাদাভাইয়ের জন্যে আমি কিন্তু টিউটর রাখতে চেয়েছিলাম, তুই-ই রাখতে দিস নি।'

শান্ত গম্ভীর গলায় মা বলেছিলেন, 'কেন রাখতে দিইনি তা তুমি খুব ভাল করেই জানো বাবা।' বলেই হীরুর বাবার দিকে ফিরেছিলেন, 'বকুকে চিরদিন আমি কষ্টের ভেতর রেখেছি। আমার ধারণা কষ্টের ভেতর থাকতে থাকতে নিজের ওপর ও ভরসা করতে শিখেছে। আত্মবিশ্বাস এসেছে ওর। আমার প্রার্থনা, নিশ্চিন্ততা আর আরামের লোভ দেখিয়ে ওর নিজের নির্ভর করার শক্তিটা নষ্ট করে দেবেন না। তা ছাড়া—'

'কী?'

'দেবার সময় যখন আসবে তখন নিশ্চয়ই ওকে দেবেন, আমি আপত্তি করব না।'

এরপর অনেকক্ষণ নতচোখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন হীরুর বাবা। মনে হয়েছিল, খুব ক্ষুণ্ণ হয়েছেন তিনি। কিন্তু খানিক পর যখন মুখ তুলেছিলেন আমি হতবাক। মনে আছে, অসীম শ্রদ্ধা আর সম্ভ্রমে সে মুখ মাখামাখি।

হীরুর বাবা বলেছিলেন, 'ঠিকই বলেছেন আপনি। এতদিনে বুঝতে পারলাম বকুর বড় হবার, ভাল হবার শক্তিটা কোথায়। এমন মা না হলে ছেলে অমন হতে পারে!'

মা লজ্জা পেয়ে গিয়েছিলেন। আরক্ত মুখে তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিলেন, 'কি যে বলেন! বকু যদি কিছু করে থাকে তা করেছে আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে আর ঈশ্বরের দয়ায়।'

হীরুর বাবা বলেছিলেন, 'আপনার এ কথাটা আমি কিন্তু মানতে পারলাম না। বকু ভাল হয়েছে আপনার জন্যে।' একটু থেমে আবার শুরু করেছিলেন, 'দেখুন, আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে। ওভাবে বকুকে পড়ানোর কথাটা বলা আমার উচিত

হয়নি। তবে এটুকু বলতে পারি, কিছু না ভেবেই আমি বলেছি। আপনি এ কথা মনে করে রাখবেন না। এর জন্যে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।'

মা তাড়াতাড়ি জিভ কেটে বলেছিলেন, 'ছি-ছি, ক্ষমার কথা বলে আমাকে অপরাধী করবেন না। বকুকে আপনি স্নেহ করেন, সেই জন্যেই তো বলেছেন। ওতে কিছু অন্যায় হয়নি।'

'আপনি তা হলে রাগ করেন নি তো?'

'আরে না-না, রাগ করলে আপনাকে ফিরিয়েই দিতাম।'

'আমি নিশ্চিন্ত হলাম।' হীরুর বাবা বলেছিলেন, 'অনুমতি করুন, এবার তা হলে চলি।'

এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন দাদু। হঠাৎ ব্যস্তভাবে বলে উঠেছিলেন, 'তাই কখনো হয়।'

অবাক হয়ে ফিরে তাকিয়েছিলেন হীরুর বাবা। বলেছেন, 'আপনি আমাকে কিছু বলবেন?'

'অবশ্যই।'

'কী?'

'মেয়ের সম্বন্ধ করতে তো এসেছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'মেয়ের বাপ কী জানেন?'

'কী?'

'ফাঁসির আসামী।'

দাদুর বলার ভঙ্গিতে সবাই হেসে উঠেছিল। হীরুর বাবা সকৌতুকে বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই ফাঁসির আসামী। এখন কী শাস্তি নিতে হবে বলুন।'

'মিষ্টিমুখ করে যেতে হবে।'

'এই শাস্তি! বেশ আমি মাথা পেতে নিলাম। এখন সন্দেশ-রসগোল্লা যা খুশি. আনুন।'

মিষ্টি খেয়ে হীরুর বাবা একসময় চলে গিয়েছিলেন। মা আর দিদিমা রান্নাঘরে গিয়েছিলেন দুপুরের খাওয়া সারতে। আর হীরুর বাবাকে সদর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে দাদুর সঙ্গে তাঁর ঘরখানিতে ফিরে এসেছিলাম।

হঠাৎ দাদু বলে উঠেছিলেন, 'সাবাস ভায়া, সাবাস।'

চমকে বলেছিলাম, 'কী বলছ?'

প্রসন্ন কৌতুকের ছটা দুই ঠোঁটের মধ্যে ধরে রেখে দাদু বলেছিলেন, 'দশ বছরের ছোটাছুটি এতদিনে তা হলে সার্থক হল, না কি বলিস ?'

'মানে ?'

দাদু বলেছিলেন, 'দেখালি বটে ভাই।'

'কী আবার দেখালাম ?'

'সত্তর বছর বয়েস হতে চলল। নিজেও ভালবেসে তোর দিদিমাকে বিয়ে করেছিলাম কিন্তু এমন প্রেম আর কখনও দেখিনি।'

'কী বলছ যা-তা।'

'যা-তা ?'

'নয় তো কী ?'

'যা-তা নয় রে, যা-তা নয়।' সস্নেহে আমার কাঁধে একখানা হাত রেখে দাদু বলেছিলেন, 'আগাগোড়া সবটা মনে করে ত্থাখ। দশ বছর আগে স্কুলে ভর্তি হয়ে হীরুদের বাড়ি গেলি। তারপর থেকে শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, রোদ নেই, বৃষ্টি নেই রোজ ওদের বাড়ি যাওয়া চাই। আমরা ভাবতাম বন্ধুর জন্যেই বুঝি এত টান। ও মা, শেষ পর্যন্ত ঝুলির ভেতর থেকে বন্ধুর একটা বোনও বেরিয়ে পড়ল। সেই বোন তখন আর কতটুকুন! ছ-সাত বছর মোটে বয়েস—একেবারে কুঁড়ি। কুঁড়ি থেকে একদিন সে কিশোরী হল, কিশোরী থেকে যুবতী। 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া' যেতে লাগল। আর ভায়ার আমার কুমারী-ভজন চলতে লাগল। একটা নয়, দুটো নয়, দশ-দশটা বছর একনিষ্ঠ তপস্যার পর শ্রীমান চিরন্তন গঙ্গোপাধ্যায়, সাবর্ণ গোত্র, কুলীন ব্রাহ্মণ—শেষ পর্যন্ত আজ বরলাভ করিল।'

মনে আছে, আমি আর বসে থাকতে পারিনি। আরক্ত মুখে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম।

সাত

আরো একটা কথা মনে পড়ে, হীরুর বাবা সেই যে আমাদের বাড়ি এসেছিলেন তারপর থেকে ওঁদের বাড়ি যাওয়া একরকম ছেড়েই দিয়েছিলাম। ভয়ানক লজ্জা করত আমার।

কিন্তু না গিয়ে কি নিস্তার আছে। হীরু এসে একেক দিন জোর করে ধরে নিয়ে যেত। একা পেলে ঝুলন বলত, 'আজকাল আসো না কেন ?'

বলতাম, 'কেন আসি না, বুঝতে পার না ?'

আধবোজা চোখে মধুর একটু হাসি মাখিয়ে থুতনিটা ওপর দিকে তুলে কেমন

করে যেন হাসত ঝুলন। মাথাটা অল্প অল্প নাড়িয়ে বলত, 'না।'

'আহা, আমার লজ্জা করে না বুঝি?'

'করুক গে। তুমি না এলে আমার ভাল লাগে না। তুমি আসবে, আসবে, আসবে। বল, আসবে?' ঝুলন জেদ ধরে বলত।

মুখ নামিয়ে আস্তে করে বলতাম, 'সবাই কী মনে করবে!'

'কিচ্ছু মনে করবে না। আর যদি করে, করবে। পুরুষমানুষ হয়ে তোমার অত লজ্জা কিসের। আসবে তুমি, আসবে কিন্তু।'

'দেখি।'

'দেখি না, বল আসবে।'

'আসব।'

বলে আসতাম বটে কিন্তু পরের দিন প্রতিশ্রুতিটার কথা মনে হলেই ভেতরে ভেতরে কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে যেতাম। হাজার ইচ্ছে থাকলেও চীরুদের বাড়িটার দিকে পা বাড়াতে পারতাম না। আর এক পা বাড়ালেও তিন পা আসতাম পিছিয়ে।

চীরু এসে যদি উদ্ধার করত তো ভালই। নইলে বাড়ির ভেতরেই সারাদিন অস্থির পায়ে ঘুরে বেড়াতাম। দাদু ঠাট্টায় ঠাট্টায় আমার প্রাণান্ত করে ছাড়তেন, 'কি রে ভাই, অমন ছটফটানি কেন? দু পা গেলেই তো শ্রীরাধিকের কুঞ্জ। চলে যা, এক ছুটে সেখানে গিয়ে হাজির হ। প্রাণ জুড়োবে।'

পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে প্রায় সপ্তাতিনেক। কলেজে ভর্তির ব্যাপারে আর দেরি করা উচিত নয়। অতএব সে ব্যবস্থাও হয়েছিল। দক্ষিণে রাজধানী কলকাতায় না গিয়ে উত্তরে জেলা শহরের দিকে চলে গিয়েছিলাম।

মনে পড়ে, যাবার আগের দিন ঝুলনদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। চীরু এসে নিয়ে যাবে সেই আশায় সেদিন আর বসে থাকিনি। নিজে থেকেই চলে গিয়েছিলাম।

চীরুর বাবা বলেছিলেন, 'এত ভাল রেজাল্ট করে শেষ পর্যন্ত ডিস্ট্রিক্ট টাউনে গেলে? কলকাতার যে কোন বড় কলেজ তোমাকে আদর করে নিত।'

বলেছিলাম, 'কলকাতার কলেজে অনেক খরচ। ডিস্ট্রিক্ট টাউনের কলেজে অনেক সুবিধে পাওয়া যাবে। থাওয়া, থাকা, মাইনে—সব কিছুই ফ্রী। মায়ের ইচ্ছে, আমি ওখানে থেকেই পড়ি। মা বলেছেন, আমি যদি মন দিয়ে পড়ি যে কোন কলেজ থেকেই ভাল রেজাল্ট করতে পারব।'

ঈশ্বর বাবা এবার ব্যস্তভাবে অত্যন্ত সম্ভ্রমের সুরে বলেছিলেন, 'সে তো বটেই। তোমার মা যখন বলেছেন তার ওপর কথা নেই।'

সবার আড়ালে বাগানের সেই ঝাউবনে আমাকে ডেকে নিয়ে ঝুলন বলেছিল, অতদূরে তুমি চলে যাবে, আমার ভারি খারাপ লাগছে।' গলার স্বর ভারী আর কাঁপা কাঁপা। ঠোঁটদুটি তার স্ফুরিত দেখাচ্ছিল আর চোখদুটি বর্ষণোন্মুখ।

'অতদূরে কোথায়! ট্রেনে মোটে তিন ঘণ্টার পথ।' আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম।

ঝুলন বোঝেনি। অবুঝ অবোধ বালিকার মত জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলেছিল, 'আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছে।' বলতে বলতে সত্যিই কেঁদে ফেলেছিল সে। স্বর্ণাভ পাপড়ির মত চোখের দীর্ঘ পাতা দুটি ভিজে গিয়েছিল। আর গাল বেয়ে প্রথমে ফোঁটায় ফোঁটায়, অবশেষে ঢল নেমেছিল।

সেদিন আমি অনভিজ্ঞ প্রণয়ী, কাজেই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। প্রথমটা কী করব, কিভাবে ঝুলনের এই কান্না থামাব, বুঝে উঠতে পারিনি। তারপরেই বুকের ভেতর ভাঙচুর শুরু হয়ে গিয়েছিল। হৃৎপিণ্ডে রক্তের কল্লোল অশ্রান্ত হয়ে উঠেছিল। আত্মবিস্মৃত এক ঘোরের মধ্যে ঝুলনকে বুকে টেনে এনে রক্তাভ ঠোঁটে নিজের উত্তপ্ত তৃষ্ণার্ত ঠোঁট চেপে ধরেছিলাম। সজ্ঞানে নয়, যেন নিশি-পাওয়া এক আচ্ছন্নতার মধ্যে আমি এসব করেছিলাম। চেতনাটা কি এক অতল তলে একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছিল। আর সেই নিমজ্জিত অস্তিত্বের মধ্যে বুঝতে পারছিলাম, ঝুলনের মুখ থেকে সুখকর উষ্ণতা আমার রক্তে রক্তে সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে।

ঝুলনকে সেই আমার প্রথম চুম্বন, প্রথম স্পর্শ। প্রথম স্পর্শের সুখ এবং স্বাদ ঝুলনের সত্তার ভেতরেও বুঝিবা ছড়িয়ে পড়েছিল। চোখদুটি তার আধ-বোজা, স্থির। হাত-পা-আঙুল—শরীরের প্রত্যঙ্গগুলি বিচিত্র আবেশে স্খলিত। আমার বুকের ভেতর ঝুলন কাঁপছিল, তার হৃৎপিণ্ডের দ্রুত উত্থান পতন অনুভব করতে পাচ্ছিলাম।

দু'জনের সেই আচ্ছন্ন ভাব কিছুটা কেটেছিল পাখিদের চেঁচামেচিতে। মনে আছে, সেটা বিকেল আর সন্ধ্যের মাঝামাঝি একটা সময়। ঝাউবনে লম্বা লম্বা পায়ে ছায়া নেমে এসেছিল। একটু পরেই সন্ধ্যে হয়ে যাবে—ছায়াটা তারই মহড়া দিয়ে যাচ্ছিল যেন।

আর সারাদিনের ক্লান্তি গায়ে মেখে পাখিরা ঝুলনদের বাগানে এবং ঝাউবনে তখন ফিরে আসতে শুরু করেছে। তাদের অবিশ্রান্ত চেঁচামেচি আর ডানার শব্দে আত্মবিলুপ্ত বিহ্বলতার জগৎ থেকে ঝুলন আর আমার চেতনা একটু একটু করে

আবার ভেসে উঠেছিল। ঝুলনকে ছেড়ে দিয়ে চকিতে দূরে সরে গিয়ে বসেছিলাম।

তারপর দু'জনে অনেকক্ষণ আর কথা বলতে পারিনি। এমন কি পরস্পরের দিকে তাকাতেও না। শুধু দুরন্ত এক রক্তোচ্ছ্বাস ক্ষণে ক্ষণে আমার মুখের রং বদলে দিয়ে যাচ্ছিল।

অনেক—অনেকক্ষণ পর প্রথমে ঝুলনই তাকিয়েছিল আমার দিকে। তা-ও পরিপূর্ণ স্বচ্ছন্দ দৃষ্টিতে নয়, আরক্ত মুখে আধেক-বোজা সলজ্জ চাউনিতে। তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিয়েছিল সে, আর দু-হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছিল। অকুণ্ঠহাসিনী সাবলীলা মেয়েটা সেই মুহূর্তে আশ্চর্য ব্রীড়াময়ী। জীবনে মেয়েরা একবার—মাত্র একবারই বুঝি এরকম হাসতে পারে।

আচ্ছন্নতা সেদিন পুরোপুরি কাটেনি। তবু তারই মধ্যে একসময় ঝুলন বলে উঠেছিল, 'জেলা শহরে তো চলে যাচ্ছ, আমাকে কিন্তু দু'দিন পর পর চিঠি দিতে হবে।'

'দুদিন পর পর?'

'হ্যাঁ। বল, লিখবে?'

বলতে হয়েছিল, 'লিখব।'

'আর—'

'কী?'

'শনিবার ক্লাস করেই সোজা বিবিবাজারে চলে আসবে। স্টেশন থেকে—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে গিয়েছিল ঝুলন।

'কী?' আমি উন্মুখ হয়েছিলাম।

'স্টেশন থেকে সোজা আমাদের বাড়ি চলে আসবে। আমার সঙ্গে দেখা করে তবে তোমাদের বাড়ি যেতে পাবে।'

'তা কি করে হবে?'

'হবে না কেন?'

'আমার মা রাগ করবেন।'

'করবেন না। আমি বলছি, করবেন না। তুমি আসবে, আসবে, আসবে।' জোরে জোরে মাথা নেড়েছিল ঝুলন। সেই শৈশব থেকেই জানি, এভাবে মাথা নাড়াটা ঝুলনের জেদ এবং আবদারের প্রকাশ। এমনভাবেই কাম্য সব কিছু সে আদায় করে নিত।

ঝুলনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘোরের মধ্যে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। তখন পর্যন্ত বিড়ি-সিগারেট খাইনি, এমন কি সুপুরি পর্যন্ত না। আর মদ খাওয়া দূরে

থাক, চোখেও দেখিনি। তবু বাড়ি ফেরার পথে সেদিন মনে হয়েছিল, সমস্ত শরীর যেন টলছে, দুলছে। ভয়ানক রকমের নেশা করে আমি যেন মাতাল হয়ে গেছি। জীবন-রহস্যের প্রথম বিচিত্র নেশা। নেশার জিনিস কিছু না খেয়েও যে বুঁদ হওয়া যায়, অতলে ডুবতে পারা যায়, কে তা জানত। জগতে নেশারও কত রকমফের।

স্বাভাবিকভাবে সেদিন হাঁটতে পারিনি। স্খলিত পায়ে টলতে টলতে, এক-সময় বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। আমার চারপাশে কিছুই সেদিন স্থির ছিল না, আকাশ-পাতাল-পৃথিবী—সব সেদিন অস্থির, দোলায়িত, বিচিত্র ঢেউয়ের মাথায় কাঁপছিল।'

আট

ঝুলনদের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে যেদিন এলাম, তার পরের দিনই জেলা শহরে চলে গিয়েছিলাম।

বলতে ভুলেছি, হীরুও ঐ বছর ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। খুব ভাল রেজাল্ট করতে পারেনি. কোনরকমে সেকেণ্ড ডিভিসনটা পেয়েছিল।

হীরুর বাবার ইচ্ছে ছিল, হীরু কলকাতায় গিয়ে পড়ুক। হীরু কিন্তু যায়নি। সোজা আমার সঙ্গে জেলা শহরে চলে এসেছিল। হোস্টেলে একই ঘরে দু'জনে দু-খানা খাটিয়া পেতে নিয়েছিলাম। দশ বছর যার সঙ্গে চলছে ফিরছে, তার কাছ থেকে কলকাতার প্রলোভন সত্ত্বেও নিজেকে সরিয়ে নিতে চায়নি সে। হীরু সত্যি-কারের বন্ধু। বন্ধুত্বের মর্যাদা সে দিতে জানত।

জেলা শহর থেকে দুদিন পর পর নিয়মিত চিঠি লিখে গেছি। সপ্তাহের শেষ শনিবারের সন্ধ্যেয় বিবিবাজারে পৌঁছেই স্টেশন থেকে সোজা ঝুলনদের বাড়ি চলে যেতাম। দোতলার বারান্দায় উন্মুখ হয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করত ঝুলন। গেটের কাছে আমাকে দেখামাত্র তার চোখেমুখে বিচিত্র দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ত। সেই দীপ্তিটা যেন অলৌকিক স্পর্শাতীত কিছু। প্রাণের অথৈ গভীর থেকে একটা রুপোলী মাছের মত সেটা লাফ দিয়ে উঠে আসত বুঝি।

মুখচোখের সেই আলো আর উজ্জ্বল মৃদু হাসি দিয়ে প্রতি শনিবার ঝুলন আমাকে পথ থেকে বরণ করে নিয়ে যেত।

মনে আছে, জেলা শহরে পৌঁছে প্রথম চিঠি আমিই লিখেছিলাম। জীবনে ঝুলনকে সেই আমার প্রথম চিঠি।

লিখতে গিয়ে হাতটা বার বার কেঁপে গিয়েছিল। অদ্ভুত লজ্জায় সমস্ত অস্তিত্ব আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। বিচিত্র এক শিহরণ কি যেন আবেশে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

ঝুলনকে জীবনে সেই আমার প্রথম চিঠি। শুরু করেছিলাম 'সুচরিতাসু' দিয়ে। সম্বোধনটা মনঃপূত হয়নি। কেটে নতুন করে লিখেছিলাম 'প্রিয়তমাসু'। শেষ করেছিলাম 'ইতি-চিরন্তন' লিখে। অবহেলার বকু নামটা লিখিনি, গালভরা ধ্বনি-পোশাকী নামটা লিখেছিলাম।

কিন্তু 'ইতি-চিরন্তন' প্রাণের তারে ঝঙ্কার তুলতে পারেনি। 'ইতি-চিরন্তন সুতরাং 'তোমারই চিরন্তন' হযে দাঁড়িয়েছিল।

কোন মেয়েকে জীবনে প্রথম চিঠি লেখার স্বাদ উগ্র উত্তেজক নেশার মত। সেই নেশায় ক'টা দিন বিভোর হয়ে ছিলাম।

দুদিন পর পর ঝুলনের চিঠি লেখা আর শনিবার শনিবার বিবিবাজারে ফেরা—এইভাবেই মসৃণ নিয়মে দুটো বছর কেটে গেছে।

এর মধ্যে ইণ্টারমিডিয়েটের ফাইন্যাল হয়ে গিয়েছিল একদিন। রেজাল্টও বেরিয়ে গিয়েছিল। ম্যাট্রিকুলেশনের মত এবারও আমি ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়েছিলাম।

নয়

ইণ্টারমিডিয়েটের পর বি এস-সি। জেলা শহরের সেই কলেজেই থার্ড ইয়ারে তখন পড়ছি, জীবনটা একই স্রোতে একই ঢেউয়ের উত্থান-পতনে বয়ে চলেছে। তার ধারাবাহিকতায় কোন যতি নেই, ক্রমভঙ্গ নেই। তেমনই শনিবারে বিবিবাজারে ফেরা, তেমনই দুদিন পর পর ঝুলনকে চিঠি লিখে যাওয়া।

মনে পড়ে, হীরুও ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করে ঐ কলেজেই বি এস-সি পড়ছিল। একই সঙ্গে আমরা থাকতাম, হোস্টেলের সেই ঘরখানায় দু'জনে একরকম চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই করে নিয়েছিলাম।

প্রতি সপ্তাহে আমি বিবিবাজারে আসতাম বটে, হীরু কিন্তু আসত না। জেলা শহরেই থেকে যেত। ফুটবল, ক্রিকেট, ডিবেটিং, কলেজ সোশ্যাল—ইত্যাদি ইত্যাদি নানা পিছুটান ছেড়ে তার পক্ষে বিবিবাজারে ফেরা প্রায় অসম্ভব ছিল।

আমি প্রতি সপ্তাহেই হীরুকে বিবিবাজারে আসার জন্য বলতাম। হীরু একেকটা অজুহাতে আসাটা স্থগিত রাখত। বলত, 'এ সপ্তাহে ফিজিক্স ডিপার্টমেণ্টে একটা

সমপোজিয়াম আছে। সেটা অর্গানাইজ করতে হবে। কলকাতা থেকে একজন নামকরা অধ্যাপককে আনতে যাব। এ সপ্তাহে বাড়ি যাওয়া হল না। আসছে সপ্তাহে ঠিক যাব।'

আমি যদি কখনও বাড়ি ফেরা নিয়ে রাগারাগি করতাম, হীরু হাসত।

বলতাম, 'হাসছিস যে?'

হীরু বলত, 'প্রতি সপ্তাহে বাড়ি যাওয়া আমার পোষাবে না।'

'কেন, আমি যাচ্ছি না?'

'তুমি তো যাবেই।' চোখ মটকে কেমন করে যেন হাসত হীরু।

আমার চোখ কিন্তু কুঁচকে যেত। বলতাম, 'মানে?'

হীরু এবার উঠে এসে আমার কাঁধে একখানি হাত রেখে বলত, 'ব্রাদার, তোমার ধ্যানজ্ঞান তো ঐখানেই পড়ে আছে। আমি যেমন বোনটাকে তোর হাতে তুলে দিয়েছি, তেমন করে কেউ যদি একটা বোন আমার হাতে তুলে দিত, দেখতিস সপ্তাহে দু-বার বিবিবাজারে ছুটতাম।'

আমার কান লাল হয়ে উঠত। জড়িত স্বরে বলতাম, 'তুই ভারি অসভ্য।'

হীরুর মুখের একটি রেখাও স্থানচ্যুত হত না। দুষ্টুমির হাসিটা তেমনই লেগে থাকত। আগের মতই চোখ মটকে মটকে হীরু বলত, 'বিয়ে হলে তুই শালা আদর্শ স্বামী হতে পারবি। বোনটার আমার কপাল ভাল।'

আমার কানের রক্তাভা আরো বেড়ে যেত। কাঁধ থেকে হীরুর হাতটা ঠেলে দিয়ে কোনরকমে বলতাম, 'যা!'

আমরা পড়তাম জেলা শহরে। ওদিকে ঝুলনও ম্যাট্রিক পাশ করে বিবিবাজারের পাশের শহরে মিশনারীদের উইমেন্স কলেজে ভর্তি হয়েছিল। ইণ্টারমিডিয়েট আর্টস, ফার্স্ট ইয়ার। ট্রেনে যাতায়াত করত না ঝুলন, ফীটনে করে কলেজে যেত।

মনে আছে, তৃতীয় বর্ষের মাঝামাঝি একটা সময় সেবারের শনিবারটা আর রবিবারের খানিকটা রাত পর্যন্ত বিবিবাজারে কাটিয়ে যথারীতি জেলা শহরে ফিরে আসার জন্য স্টেশনে এসেছিলাম। আর এসেই ট্রেনটা ফেল করে বসলাম। এর পরের ট্রেন রাত এগারোটায়, সেটাই আমার গন্তব্যের লাস্ট ডাউন ট্রেন।

একবার ভেবেছিলাম, সন্ধ্যের ট্রেনটা যখন ধরাই গেল না, তখন বাড়িই ফিরে যাই। পরের দিন ফিরে প্রথম দুটো ক্লাস করা যাবে না। অথচ সে দুটো অনার্সের খুব জরুরী ক্লাস, না গেলে খুবই ক্ষতি হবে। অতএব বাড়িতে না ফিরে লাস্ট ডাউন ট্রেনের জন্য স্টেশনেই বসে ছিলাম।

অবশেষে ট্রেন আসতে একটা কামরায় উঠে পড়েছিলাম। এমনিতে সারাদিন

ট্রেনগুলোতে খুব ভিড থাকত না। কিন্তু রাতের এই লাস্ট ডাউন ট্রেনটার চেহারা আলাদা। ভোর রাতের ট্রেন বোঝাই হয়ে যারা মাছ দুধ ছানা আনাজ নিয়ে কলকাতায় যেত, এই ট্রেনেই তারা ফিরত। রাশি রাশি শূন্য ঝাঁকা আর মানুষ একাকার হয়ে বসে ছিল। মানুষ আর মালপত্রের ঠাস বুননের ভেতর কোনক্রমে এককোণে বসার একটু জায়গা করতে পেরেছিলাম।

সময়টা ছিল পঞ্চম ঋতুর শুরু অর্থাৎ পৌষ মাস। বাইরে ঘন কুয়াশার তলায় পৃথিবী কবরের মত আড়ষ্ট হয়ে ছিল, আর ছিল মারাত্মক ঠাণ্ডা বাতাস। উত্তর থেকে দক্ষিণে সাঁই সাঁই ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছিল সে।

শীতের বাতাসে নাকি দাঁত বেরোয়। শরীরে তার ছেঁায়া লাগলে মনে হয়, কেটেই বসল বুঝি। কাজেই কামরার সবগুলি দরজা-জানালা ক্রমশ রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দরজাগুলোর সামনে ঝাঁকার পাহাড সাজিয়ে কামরাটাকে দুর্ভেদ্য করে তোলা হয়েছিল।

এভাবে দরজা জানালা বন্ধ করে রাখা লোকাল ট্রেনের রীতি নয়। দু-পাঁচ মিনিট ছুটতে না ছুটতেই একটা করে স্টেশন। প্রতি স্টেশনে সে থামবে, কিছু যাত্রী নামাবে, কিছু কুডোবে—তারপর আবার উর্ধ্বশ্বাসে দৌড।

আমাদের সেই ট্রেনটা জেলা শহর ছুঁয়ে আরো অনেকদূরে মুর্শিদাবাদের সুদূর অভ্যন্তরে চলে যাবে। তার নিয়ম ছিল একেবারে উল্টো। তখন তার সব কামরাতেই দরজা আঁটা। সেটা অকারণে নয়। প্রথমত, শীতের বাতাস তো ছিলই। দ্বিতীয়ত, কামরাগুলো মানুষ এবং মালপত্রে আকণ্ঠ ঠাসা। আর কোন মানুষ তো দূরের কথা, তিল ধারণের জায়গা পর্যন্ত কোথাও ছিল না। তৃতীয়ত, আমার মত দু-চারজনকে বাদ দিলে অন্য সবাই মুর্শিদাবাদের যাত্রী। লাস্ট ট্রেন নিতান্ত নিয়ম রক্ষার জন্যই স্টেশনগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। মাঝখান থেকে কোন যাত্রী ওঠার সম্ভবনা খুব কম। ওঠা নামার হাঙ্গামা নেই, কাজেই চারিদিক বন্ধ করে অনায়াসেই পরিপাটি একটি নিদ্রা দেওয়া যায় এবং সেটাই সঙ্গত। আমাদের ট্রেনটাও ধীরে ধীরে অতল ঘুমে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল।

মনে আছে, সেদিনের লাস্ট ডাউন ট্রেন নির্বিঘ্নে তিনটে স্টেশন পার হয়ে গিয়েছিল। চতুর্থ স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে না ঢুকতেই বিচিত্র একটা ব্যাপার ঘটেছিল। বন্ধ দরজার ওপর ক্রমাগত ধাক্কা শুরু হয়েছিল। সেই সঙ্গে একটি মেয়ের ব্যাকুল কণ্ঠস্বর শোনা গেছে, 'দরজা খুলুন, দরজা খুলুন—শিগ্গীর, এক্ষুনি ট্রেন ছেড়ে দেবে।'

বসে থাকতে থাকতে গাড়ির দোলানিতে আমার তন্দ্রামত এসেছিল। মেয়েটির

ডাকাডাকিতে হঠাৎ সেটা ছিঁড়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, ভয়ার্ত উত্তেজনায়, নাকি শীতে বাইরের প্ল্যাটফর্মে সেই স্বরটা অস্বাভাবিক কাঁপছে।

দরজার কাছে যে পাহাড়-প্রমাণ আনাজের ঝাঁকাগুলো রয়েছে তার এক পাশে কাঁথা মুড়ি দিয়ে একটা মধ্যবয়সী গেঁয়ো লোক নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিল। শুধু কি সে-ই, সমস্ত কামরাটাই নিবিড় ঘুমে অসাড়। একটি মেয়ের দুর্বল হাতের ধাক্কা আর ততোধিক দুর্বল কণ্ঠের ডাকাডাকি শীতের রাতের নিবিড় গভীর অতল নিদ্রা ভাঙাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

প্ল্যাটফর্ম থেকে মেয়েটির গলা অবিরাম শোনা যাচ্ছিল, 'কি আশ্চর্য, খুলুন—খুলুন। আর দেরি করলে— কি আশ্চর্য! এই ট্রেনে যেতে না পারলে—দয়া করে খুলুন।'

আমার তন্দ্রার শেষ রেশটুকুও কেটে গিয়েছিল। মেয়েটির কণ্ঠস্বরের উত্থান-পতন আমার বুকের মধ্যে ধরিয়ে ধরিয়ে যাচ্ছিল। সেই স্বরে ভয় আর উত্তেজনা তখন শীর্ষবিন্দুতে উঠেছে।

প্রথমটা কী করব, স্থির করে উঠতে পারিনি। দিশেহারার মত এদিক সেদিক তাকাচ্ছিলাম। কোনদিকেই কারো যখন ঘুম ভাঙার আভাস পাওয়া যায়নি তখন একরকম লাফ দিয়েই উঠে পড়েছিলাম। দরজার কাছে গিয়ে সেই ঘুমন্ত লোকটাকে এক টানে তুলে দিয়ে ক্ষিপ্র হাতে আনাজের ঝাঁকাগুলো সরিয়ে দরজাটা খুলে দিয়েছিলাম।

হ্যাঁচকা টানে আচমকা ঘুম ভাঙাতে ভয় পেয়ে লোকটা খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'কী, কী ব্যাপার?'

তার চেঁচামেচিতে কামরাটা মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠেছিল। কাঁথা-কম্বল কি বস্তা চাপা দিয়ে এ প্রান্তে সে প্রান্তে আনাজের ঝাঁকার ফাঁকে ফাঁকে যারা ঘুমিয়ে ছিল ধড়মড় করে তারা সবাই উঠে বসেছে। ঘুমজড়ানো ভীত গলায় সমস্বরে বলেছে, 'কী হল? কী হল?'

এ সব প্রশ্নের উত্তর দিইনি।

এদিকে গার্ডের বাঁশি শোনা গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের হুইসিলও, এবং তার নিশ্চল দীর্ঘ দেহ চলতে শুরু করেছিল। গতি অবশ্য তখন খুব মন্থর। খুব আস্তে আস্তে প্ল্যাটফর্ম থেকে ট্রেনটা বেরিয়ে যাচ্ছিল।

আর সেইসময় একরকম লাফ দিয়ে মেয়েটি উঠে পড়েছে। হাত বাড়িয়ে যে সাহায্য করব, তার প্রয়োজন হয়নি। অবশ্য হাত বাড়াবার কথাটা আমার খেয়ালও ছিল না।

এত অনায়াসে এবং স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে মেয়েটি উঠে এসেছিল যাতে আমার মনে হয়েছে এভাবে চলন্ত গাড়িতে ওঠার অভ্যাস তার দীর্ঘকালের।

অবাক হয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মেয়েটি তখন পা-দানিতে। আর ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে অনেক দূর এসে পড়েছে, গতিবেগও বেড়েছে তার।

মেয়েটি রুক্ষ গলায় বলে উঠেছিল, 'দরজা আগলে দাঁড়িয়ে রইলেন যে। ভেতরে যেতে দেবেন না?' খানিক আগের ভয় বা উত্তেজনার চিহ্নমাত্র ছিল না সেই স্বরে। আর যত রুক্ষতাই থাক, গলাখানি ভারি সুরেলাই মনে হয়েছিল আমার। চকিত হয়ে দরজা ছেড়ে দিয়েছিলাম।

মেয়েটি ভেতরে উঠে এসেছিল। আগের মতই রুক্ষ স্বরে, ঠিক রুক্ষ নয়, তার সঙ্গে অনেকখানি বিরক্তি মিশিয়ে বলেছিল, 'এটা কি আপনাদের রিজার্ভ করা কামরা? সেই কখন থেকে ধাক্কা মারছি! কেন দরজা বন্ধ করে রেখেছিলেন? রেল অথরিটির কাছে আমি নালিশ করব।'

বোঝাতে চেয়েছিলাম, দরজা খুলে রেখে কী হবে বলুন। চেয়েই দেখুন না, ভেতরে একটু জায়গাও নেই।'

মেয়েটি ধমকে উঠেছিল যেন, 'যথেষ্ট জায়গা আছে। এখনও তিরিশ জন স্বচ্ছন্দে বসতে পারে।'

প্রতিবাদ নিরর্থক। এ কথার উত্তর দিতে গেলে তর্ক বেধে যাবে। তর্কাতর্কি আমার স্বভাববিরুদ্ধ। চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে হয়েছিল।

বিরক্ত গলায় আপন মনেই মেয়েটি বলে যাচ্ছিল, 'এই ট্রেন ধরতে না পারলে শীতের রাতে খোলা স্টেশনেই আমাকে কাটাতে হত। আশ্চর্য লোক সব! মানুষ বাঁচল কি মরল, সে সম্বন্ধে এতটুকু বিবেচনাবোধ নেই। নিজেরা আরাম করে যেতে পারলেই হ'ল।' বলে নিজেই কামরার দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

এতক্ষণ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই তার কথার জবাব দিয়ে যাচ্ছিলাম। তাকিয়েই ছিলাম কিন্তু বিশেষ কিছু বুঝতে পারছিলাম না। সেটা অকারণে নয়। কেননা, আমাদের কামরাটা ছিল বিরাট লম্বা। তার মাঝখানে খুব কম পাওয়ারের নিস্তেজ একটা বাল্‌ব জ্বলছিল। সেটা থেকে যে আলোটুকু পাওয়া গিয়েছিল কামরার অন্ধকার দূর করার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। আলো-আঁধারির বিচিত্র রহস্যময়তায় শীতের মধ্যরাত সেখানে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল।

একটি মেয়ে শীতের নিঝুম রাতে ডাকাডাকি করে ঘুম ভাঙিয়ে ভিড়ের গাড়িতে উঠেছে। তার সম্বন্ধে এর বেশি এতক্ষণ কিছু মনে হয়নি। কামরার দরজা বন্ধ করে সে ফিরে দাঁড়াতেই বিদ্যুৎ চমকের মত কিংবা সমুদ্রের দুরন্ত জলোচ্ছ্বাসের মত একটা ভাবনা অতর্কিতে আমার স্নায়ুতে আঘাত করেছিল।

প্রৌঢ় বয়সে পৌঁছে এখন কত কিছুই তো দেখতে পাই। চারপাশে কত অচলায়তন ভেঙে গেছে, কত পুরনো সংস্কার আর ধারণার মৃত্যু ঘটেছে। আজকাল চোখে পড়ে অন্দরমহলের দুর্গ ভেঙে মেয়েরা পৃথিবীর বিশাল উন্মুক্তির ভেতর বেরিয়ে এসেছে।

কিন্তু আমার যৌবনে নারীর মুক্তি ছিল অকল্পনীয়। নিশীথচারিণী এই মেয়েটিকে দেখে প্রথমে যা খেয়াল হয়নি, পরে অপার বিস্ময়ে তা আমাকে অভিভূত করে ফেলেছিল।

এমনিতেই সে যুগে কদাচিৎ পথে ঘাটে মেয়েদের দেখা যেত। বাইরে বেরুলেও সতর্ক পাহারাদার থাকত সঙ্গে। বেশির ভাগই চলাফেরা করত পাল্কির ঘেরাটোপের ভেতর। আর যারা পায়ে হেঁটে কিংবা ট্রেনে বাসে পুরুষদের মত চলত তাদের সঙ্গে থাকত হয় স্বামী, নয়ত বাবা অথবা নিকট আত্মীয় কেউ। মোট কথা শাসন আর বন্দিত্ব তাদের পায়ে পায়ে ফিরত।

কিন্তু সে যুগে মধ্যরাতে একাকিনী স্বচ্ছন্দচারিণী একটি মেয়েকে ঐভাবে দেখতে পাওয়া অভাবনীয়। যত দেখছিলাম ততই বিস্ময়টা দ্রুত শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে যাচ্ছিল।

কতক্ষণ বিভ্রান্তের মত তাকিয়ে ছিলাম, খেয়াল নেই। ইতিমধ্যে ট্রেনের গতি অনেক বেড়ে গিয়েছিল। হঠাৎ মেয়েটি অসন্তুষ্ট গলায় বলে উঠেছে, 'এ কি, রাস্তা আটকে রইলেন যে! ভেতরে যাবার পথ দিন।'

সত্যিই রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। চিরদিনই আমি ভীরু, কুণ্ঠিত। আমার স্বভাব অসীম সংকোচ দিয়ে ঘেরা। সেই মুহূর্তে নিজের কথা যেন মনে ছিল না। আত্মবিস্মৃত আমি অভব্যের মত ট্রেনের আলো আঁধারিতে একটি অপরিচিতার দিকে বিহ্বলের মত তাকিয়ে ছিলাম।

মেয়েটির কথায় লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিয়েছিলাম। তারপর ঘাড় গুঁজে কামরার দূর প্রান্তে নিজের জায়গাটিতে ফিরে এসেছি।

দূরে গিয়ে চকিতে চোখ তুলে মেয়েটিকে আর এক বার দেখেছিলাম। কামরার ঐ প্রান্ত থেকে মেয়েটিকে আরো ঝাপসা আরো রহস্যময়ী দেখাচ্ছিল।

আমি নিজের জায়গায় ফিরে যাবার পর মেয়েটি কামরার এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত বসার একটা জায়গা খুঁজছিল সে। হঠাৎ তার চোখে পড়েছিল, আমার ঠিক সামনে একটা কালো রঙের টিনের বাক্স এতগুলো যাত্রীর দৃষ্টিকে প্রতারিত করে বেওয়ারিস পড়ে রয়েছে।

দেখামাত্র মালপত্রের পাহাড় পেরিয়ে, যাত্রীদের কাউকে ডিঙিয়ে কাউকে

দাড়িয়ে, মুখে কখনও 'একটু জায়গা দিন তো,' কখনও 'পা-টা টেনে বসুন' বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত বাক্সটার কাছে পৌঁছেছিল মেয়েটি। সঙ্গে তার কিছুই ছিল না, শুধু চমৎকার একখানা ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলছিল হাতে।

কাছাকাছি আসতে অনেকটা স্পষ্টভাবে মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছিল। কামরার সেই আলোটা এসে পড়েছিল তার মুখের ওপর, ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বাঙ্গে।

ঝাপসা অন্ধকারে খানিক আগে মেয়েটিকে আবছা দেখেছিলাম। রমণীদেহের অস্পষ্ট ক'টি রেখা ফুটিয়ে সে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু এখন সে একেবারে কাছে। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যেত। সরাসরি অবশ্য তার দিকে তাকাই নি, চুরি করে দেখে নিচ্ছিলাম। যেভাবেই দেখি না, তাকিয়ে আর চোখ ফেরাতে পারিনি। আমার সমস্ত স্নায়ুর ওপর দিয়ে এস্রাজে ছড় টানার মত শব্দ করে ঝড়ের বেগে কি যেন বেজে গিয়েছিল। মুহূর্তে আমার সত্তার নিভৃত থেকে সম্মোহনের মত কি যেন একটা উঠে এসে দুর্বার ফেনায়িত তরঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল।

কত বয়েস মেয়েটির? খুব বেশি হলে উনিশ অথবা কুড়ি। অর্থাৎ আমারই সমবয়সী।

তার গায়ের রঙ স্বর্ণাভ, তার সঙ্গে পুষ্ট নিটোল পাকা ধানের উপমা অনায়াসেই চলতে পারে। পরনে তিরিশ বছর আগের ধরনে কুঁচি দিয়ে সাদা বালুচরী শাড়ি আর লম্বা ফাঁপানো হাতা-ওলা সাদা রেশমী ব্লাউজ। তার ওপর সাদা সার্জের ফ্রককোট। (কি একটা বইতে উনিশ শতকের অভিজাত ইংরেজ মহিলাদের ঐ পোশাকটা দেখেছিলাম।) পায়ের জুতোও সাদা। বাঁ হাতের কব্জিতে সাদা ব্যাণ্ডে ঘড়ি বাঁধা। ডান হাতের অনামিকায় মুক্তোবসানো দামী আংটি, গলায় মুক্তোর নেকলেশ, কানে হীরে-বসানো ইয়ার রিং। সত্যিই সারসী—শ্বেত সারসী।

মেয়েটি সুগঠনা, সুমধ্যমা, সুস্তনী। ক্ষীণ মধ্যদেশের ঊর্ধ্বলোকে সে উদ্ধত। নিচের দিকে বিপুল আবর্তাহিকা। সবই তার মেপে মেপে নিখুঁতভাবে বসানো। মাথার চুল পাতা কেটে রুপোর কাঁটা আর শ্বেত গোলাপের কুঁড়ি দিয়ে সাজানো। নাক তীক্ষ্ণ, মসৃণ গলায় শাঁখের মত তিনটি মনোরম ভাঁজ।

মেয়েটির সমস্ত বিস্ময় তার চোখে। সে চোখ যেন মানবীর নয়, দেবীমূর্তির রত্নবসানো চোখ অথবা স্বপ্নলোকের কোন পরীর অলৌকিক চোখ। সে চোখে একই সঙ্গে দূরত্ব ও আহ্বান, আশ্বাস ও অনিশ্চয়তা, প্রীতি ও বিদ্বেষ। একবার মনে হচ্ছিল সে চোখ স্থির এবং মোহময়। পরক্ষণেই ধারণা বদলে যাচ্ছিল। তখন মনে হচ্ছিল, সে চোখ অস্থির, চঞ্চল, বিতৃষ্ণায় ভরা।

যা-ই থাক, মেয়েটির সর্বাঙ্গ ঘিরে এমন দুঃসহ এক কুহক ছড়িয়ে ছিল যাতে তার

দিকে তাকিয়েই কেউ চোখ ফিরিয়ে নেবে, সাধ্য কি! বিচিত্র আকর্ষণে মেয়েটি আমার চোখ দুটিকে নিজের দিকে টেনে রেখেছিল যেন।

তার শরীরের অদৃশ্য কোনো প্রান্ত থেকে একটা গন্ধ উঠে আসছিল। গন্ধটা এমনই তীব্র, উগ্র এবং মাতাল-করা যে তৃতীয় শ্রেণীর সেই কামরার বাতাস ভারী হয়ে উঠছিল। অন্য যাত্রীদের কথা বলতে পারব না, তবে আমার মাথা ঝিম ঝিম করতে শুরু করেছিল।

আর সেই ঝিম ঝিম আচ্ছন্নতার মধ্যে চারিদিক বুঝিবা দুলতে শুরু করেছিল। আমার মনে হয়েছিল, সে যেন নারী নয়, কোন অলৌকিক যাদুকরী। মেয়েটিকে দেখতে দেখতে চকিতে ঝুলনের মুখ আমার মনে পড়েছিল।

ঝুলন যেন ছোট্ট একটি পায়রা—স্নিগ্ধ, শান্ত, মনোরম। তার কাছে গেলে সমস্ত স্নায়ু জুড়িয়ে যায়। কিন্তু ট্রেনের কামরায় পার্শ্ববর্তিনী সেই মোহময়ী যাদুকরী—সে যেন বিচিত্র সম্মোহন মন্ত্রে আমাকে নেশাগ্রস্ত করে ফেলেছিল। ধমনীতে রক্তের স্রোত ক্রমশ কল্লোলিত হয়ে উঠছিল, তারপর ফেনিয়ে ফেনিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে শিরায় শিরায় দুর্বার ঢলের মত ছুটে যাচ্ছিল। নাক-কান ঝাঁ-ঝাঁ করছিল আমার, মুখের বাইরের দিকের ত্বকে আগুনের হল্কার মত কি যেন অসহ্য তাপ এসে লাগছিল। আমার সেই কুড়ি বছরের জীবনে এমন মেয়ে আগে আর কখনও দেখেছি বলে মনে করতে পারছিলাম না।

চারদিকের স্তূপীকৃত মালপত্র, পানের পিক, বাদামের খোলা, থুতু আর অসংখ্য পোড়াবিড়ির শ্মশানের মাঝখানে মেয়েটিকে ছন্দ-পতনের মত দেখাচ্ছিল। তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় মোহময়ী এই যাদুকরী একেবারেই বেমানান। ফার্স্ট ক্লাসেই তো তার যাওয়া উচিত ছিল, এই ট্রেনে সেটাই ছিল তার উপযুক্ত জায়গা। থার্ড ক্লাসের এই কষ্টকর ঠাসাঠাসি ভিড়ে কেন যে সে চলে এসেছিল, কে তার খবর দেবে।

বাঙ্কটার এক পাশে দেওয়াল ঘেঁষে একটা খালি ঝাঁকা দাঁড় করানো ছিল। খানিকক্ষণ সোজা হয়ে বসে থাকার পর সেটার গায়ে মেয়েটি হেলান দিয়েছিল।

আমি তাকিয়েই ছিলাম। তাকিয়ে তাকিয়ে বিস্ময় আর আচ্ছন্নতা ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছিল। বিস্ময়টা একাধিক কারণে। প্রথমত, মেয়েটি আশ্চর্য সুরূপা, দ্বিতীয়ত, আশ্চর্য সাবলীল। তৃতীয়ত, অত রাত্রে শীতের সেই লাস্ট ট্রেনে একা একা কোথায় চলেছে সে? নিদারুণ এক কৌতূহল আমাকে একটু একটু করে বেষ্টন করে ফেলছিল।

আমারই শুধু নয়, মেয়েটির আবির্ভাবে এ কামরার ওপর দিয়ে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া

ঘ:ট গেছে। নির্নিমেষে মাতালের মত এ কামরার সব যাত্রী তার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর আবার কাঁথা-কম্বলের তলায় একে একে ডুব দিয়েছিল।

মেয়েটি দূরমনস্কের মত কামরার একমাত্র আলোটার দিকে তাকিয়ে ছিল। আলোটাকে ঘিরে কুয়াশা আর অন্ধকার একটা ঘোলাটে বৃত্ত বুনে যাচ্ছিল।

আলো দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার দিকে চোখ ফিরিয়েছিল সে। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। এর আগেও মেয়েটি আমাকে লক্ষ্য করেছে। কিন্তু সে দেখায় বিশ্লেষণ ছিল না, কিন্তু এবার রাগে বিরক্তিতে তার চোখ কুঁচকে গেছে।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার দিকে অনেকখানি ঝুঁকে পড়েছিল মেয়েটি। খুব আস্তে বলেছিল, 'আচ্ছা—'

আমার বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠেছিল। একবার চোখ তুলেই দ্রুত নামিয়ে নিয়েছিলাম। আবছা গলায় বলেছিলাম, 'আমাকে কিছু বলবেন?'

'হাঁ।'

'বলুন—'

'আপনাকে যেন কোথায় আগে দেখেছি। কোথায় বলুন তো?'

মেয়েটি খুবই স্বচ্ছন্দ। আমি অবাক হয়ে জড়ানো সুরে বলেছিলাম, 'কোথায় দেখেছেন?'.

মেয়েটিকে এবার অন্যমনস্ক দেখিয়েছিল। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলেছে, 'কোথায় যে দেখেছি ঠিক মনে করতে পারছি না।'

'হয়ত আমার মত আর কাউকে দেখেছেন।'

'উঁহু—' মেয়েটি মাথা দুলিয়েছিল, 'আর কাউকে না, আপনাকেই। আমার ভুল খুব কমই হয়। আচ্ছা—'

আমি সহজ বা স্বাভাবিক, কোনটাই হতে পারছিলাম না। দৃষ্টি ছিল নিচের দিকে নামানো। বলেছিলাম, 'কী?'

'আপনি থাকেন কোথায়?'

'বিবিবাজারে।'

'বিবিবাজারে!' ধনুকের মত ভ্রূহটি ঈষৎ কুঞ্চিত হয়েছিল তার, 'না, অন্য কোথাও।' বলতে বলতে হঠাৎ কি মনে পড়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল সুরে বেশ জোরেই চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'আপনি ওখানেও থাকেন তো?'

'কোথায়?'

জেলা শহরটার নাম করেছিল সে।

সবিস্ময়ে বলেছিলাম, 'হ্যাঁ, আমি ওখানকার কলেজে পড়ি, হোস্টেলে থাকি। কিন্তু—'

'কী ?'

'আপনি সে কথা জানলেন কি করে ?'

'জানলাম—' মেয়েটি বিচিত্র হেসেছিল।

আমি কি বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। একবার মনে হয়েছিল, হয়ত মেয়েটি জেলা শহরেই থাকে, আমার অজান্তে আমাকে দেখে থাকবে।

সে আবার বলেছিল, 'আপনার নাম চিরন্তন গঙ্গোপাধ্যায় তো ?'

'হ্যাঁ।' আমি অবাক।

'থার্ড ইয়ার বি. এস-সি পড়েন ?'

আরো বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। মুখ তুলে মন্ত্রচালিতের মত মাথা নেড়েছিলাম।

মেয়েটি বলেছিল, 'আপনি তো এই জেলার গৌরব। ম্যাট্রিকুলেশনে স্কলারশিপ পেয়েছেন, ইন্টারমিডিয়েটে পেয়েছেন। বি. এস-সি-তেও নিশ্চয়ই ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পাবেন।'

কোথায় পড়েছিলাম, কে যেন খড়ি পেতে ভূ-ভারতের সব খবর বলে দিতে পারত। মেয়েটি সে-ই নাকি ? আমাকে দেখেই আমার সব কথা বলে দিতে পারছিল, সে কি মায়াবিনী ?

বিমূঢ়ের মত বলেছিলাম, 'আশ্চর্য।'

'কিসের আশ্চর্য ?'

'আপনি আমার সম্বন্ধে এত খবর কোথায় পেলেন !'

'পেলাম।' মেয়েটির হাসি এবার প্রগলভ হয়েছিল, উপমা দিয়ে সে বলেছিল, 'ফুল যদি ফোটে তার গন্ধ সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে, তাকে আটকে রাখা যায় না।'

আমি চুপ।

মেয়েটি বলে যাচ্ছিল, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করার খুব ইচ্ছে ছিল। ভেবেছিলাম, কলেজ-হোস্টেলে গিয়েই আলাপটা জমিয়ে আসব। আজ অদ্ভুতভাবে তা হয়ে গেল।'

এবারও আমি কিছু বলতে পারিনি।

মেয়েটি আবার বলে উঠেছিল, 'আপনার এক বন্ধু আছে, নাম হিরণ্য চট্টোপাধ্যায়। আপনার প্রাণের বন্ধু, না ?'

'আপনাকে কে বললে ?'

'যে-ই বলুক, সত্যি কিনা ?'

'সত্যি।' আমি মাথা নেড়েছিলাম।

'আপনারা কলেজ-হোস্টেলের একই ঘরে তো থাকেন ?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করেছিল।

'হ্যাঁ।'

'বিরিবাজার থেকে আপনারা দু'জনেই শুধু এ শহরে পড়তে এসেছেন, তাই না ?'

'আমি যতদূর জানি, তাই।'

'আপনার বন্ধু হিরণ্য খুব ভাল স্পোর্টসম্যান। চমৎকার ফুটবল আর ক্রিকেট খেলতে পারে।'

'হ্যাঁ।'

'ওস্তাদ সুইমার—'

'হ্যাঁ।'

'ডিবেটারও ভাল—'

হীরু আমার ছেলেবেলার বন্ধু। বারো বছর অর্থাৎ একটা যুগ ধরে আমরা একই সঙ্গে চলেছি, ফিরেছি, বুকে একই বাতাস টেনেছি। হীরুকে খুব সম্ভব নিজের প্রাণের চাইতেও বেশি ভালবাসি। তবু একটি অপরিচিতা রূপসী মেয়ের মুখে তার প্রশংসায় আমার বুকে কোথায় যেন তাল কেটে যাচ্ছিল। নিভৃতে কোথায় বেসুর বাজছিল, বলতে পারব না। সজ্ঞানে এটুকুই শুধু ভাবতে পারছিলাম, হীরুর প্রসঙ্গ না উঠলেই বোধ হয় ভাল ছিল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার মেয়েটি শুধু আমার কথাই বলুক, আমার নাম জপুক আর চোখ নামিয়ে আরক্ত মুখে সঙ্কোচ আর শিহরণের মধ্যে তা শুনে যাই—অবচেতনে এই ইচ্ছেটুকুই বুঝি সেদিন তিরতিরিয়ে বইছিল।

সেদিন লাস্ট ডাউন ট্রেনে পাশাপাশি বসে বিচিত্র রহস্যময়ী মেয়েটির সঙ্গে আর কি কি কথা হয়েছিল এতকাল পর অত খুঁটিনাটি আজ আর মনে নেই। সময়ের ধুলোমাটি তার ওপর বিস্মৃতির চাদর টেনে দিয়েছে।

মনে পড়ে কথায় কথায় একসময় রাতের গাড়ি জেলা শহরে পৌঁছে গিয়েছিল।

জানলা খুলে স্টেশন দেখে নিয়ে মেয়েটি বলেছিল, 'এখানেই তো আপনাকে নামতে হবে।'

'হ্যাঁ।'

'চলুন, নামা যাক।'

'আপনি—' কথা শেষ না করেই থেমে গিয়েছিলাম।

মেয়েটি বলেছিল, 'আমি কী ?'

'আপনি কি এখানে থাকেন ?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন ?'

আমি থতমত। কোনরকমে ঢোক গিলে বলেছিলাম, 'এখানে না থাকলে নামা ঠিক নয়।'

'ঠিক নয় !' মেয়েটি ঠোঁট টিপে কেমন করে যেন হেসেছিল।

আমি উত্তর দিইনি।

মেয়েটি বলেছিল, 'না হয় আপনার জন্যেই এই স্টেশনে নামলাম।'

বলে কী! উদ্দেশ্য কী মেয়েটার? আমার ভীরু হৃৎপিণ্ডের মধ্যে খুব দ্রুত শিরশিরিয়ে কি যেন বয়ে গিয়েছিল। বিমূঢ় আমি, হতবাক আমি, স্তম্ভিত আমি— বিহ্বল স্বরে বলেছিলাম, 'আমার জন্যে!'

'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু—'

আমার কথা শেষ হতে দেয় নি সে। ব্যস্তভাবে বলেছিল, 'আপনার এত কথার উত্তর দিতে আর পারি না। গাড়িটা এখানে আধ মিনিটের বেশি এক সেকেণ্ড দাঁড়াবে না। সে খেয়াল যদি থাকে আর কথা না বাড়িয়ে চট করে নেমে পড়ুন।'

অপ্রতিভ হয়ে মুখ নামিয়ে নিয়েছিলাম। সমস্ত কামরাটা যেন একটা যুদ্ধ-শিবির। তাড়াতাড়ি একে ওকে ডিঙিয়ে বাঁকার পাহাড় সরিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিলাম। আমাকে অনুসরণ করে মেয়েটিও নেমেছিল।

জেলা শহরের দীর্ঘ সুবিস্তৃত প্লাটফর্মটা একেবারে জনশূন্য। লাস্ট ডাউন ট্রেন থেকে আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নামে নি। মাত্র একটি মিনিট, তারপরেই গার্ডের হুইসিল বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা চলতে শুরু করেছিল। মুহূর্তে তার দীর্ঘ সর্পিল দেহ এঁকেবেঁকে ডিসটান্ট সিগন্যাল পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

গেটের দিকে যেতে যেতে মেয়েটি বলেছে, 'আপনি তো এখন কলেজ হোস্টেলে যাবেন ?'

চকিত হয়ে তার দিকে তাকিয়েছিলাম। প্রশ্নটার পেছনে কোন উদ্দেশ্য রয়েছে কী? আমার সঙ্গে হোস্টেল পর্যন্ত যাবার ইচ্ছে নাকি?

ট্রেনের কামরায় যত স্তিমিত হোক তবু একটা আলো ছিল। মেয়েটির মুখচোখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু স্টেশনের কোথাও আলো টালো নেই। কুয়াশা আর অন্ধকার তাকে ঢেকে দিয়েছে। অতএব চোখমুখ দেখে যে মনোভাব অনু-

মান করব তার উপায় ছিল না। সভয়ে বলেছিলাম, 'হ্যাঁ, হোস্টেলেই ফিরব। জানেন—'

'কী ?'

'আমাদের হোস্টেলটা ছেলেদের। স্ট্রিক্টলি ফর্ বয়েজ।'

খুব আস্তে আলতো করে মেয়েটি বলেছিল, 'তাই নাকি ?'

কণ্ঠস্বরে বেশ খানিকটা জোর দিয়ে উত্তর দিয়েছিলাম, 'হ্যাঁ।'

এবার মেয়েটি রিনরিনে শব্দ করে হেসে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল, খুব মৃদু তালে আমার স্নায়ুতে ছোট ছোট ঢেউ তুলে জলতরঙ্গ বেজে যাচ্ছে।

চমকে উঠেছিলাম, 'হাসছেন যে!'

উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেছিল মেয়েটি, 'আপনার খুব ভয়, না ?'

'ভয়!'

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, ভয়।'

'কিসের আবার ভয় ?''

মেয়েটি আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলেছিল, 'ডাকিনীর।'

গলার ভেতর থেকে আধফোটা একটা শব্দ উঠে এসেছিল, 'ডাকিনী!'

মেয়েটি এবার আর কিছুই বলে নি।

একসময় আমরা স্টেশনের গেটে পৌঁছে গিয়েছিলাম। সেখানে টিকেট নেবার জন্য কেউ ছিল না। টিকেট কালেক্টর অথবা স্টেশন মাস্টার এই শীতের রাতে নিশ্চয়ই লেপের তলায় উষ্ণ আরামে একটি নিটোল ঘুমের ভেতর তলিয়ে গেছে। লাস্ট ট্রেনের যাত্রীদের ক'জন ফাঁকি দিয়ে পালাল, সে সম্বন্ধে তাদের আদৌ দুর্ভাবনা ছিল না। সম্ভবত তাদের বিশ্বাস, ক'টি বিনা টিকিটের যাত্রী এত বড রেল কোম্পানিকে পথে বসিয়ে দিতে পারবে না।

স্টেশনের ঠিক বাইরে খানিকটা খোলা জায়গা। দিনের বেলা ওখানে সাইকেল রিকশা আর খানকতক পুরনো মডেলের ভাঙাচোরা লঝ্ঝড় বাস দাঁড়িয়ে থাকত। জেলা শহরে বাহন বলতে তখন ঐ রিকশা আর বাস। শীতের মধ্যরাতে তাদের কিন্তু দেখা যায়নি। জায়গাটা একেবারে ফাঁকা।

না-না, একেবারে ফাঁকা নয়। হঠাৎ আমার চোখে পড়েছিল, জায়গাটার এক কোণে একটা ফীটন দাঁড়িয়ে আছে। ধবধবে সাদা ঘোড়াটা কেশর দুলিয়ে সমানে পা ঠুকে যাচ্ছিল।

এর আগে আরেকটি ফীটন দেখেছি, সেটা হীরুদের। আবছা অন্ধকারেও মনে

হয়েছিল, সব দিকে থেকেই এই ফীটনটা অনেক বেশি অভিজাত এবং দামী।

শীতের রাত্রির এই জনশূন্য স্টেশনে হঠাৎ কোত্থেকে ফীটনটা এল, ভেবে উঠতে পারছিলাম না। সব কিছুই যেন অলৌকিক মনে হচ্ছিল।

মেয়েটি পাশ থেকে ডেকে উঠেছিল, 'আসুন—'

কাঁপা গলায় বলেছিলাম, 'কোথায় ?'

'আপনার বড় বদভ্যাস, সব কথায় একটা করে প্রশ্ন করা চাই। আমি ডাকছি, চলে আসবেন। এর ভেতর 'কোথায়', 'কেন', এ-সব বললে খুব রাগ হয়।' মেয়েটির গলায় ঝাঁঝ ছিল, 'তর্ক করা, প্রশ্ন করা আমি একেবারেই পছন্দ করি না।'

নিমেষেই বুঝে নিয়েছিলাম, এই মেয়েটিকে ঘিরে বলয়ের মত বিশাল এক ব্যক্তিত্ব রয়েছে অথবা সম্রাজ্ঞীর অহঙ্কার। সে যা বলবে তাই চূড়ান্ত, তার ওপর কারো কথা চলবে না। ক্রীতদাসের মত তার আদেশ পালন করাই আর সবার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে। নইলে সে অসন্তুষ্ট হবে, বিরক্ত হবে, ক্ষুব্ধ হবে।

আমার কী হয়েছিল, বলতে পারব না। সত্তার গভীরে কী ভর করে বসেছিল, তাও জানি না। ক্রীতদাসের মতই প্রায় অপরিচিত রহস্যময়ীর পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করেছিলাম।

পায়ে পায়ে, কি আশ্চর্য, একেবারে ফীটনের কাছে এসে থেমে গিয়েছিল মেয়েটি। ডেকেছিল, 'মকবুল—মকবুল—'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফীটনের দরজা খোলার শব্দ হয়েছিল। ধড়মড় করে ভেতর থেকে যে বেরিয়ে এসেছে অন্ধকারেও তাকে কোচোয়ান বলে চিনতে অসুবিধে হয়নি।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করেছিল, 'ঘুমুচ্ছিলে ?'

মকবুল যে ঘুমুচ্ছিল, সন্দেহ নেই। তখনও ঘুমের রেশ তার কাটে নি। জড়িত স্বরে সে বলেছিল, 'জী—'

'কখন স্টেশনে এসেছ ?'

'সন্ধের একটু পর, সাড়ে সাতটা নাগাদ।'

'তা হলে তো অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছ।'

'জী, মা পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, আপনি আটটা দশের ট্রেনে ফিরবেন।'

'ঐ ট্রেনেই ফেরবার কথা ছিল, কিন্তু স্টেশনে ঢুকতে ঢুকতে গাড়িটা বেরিয়ে

গেল। ধরতে পারলাম না। ঐ ট্রেনটা মিস করার মানে হচ্ছে লাস্ট ট্রেনের জন্যে বসে থাকা। শেষ পর্যন্ত লাস্ট ট্রেনেই এলাম।'

একটা ব্যাপারে কৌতুক বোধ করেছিলাম। মেয়েটিও ট্রেন ফেল করেছিল, আমিও তাই। নিয়তি ঐ দিক থেকে আমাদের মিল ঘটিয়ে দিয়েছিল। শুধু কি শীতের রাতে ট্রেন ফেল করার ব্যাপারেই, আরো অনেক দিক থেকেই আমাদের মিল ঘটেছিল। কিন্তু সে-সব পরের কথা। পরের কথা পরে। সে প্রসঙ্গের জের আগে টেনে নিয়ে এসে জট পাকিয়ে কি লাভ!

মকবুল বলেছিল, 'আমারও আর কোন কাজ ছিল না, ভাবলাম লাস্ট ট্রেনটা দেখে যাই। লাস্ট ট্রেন তো আর দু-এক ঘণ্টার মধ্যে আসবে না, আসতে আসতে রাত বারোটা পেরিয়ে যাবে। এদিকে কি আর করি, বড্ড ঠাণ্ডা লাগছিল বাইরে। তাই ভেতরে ঢুকে দোর জানালা এঁটে বসে ছিলাম। বসে থাকতে থাকতে কখন শুয়ে পড়েছি, শুয়ে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল ছিল না। আপনি নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করেছেন।' মকবুল কাচুমাচু মুখে তার ঘুমোবার কৈফিয়েত দিয়ে যাচ্ছিল।

'মোটেই বেশিক্ষণ ডাকাডাকি করিনি। এক ডাকেই তুমি সাড়া দিয়েছ। আর ঘুমিয়ে কিছু অন্যায়ও করো নি। নাও, এখন চল।'

ফীটনটা কোত্থেকে এল, কেন এখানে দাঁড়িয়ে আছে, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন খানিক আগে আমাকে চিন্তিত করেছিল। সেটা যে আমার সঙ্গিনীর জন্য অপেক্ষা করছিল, সে সম্বন্ধে এখন আর আমার মনে সংশয় ছিল না।

মেয়েটি আমার দিকে ফিরে বলেছিল, 'উঠুন—'

প্রায় চিৎকারই করে উঠেছিলাম বোধ হয়, 'কোথায়, এই গাড়িতে?'

'গাড়িটা ছাড়া আপাতত এখানে আর কিছু নেই যাতে আপনাকে উঠতে বলতে পারি। আর দেরি করবেন না, ঠাণ্ডায় একেবারে জমে যাচ্ছি।'

'কিন্তু—'

'আপনাকে নিয়ে আর পারি না।'

আমি আর বাধা দিতে পারিনি। আমার শক্তি যেন নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছিল। ধমনীতে ফেনায়িত রক্তস্রোতের কলরোল শুনতে শুনতে সম্রাজ্ঞীর আদেশে বশংবদ প্রজার মত আমি ফীটনে গিয়ে বসেছিলাম। আমি উঠবার পর মেয়েটি উঠে মুখোমুখি বসেছে। মনে হয়েছিল সমস্ত ভবিষ্যৎ, সকল সত্তা আর অস্তিত্ব তার হাতে সঁপে দিয়ে আমি ফীটনে উঠেছি।

মকবুল কোচোয়ানের সীটে গিয়ে বসেছিল। ঘোড়াকে চাবুক মারতে যাবে

সেইসময় আমার সঙ্গিনী ডেকেছিল, 'আচ্ছা মকবুল—'

'জী—' ওপর থেকে মকবুল সাড়া দিয়েছে।

'আজ বিকেলবেলা তুমি বাড়ি ছিলে ?'

'জী ?'

'আসর জমেছিল ?'

'জমেছিল, তবে অন্য দিনের মত না।'

'কেন ?'

'আপনি ছিলেন না, তাই বোধ হয়।'

সঙ্গিনী বলেছিল, 'আহা, আমি ছাড়া বুঝি জমতে পারে না! কী যে বল! অস্বীকার করেছিল বটে, তবু কণ্ঠস্বর থেকে একটুখানি গর্ব যেন ছলকে বেরিয়ে এসেছিল।'

মকবুল একথার উত্তর দেয় নি।

সঙ্গিনী জিজ্ঞেস করেছিল, 'কে কে এসেছিল আজ ?'

'অনেককেই তো দেখেছি।'

'কবি পারিজাত কুসুম ?'

'জী'

'ব্যবসাদার নিশানাথ কুণ্ডু ?'

'জী—'

'শিকারী ব্যানার্জী সাহেব ?'

'জী—'

'সিনেমা হলের মালিক ?'

জী—'

'প্রফেসর মল্লিক ?'

'জী—'

'অফিসার চ্যাটার্জী সাহেব ?'

'জী, দেখিনি।'

'সাব ডেপুটি নিশানাথ লাহিড়ী ?'

'জী, তাঁকেও দেখিনি।'

'ব্যবসায়ী মথুর পোদ্দার ?'

'তিনিও আসেন নি।'

'উকিল সারদাবাবু ?'

'জী, না।'

এবার সঙ্গিনী ঈষৎ রুক্ষ গলায় বলেছিল, 'সকালবেলা আমি যে এখান থেকে চলে গিয়েছিলাম সে খবর তো কেউ জানত না।'

'জী, না।' ওপর থেকে মকবুল জানিয়েছিল।

'জানতে শুধু তুমি আর মা।'

'জী।'

'মা কাউকে নিশ্চয়ই আমার যাবার কথা বলবে না। তুমি বলেছিলে?'

'জী, না।'

এবার অনেকটা স্বগতোক্তির মত সঙ্গিনী বলে উঠেছিল, 'কেউ বলেনি তবে ঐ ক'জন এল না কেন? কেন এল না?'

কোথায় থাকে মেয়েটি, ব্যানার্জী সাহেব অথবা সাব ডেপুটি অথবা প্রফেসর মল্লিক—এঁরা কারা? কোথায় আজ ভাগ করে আসর জমেনি ইত্যাদি ইত্যাদি নানা ব্যাপারে দুর্বার কৌতূহল বোধ করছিলাম। কিন্তু এ সব নিয়ে প্রশ্ন করা শোভন মনে হয়নি, সুতরাং আমি চুপ করে বসে ছিলাম।

সঙ্গিনী এবার কোচোয়ানকে নির্দেশ দিয়েছিল, 'গাড়ি চালিয়ে দাও মকবুল—'

তৎক্ষণাৎ শাঁই করে ঘোড়ার পিঠে একটা চাবুক পড়েছে এবং ফীটন ছুটতে শুরু করেছে।

স্টেশনের বাইরে থেকে চওড়া একটা রাস্তা সোজা পশ্চিম দিকে গেছে। আমাদের ফীটন সেটা ধরেই এগিয়ে যাচ্ছিল।

আমার যৌবনে এই রাস্তাটাই ছিল ডিস্ট্রিক্ট টাউনের শিরদাঁড়া। এর দু পারে দোকান-পাট, বাজার, থানা, আদালত। চলতে চলতে একবার বাইরেটা দেখে নিয়েছিলাম। শীতের রাতের সেই মধ্যযামে দোকান-পাট কখন বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তাটা জনশূন্য, এমন কি অনাথ কুকুরগুলিকে পর্যন্ত কোথাও দেখা যায়নি। শীতের অসহ্য রাত একটু উত্তাপের জন্য তাদের কোথায় কোন্ বিবরে পাঠিয়ে দিয়েছে, কে বলবে।

এই পথটা বাদ দিলে এখানে আর সবই সরু সরু গলি—শ্বাসরুদ্ধ, বুকচাপা, বাঁকে-বাঁকে পাক-খাওয়া। শুধু গলি হলেও কথা ছিল, উপশিরার মত তাদের গা থেকে আরো সরু সরু পথ বেরিয়েছে।

ডিস্ট্রিক্ট টাউনটা যেন একালের কোন শহর নয়, আদ্যিকালের নগরী। এর সব কিছুই পুরনো, প্রাচীন। বাড়িঘর ধ্বংসস্তূপ বলে মনে হতে পারে।

আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম। অন্ধকার রাস্তার দু ধারে রূপকথায় দেশের মত মিটমিটিয়ে তেলের বাতি জ্বলছিল। জ্বলা আর কি, শীতের ঘন কুয়াশা আর অন্ধকার

তাদের চোখগুলিকে প্রায় অন্ধ করে দিয়েছিল। হিমাক্ত বাতাস চাবুকের মত সাঁই-সাঁই করে উত্তর থেকে দুরন্ত বেগে দক্ষিণে ছুটে যাচ্ছিল।

রাস্তার দু ধারে শুধু প্রায়ান্ধ তেলের বাতিই না, সারিবদ্ধ নিস্তব্ধ বাড়িগুলো কেমন যেন শ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে ছিল। একটা কিছুর প্রতীক্ষা করছিল যেন তারা। কিসের প্রতীক্ষা ?

এই পথ ধরে চলতে চলতে আমার মনে হচ্ছিল, কবে যেন একদিন এখানে মুখর জীবনস্রোত বয়ে যেত। চিরদিনের মত তা বুঝি স্তব্ধ হয়ে গেছে। আবার মনে হচ্ছিল, একটি বিচিত্র যানে চড়ে অপরিচিতা সঙ্গিনীটি আর আমি পাতালের অতল অন্ধকারে কোন এক নির্জন পরিত্যক্ত নগরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

সঙ্গিনী একসময় ডেকেছিল, 'চিরন্তনবাবু—'

চমকে জানালার বাইরে থেকে চোখ ফিরিয়ে এনেছিলাম।

সঙ্গিনী বলেছিল, 'আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি।'

কী সে শুনেছে, জানি না। এবারও কিছু না বলে শুধু উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে থেকেছি।

'আপনি সেন্ট পারসেন্ট ভাল ছেলে, বিড়ি খান না, সিগারেট খান না, কোন-রকম বাজে নেশা নেই, আড্ডা নেই। স্কুলে থাকতে গুড কণ্ডাক্টের সবগুলো প্রাইজ পেয়েছেন।'

সেই পুরনো বিস্ময়টাই আবার আমাকে পেয়ে বসেছিল। কোন নেপথ্যে বসে কিভাবে মেয়েটি আমার সম্বন্ধে এত খবর সংগ্রহ করল ?

সঙ্গিনী আবার বলেছিল, 'একেবারে পাকা সোনা, খাস গোল্ড। তবে—'

'কী ?' এতক্ষণে আমার গলায় স্বর ফুটেছিল।

'অনুমান করছি, একটা নেশা বোধ হয় আপনার আছে।'

'নেশা !'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, নেশা ছাড়া কী ?'

আগ্রহে অনেকখানি ঝুঁকে বলেছিলাম, 'কথাটা কিন্তু বুঝলাম না।'

'বুঝিয়ে দিচ্ছি।' সঙ্গিনীও আমার দিকে ঝুঁকেছিল। ফিসফিসিয়ে বলেছিল, 'ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, বন্যা হোক মহামারী লাগুক, বারো মাস শনিবারের শেষ ক্লাসটা করেই আপনার বিবিবাজারে ছোটা চাই। তাই না ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু—'

বাধা দিয়ে সঙ্গিনী তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল, 'আপনি কি বলতে চান, বুঝেছি। শনিবারে বাড়ি ছোটার সঙ্গে নেশার সম্পর্ক কী, এই তো ?'

আমি মাথা নেড়েছিলাম।

সহচরী বলেছিল, 'এও এক রকমের নেশাই। মাতালরা যেমন বিশেষ একটা সময় মদের দোকানে ছোটে, আপনি তেমনি শনিবারের ট্রেন ধরেন।'

আমি চুপ। ট্রেনে এই মেয়েটিকে মায়াবিনী মনে হয়েছে। ফীটনে করে যেতে-যেতে ভেবেছিলাম, সে অন্তর্যামী। নইলে শনিবারে ট্রেন ধরার পেছনে একটা নেশারই যে টান রয়েছে, আর সেই নেশাটা যে আমার সত্তার ভেতর সর্বক্ষণই ছড়িয়ে আছে, সে কথাটা তার পক্ষে কি করে জানা সম্ভব?

মনে পড়ে, এবার আর সঙ্গিনী কিছু বলেনি। আমিও আস্তে আস্তে দৃষ্টিটা ফীটনের জানালার বাইরে ফের সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম।

খোয়ার রাস্তায় খট্ খট্ শব্দ তুলে ঘোড়াটা ছুটে যাচ্ছিল। হাওয়ায় হাওয়ায় সেই ধ্বনিতরঙ্গ দোল খেতে খেতে ক্রমশ দূরে, আরো দূরে ছড়িয়ে পড়ছিল। অনায়াসেই ভাবতে পারতাম, মধ্যযুগের উদ্ধত দিগ্বিজয়ীর মত আমি কোন এক পরাজিত জনশূন্য দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখানকার সব মানুষ লাঞ্ছনা এবং অত্যাচারের ভয়ে আগেই পালিয়ে গেছে।

ভাবতে পারতাম কিন্তু ভাবিনি। এ ধরনের রোমান্টিক কল্পনাকে প্রশ্রয় দেবার সময় সেটা নয়। আমি শুধু এই মেয়েটির সঙ্গে ট্রেনের কামরায় বিচিত্রভাবে আলাপ হবার পর ফীটনে করে যাওয়া পর্যন্ত আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা মনে করতে চেষ্টা করছিলাম। নির্জন হিমের রাতে আমার সত্তাকে কুহকিত করে সে আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছে? একবার ভেবেছিলাম, ফীটন থেকে লাফ দিয়ে নেমে পালিয়ে যাই। পালাতে গিয়ে দেখেছি, অদৃশ্য শেকলে আমি আবদ্ধ। না কি ডাকিনীমন্ত্রে সেই রহস্যময়ী আমার পালাবার শক্তিটাকে অসাড় করে দিয়েছিল?

হঠাৎ পাশ থেকে সঙ্গিনী ডেকেছিল, 'চিরন্তনবাবু—'

বাইরের কুয়াশাচ্ছন্ন পটভূমি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে মেয়েটির দিকে তাকিয়েছিলাম, 'কী বলছেন?'

গলার স্বরে বিচিত্র একটু টান দিয়ে সে বলেছে, 'প্রত্যেক সপ্তাহে বিবিবাজারে যাবার অত তাড়া কেন? কে আছে সেখানে?'

'আমার মা, দাদু, দিদিমা, ভাইবোনেরা—'

'উঁহু—'

'কী?'

'দাদু-দিদিমা-ভাইবোন বা মায়ের টানে অমন করে কেউ ছোটে না।'

'কী বলছেন আপনি!'

'বলছি, দাদু-দিদিমারা ছাড়াও আর একজন কেউ আছে যার জন্যে অমন করে আপনি বিবিবাজারে ছোটেন।'

আমি চমকে উঠেছিলাম। ঝুলনের কথাও মেয়েটি জানে নাকি। পরমুহূর্তে ভেবেছিলাম, আমার সম্বন্ধে যে এত খবর রাখে সে কি আর ঝুলনের কথা জানে না? কিছু একটা বলতে চেষ্টা করেছিলাম, গলায় স্বর ফোটেনি।

অন্ধকারেও আমার মুখচোখের প্রতিক্রিয়া বোধ হয় লক্ষ্য করেছিল মেয়েটি। বলেছিল, 'ও কি, অমন করে চমকালেন যে।'

আমি চুপ।

হঠাৎ আমার সঙ্গিনী শীতের নিস্তব্ধ রাতটাকে চকিত করে হেসে উঠেছিল।

এর আগে আর একবার তার হাসির আওয়াজ শুনেছিলাম। তখন মনে হয়েছিল মিঠে তালে জলতরঙ্গ বেজে যাচ্ছে। এবার মনে হয়েছিল, জলতরঙ্গ নয়, এস্রাজে এলোপাথাড়ি ছড় টেনে চলেছে যেন।

দুরন্ত ঝড়ের মত সেই উদ্দাম হাসি খানিক স্তিমিত হয়ে এলে সঙ্গিনী বলেছিল, 'বলুন না চিরন্তনবাবু, সে কে?'

আমি নিরুত্তর।

নিশীথের সহচরী আদুরে অন্তরঙ্গ সুরে আবার বলেছিল, 'তার নাম কী চিরন্তন-বাবু?'

এবারও ঠোঁট টিপে আমি বসে ছিলাম।

'কি, বলবেন না?' কপট অভিমানে সঙ্গিনীর কণ্ঠস্বর তরঙ্গিত হয়েছে। ঠোঁট দুটি বুঝিবা স্ফুরিত হয়ে কাঁপছিল—অন্ধকারে বুঝতে পারিনি।

নতুন প্রশ্নের ভয়ে আড়ষ্ট আমি প্রায় কাঁটা হয়ে ছিলাম। কিন্তু না, আর কোনো প্রশ্ন হেনে সে আমাকে বিব্রত করেনি।

অনেকক্ষণ নীরবতা। ঘোড়ার খুরের একটানা খট্ খট্ শব্দ ছাড়া পৃথিবী তখন নিঝুম, অসাড়। সময় যেন সেই শীতের রাতে সমস্ত গতি আর স্রোত হারিয়ে নিস্পন্দ হয়ে গিয়েছিল।

বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার কী হয়েছিল, আজ আর মনে নেই। নিজের অজ্ঞাতসারেই বোধ হয় বলেছিলাম, 'আচ্ছা—'

'কী—'

খানিক ইতস্তত করে বলেছি, 'আপনি এ রকম লাস্ট ট্রেনে রোজ আসেন নাকি?'

'কেন বলুন তো ?' মেয়েটির স্বরে খানিক বিস্ময় ছিল।

'এমনি।'

এবার সঙ্গিনী হেসে উঠেছিল। সকৌতুকে বলেছিল,' আমি লাস্ট ট্রেনে এলে আপনার কিছু সুবিধে হয় ?'

আমি থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম, 'কিসের সুবিধে ?'

'তা আপনি জানেন।

কি উত্তর দেব ভেবে পাইনি।

সঙ্গিনীর এবার বোধ হয় করুণা হয়ে থাকবে। সদয় স্বরে বলেছিল, 'প্রায় রোজই তো আমি বেরুই। বেরুলে সন্ধ্যের ট্রেনেই ফিরে আসি। কখনও সখনও দু-এক দিন লাস্ট ট্রেন ধরতে হয়।'

ঝোঁকের মাথায় লাস্ট ট্রেনের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিন্তু সত্যিই মেয়েটি কোথায় যায়, কেন যায়, গভীর নিশীথে একা একা কেন তার এই রহস্যময় সঞ্চরণ— এ সব সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করিনি। কথাটা সঙ্গত বা শোভন মনে হয়নি।

এর পর আর কী কী কথা হয়েছিল, এতকাল পর মনে নেই। স্মৃতির এই জায়গাটা একেবারে ঝাপসা। তবে একটা কথা পরিষ্কার মনে করতে পারি। যখন মনে হয়েছিল, ফীটনে করে কুয়াশাময় শীতের রাতে রহস্যময়ী যাদুকরীর সঙ্গে সেই চলাটা শেষ হবে না, যখন মনে হয়েছিল সে পথের শেষ নেই বা দুর্জ্ঞেয় নিয়তি বিচিত্র হাতছানিতে কোথায় আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে, যখন বুঝতে পারছিলাম না, ঠিক সেইসময় সঙ্গিনীর কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম। আমাকে লক্ষ্য করে নয়, কোচোয়ানের উদ্দেশে বলেছিল, 'সামনে ঐ ল্যাম্প পোস্টটার কাছে একটু থামিও তো মকবুল।'

'জী—' ওপর থেকে মকবুলের সাড়া পাওয়া গিয়েছিল।

ল্যাম্প পোস্টটা খুব দূরে ছিল না, কাজেই একটু পরই ফীটনটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সঙ্গিনী এবার আমাকে বলেছে, 'আপনার হোস্টেল এসে গেছে চিরন্তনবাবু—'

চমকে জানালার বাইরে তাকিয়েছিলাম। মিটমিটে তেলের বাতিটা, তারপর ঝাঁকড়া-মাথা শিমুল গাছ, গাছটার ওপারে সত্যি সত্যিই কলেজ-হোস্টেলের হলুদ রংয়ের সুবিশাল বাড়িটা। ঘোরের ভেতর কখন যে সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলাম, খেয়াল ছিল না।

সঙ্গিনীর কথার ভেতর প্রচ্ছন্ন একটি ইঙ্গিত ছিল। অর্থাৎ আমাকে নামতে হবে। ফীটনের দরজা খুলে আমি নেমেও পড়েছিলাম।

মেয়েটি বলেছে, 'চলি, নমস্কার—'

আমিও ভদ্রতার খাতিরে হাতজোড় করতে যাচ্ছিলাম, আর ঠিক সেই সময়

একটা কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। মেয়েটির মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলেছিলাম, 'দেখুন—'

'আমাকে কিছু বলবেন ?'

'হ্যাঁ।'

'বলুন—'

'আপনার সঙ্গে এতখানি পথ এলাম অথচ আপনার পরিচয়টাই এখনো জানা—' এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিলাম।

আমার না-বলা কথার ভেতরেই প্রশ্নটা ছিল। তা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়। মেয়েটি বলেছে, 'আমার পরিচয় জানতে চান, এই তো ?'

'হ্যাঁ, মানে আলাপ-টালাপ হল—'

'আচ্ছা চিরন্তনবাবু—' আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে হঠাৎ একেবারে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিল মেয়েটি, 'এই ডিস্ট্রিক্ট টাউনে আপনি ক'বছর আছেন ?'

আকস্মিক এই বিচিত্র প্রশ্নে একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। মনে মনে হিসেব করে বলেছিলাম,'দু বছরের কিছু বেশি। ইণ্টারমিডিয়েটের দুটো বছর আর থার্ড ইয়ারের এই ক'টা মাস। কেন বলুন তো ?'

'আড়াই বছরের মত আপনি এখানে আছেন অথচ আমার পরিচয় জানেন না ? আশ্চর্য।' সূক্ষ্ম একটু হেসে মেয়েটি বলেছিল, 'নাঃ, সত্যিই আপনি খুব ভাল ছেলে।'

আমি চুপ।

মেয়েটির হাসি এবার আর সূক্ষ্ম থাকেনি। ঢেউয়ের মত দোল খেয়ে খেয়ে চড়া তারে বেজে উঠেছিল। সে বলেছে, 'এই ডিস্ট্রিক্ট টাউনে আমিই একমাত্র মেয়ে যে এমন করে মাঝরাতে ডাকিনীর মত ঘুরে বেড়াতে পারে। শুধু ডিস্ট্রিক্ট টাউনেই না, সারা বাংলাদেশেই বোধ হয় এভাবে আর কোন মেয়ে ঘুরতে পারে না।'

আমি নিরুত্তর।

মেয়েটি আবার বলেছিল, 'আড়াই বছর আছেন অথচ আমার কথা শোনেননি, সত্যি অবাক হবার কথা। কানে কি তুলো দিয়ে ঘোরেন ?'

ক্ষীণ কাঁপা গলায় বলেছিলাম, 'মানে ?'

'মানে এখানে যে-ই আসুক, দু'দিন থাকলে আমার খবর ঠিক পেয়ে যাবে। কিন্তু আড়াই বছর থেকেও আপনি কিছুই জানেন না ! হায় আমার পোড়া কপাল !'

আমি হতভম্ব, বিমূঢ়।

মেয়েটি বলেই যাচ্ছিল, 'আমার মুখ থেকে পরিচয়টা নাই শুনলেন। যদি কৌতূ-

হলে হয় আমার খোঁজ করবেন। আর যদি আমার সম্বন্ধে আগ্রহ না থাকে পরিচয় জেনেই বা লাভ কি ?'

ঘোরের মধ্যে থেকে বলে উঠেছিলাম, 'নাম জানি না, ধাম জানি না, আপনার খোঁজ কিভাবে করব ?'

ফিসফিসিয়ে মেয়েটি বলেছিল, 'প্রাণে যদি সাধ থাকে নাম ঠিকানা না জেনেও খুঁজে বার করা যায়। আর সেই খোঁজাটাই তো আসল খোঁজা। আর তাতে যদি মন না ওঠে এ শহরের বাসিন্দাদের বলবেন, যে মেয়েটা রাত্রিবেলা ফীটন নিয়ে নিশাচরীর মত ঘুরে বেড়ায় সে কে ?' একটু থেমে আবার বলেছিল, 'অনেক রাত হয়ে গেছে, আর নয়। এবার চলি। আচ্ছা নমস্কার।'

'নমস্কার।'

কোচোয়ানের উদ্দেশে এবার সে বলেছিল, 'গাড়ি চালাও মকবুল।'

আরবী ঘোড়া ছুটতে শুরু করেছিল, এবং নিমেষে ফীটনটা পথের দূর বাঁকে গাঢ় কুয়াশায় বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

তারপরেও বিহ্বলের মত আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম। ভেবেই পাচ্ছিলাম না, যে যাদুকরী নিজের অপার রহস্যের একটুখানি উন্মোচন করে বাকি সবটুকু আবৃত রেখে অদৃশ্য হয়ে গেল সে কে ?

দশ

তারপর একটা সপ্তাহ যে কিভাবে কেটেছিল, পরিষ্কার মনে আছে। স্নায়ুগুলো সর্বক্ষণ ঝিম ঝিম করত। উঠতে-বসতে-চলতে-ফিরতে সবসময় আমি অন্যমনস্ক, নেশাচ্ছন্ন। পড়ার বই নিয়ে খুলে বসতাম ঠিকই, অক্ষরগুলো কিছুই দেখতে পেতাম না। ক্লাসে অধ্যাপকরা নোট দিতেন, বুঝতে পারতাম না। ঘুমে কিংবা জাগরণে, দিনরাত আমার সমস্ত সত্তা কুহকিত, বিহ্বল। মনে হয়েছিল, কেউ আমার হাত ধরে অলৌকিক এক স্বপ্নের ভেতর ছুড়ে দিয়েছিল। তার ভেতর কি এক অথৈ গভীরে একটু একটু করে ধীরে ধীরে আমি ডুবে যাচ্ছিলাম। আমার চারপাশের জগৎ তখন তার আসল রূপ হারিয়ে কেমন যেন রঙিন হয়ে উঠতে শুরু করেছিল, টলমল করছিল।

হীরু আমার প্রাণের বন্ধু, রুমমেট। তিন বার ডাকলে একবার হয়ত সাড়া পেত। আমার পরিবর্তন তার চোখে নিশ্চয়ই ধরা পড়ে থাকবে।

হীরু বলত, 'তোর কী হয়েছে বল দেখি। ডাকলে সাড়া দিস না।'

বিব্রত বোধ করতাম। জোর করে হেসে বলতাম, 'কই, কিছু হয়নি তো।'

হীরু খুব কাছে এগিয়ে এসে তীক্ষ্ণ চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে দেখে বলত, 'কিছু হয়নি, বললেই হবে! নিশ্চয়ই হয়েছে। সারা দিনরাত কী ভাবিস এত. বল্—'

'আরে না-না, কিচ্ছু ভাবি না। তোর দেখার ভুল।'

'ভুল আমার হতে পারে না।'

কী বলব, ভেবে পেতাম না। জোর করে উড়িয়ে দিতে চাইলে কি হবে, হীরুকে যে ফাঁকি দিতে পাবে নি তাতে আদৌ সন্দেহ থাকত না। মনে মনে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতাম।

হীরু আবার বলত, 'হ্যাঁ রে, একটা সত্যি কথা বলবি ?'

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করতাম, 'কী ?'

'এবার বিবিবাজারে গিয়ে ঝুলনের সঙ্গে ঝগড়া টগড়া করে এসেছিস নাকি ?'

কেমন করে তাকে বোঝাব, ঝুলনের সঙ্গে আমার কিছুই হয়নি। আমি যে দূরমনস্ক হয়ে পড়েছি, আমার চোখেমুখে যে অস্থিরতার ছায়া পড়েছে, তার কারণ ঝুলন নয়। সে আর কেউ, অন্য কেউ। মধ্যরাতের সেই যাদুকরীকে আমি চিনি না, কী তার নাম জানি না। তবে আমার অস্তিত্বের সকল দিকে যে সে দুরন্ত ঝড় বইয়ে দিয়েছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। কিন্তু সে কথা তো হীরুকে বলবার নয়। যা বলতাম তা এইরকম, 'আরে না-না, ঝগড়া কেন হবে ঝুলনের সঙ্গে ?'

হীরু আর কিছু বলত না, তবে বুঝতে পারলাম, তার দু চোখ আর মন সন্দিগ্ধ হয়ে আছে। তার কাছ থেকে আমি পালিয়ে বেড়াতে চেষ্টা করতাম।

আমার ভাবান্তর শুধু হীরুরই নয়, অধ্যাপকদের কাছেও ধরা পড়েছিল। সেরা ছাত্র বলে অধ্যাপকদের দৃষ্টি সর্বক্ষণই আমার ওপর আটকে থাকত। পড়াবার সময় তাঁরা এমনভাবে তাকিয়ে থাকতেন যাতে মনে হ'ত, সারা ক্লাসে আমিই একমাত্র ছাত্র, আমি ছাড়া আর কেউ নেই।

মনে আছে, অনার্স ক্লাসের একজন অধ্যাপক বলেছিলেন, 'তোমার শরীর কি ভাল নয় চিরন্তন ?'

হকচকিয়ে গিয়েছিলাম, 'আজ্ঞে, ভালই তো স্যার।'

'ইউ লুক ভেরি মাচ আনমাইণ্ডফুল।'

আমি এবার উত্তর না দিয়ে নতচোখে চুপচাপ বসে ছিলাম।

একেক সময় মনে হ'ত, সেদিন রাত্রে সত্যিই বিচিত্র সেই মেয়েটির

সঙ্গে লাস্ট ট্রেনে ডিস্ট্রিক্ট টাউনে নেমে ফীটনে পাশাপাশি বসে হোস্টেলে এসেছিলাম কিনা। নাকি আমার অবচেতনে ঐরকম একটি মোহিনীর কামনা কোথাও সুপ্ত ছিল এবং সেই আকাঙ্ক্ষাটা আমাকে রমণীয় এক স্বপ্ন দেখিয়েছে আর সেই মিথ্যে অলীক মধুর স্বপ্নটাকে নিয়ে আমি আচ্ছন্ন হয়ে আছি ?

মিথ্যে—মিথ্যেই। স্বপ্নের ঘোরে যাকে দেখেছিলাম, ফীটনে করে নির্জন কুয়াশাবিলীন রাতে যে আমাকে হোস্টেল বিল্ডিংয়ের সামনে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল দিনের আলোয় তাকে কি দেখতে পাওয়া সম্ভব ? সে অবশ্য বলেছিল, প্রাণে যদি সাধ থাকে তাকে অবশ্যই খুঁজে বার করতে পারব। কিন্তু এই ডিস্ট্রিক্ট টাউনে কে আমাকে তার ঠিকানা বলে দেবে ? কাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করব, যে মায়াবিনীর সঙ্গে সেদিন ট্রেনে আর ফীটনে বিহার করে বেড়িয়েছি সে কে ? কোথায় তার হদিস পাব ?

প্রথমত যার নাম বলতে পারব না, ঠিকানা দিতে পারব না, তার সন্ধান করতে যাওয়া নিতান্তই বিড়ম্বনা। তা হাড়া বাস্তবে যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার নিজের মনেই সংশয় ছিল তাকে কোথায় খুঁজতে যাব ?

তার অস্তিত্বহীনতা প্রমাণ করতে চারিদিকে যুক্তির অসংখ্য ঘুঁটি সাজিয়েছি তবু আচ্ছন্নতা কাটছিল কই ? মধ্যরাতে ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়ে আমার আত্মাকে সে বুঝি সম্পূর্ণ দখল করে নিয়েছিল। তার ভাবনা থেকে কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারছিলাম না।

দেখতে দেখতে একটা সপ্তাহ কেটে গিয়েছিল। শনিবার কলেজ ছুটির পর বিবিবাজারে ফেরার জন্য জামা-কাপড় বইখাতা গুছিয়ে নিচ্ছিলাম, সেই সময় দরজায় ছায়া পড়েছিল। চোখ ফেরাতেই দেখেছি সুধাময়—সুধাময় চৌধুরী।

মুখ চেনাটা আগেই ছিল। আমাদের কলেজেই পড়ত সুধাময়, তবে এক ইয়ারে নয়। তখন সে ফোর্থ ইয়ার আর্টসের ছাত্র। অবশ্য একই হোস্টেলে আমরা থাকতাম। কিন্তু আড়াই বছরে দু-চার দিনের বেশি কথা বলিনি, তা-ও খুবই সামান্য। 'কেমন আছেন,' 'ভাল আছি'র বেশি কিছু নয়। সেটা সুধাময়ের দোষে নয়—আমারই মুখচোরা লাজুক স্বভাবের জন্য। এই তুচ্ছ আলাপ সম্পর্ককে গাঢ় করার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। অতএব সুধাময়ের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা ছিল না।

সুধাময়ের চেহারাখানি চমৎকার, তাকে সুপুরুষ বলা চলত। উজ্জ্বল প্রাণবন্ত চোখ, দেহের কোথাও মেদের বাহুল্য নেই। নাক, চিবুক, মুখের গড়ন— সবই ধারালো, তীক্ষ্ণ। ব্যাক ব্রাশ করা চুল, নিখুঁত কামানো গাল, ঠোঁটের ওপর সূক্ষ্ম গোঁফের রেখা।

ডিস্ট্রিক্ট টাউনে সুধাময়ের বাবুয়ানা আর শৌখিনতা ছিল প্রবাদের মত। এক পোশাকে তাকে দু বেলা দেখা যেত না। সকালবেলা তাকে দেখতাম ধবধবে পা-জামা আর পাঞ্জাবি পরে আছে, দুপুরে দেখা যেত সাজসজ্জা বদল করে দিশি ধুতির প্রান্ত পথের ধুলোয় লুকিয়ে পাম্প-শু মশমশিয়ে চলেছে। বিকেলে তার আবার আর এক রূপ। তখন কোট-প্যাণ্ট পরে পুরোপুরি সাহেব। সারাদিনই তার পোশাক থেকে প্রীতিকর মৃদু সৌরভ উঠে আসত।

বাইরের সাজ আর চেহারা যদি আর্থিক অবস্থার প্রতিফলন হয় তা হলে অনায়াসেই বলা যেত, সুধাময় বড়লোকের শৌখিন ছেলে।

আগে আর কোনোদিন আমাদের ঘরে সে আসেনি। সুধাময়কে দেখে আমি অবাকই হয়ে গিয়েছিলাম। বিস্ময়টা বেড়েছিল যখন হঠাৎ দেখেছিলাম, ঠোঁট টিপে টিপে আমার দিকে তাকিয়ে কেমন করে যেন সে হাসছে।

মনে হয়েছিল, সে কিছু বলতে চায়। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আমার কাছে কিছু দরকার আছে?'

আস্তে মাথা হেলিয়েছিল সুধাময়—আছে।

'কী?'

উত্তর না দিয়ে সুধাময় বলেছিল, 'ভেতরে আসতে পারি?'

আগেই ওটুকু ভদ্রতা করা উচিত ছিল। লজ্জিত বিব্রতভাবে বলেছিলাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আসুন।'

সেই মুহূর্তে হীরু ঘরে ছিল না। দলবল নিয়ে ফুটবল ম্যাচ খেলতে কলেজের মাঠে নেমেছিল। সুধাময় ঘরে ঢুকে হীরুর বিছানায় বসেছিল।

তার দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম 'এবার বলুন—'

'বলব। কিন্তু ও কি?'

'কী?'

'জামাকাপড় বইপত্তর সুটকেসে গুছোচ্ছেন কেন? কোথাও যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'বিবিবাজারে, আমাদের বাড়িতে। চারটে সাতচল্লিশের ট্রেনটা ধরতে হবে।'

'ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ—' সুধাময় বলেছিল, 'শুনেছি প্রত্যেক শনিবার কলেজ ছুটির পর আপনি বাড়ি যান।'

'হ্যাঁ—' আমি বলেছিলাম, 'সেখানে দাদু-দিদিমা, ভাইবোনেরা আর মা আছেন।

সপ্তাহের দেড় দিনের মত ওঁদের সঙ্গে কাটিয়ে আসি।'

'কিন্তু—'

কিছু না বলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলাম।

সুধাময় বলেছে, 'এ শনিবারটা না হয় বিবিবাজারে না-ই গেলেন।'

'কেন বলুন তো ?'

'সব সপ্তাহেই তো যান, আজকের এই শনিবারটা আমার জন্যে না হয় নষ্ট করুন।'

'আপনি কী বলতে চাইছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'পারছেন না ?' ঠোঁট-টেপা সেই মিটি মিটি হাসিটা আরেকটু বিস্তৃত হয়েছিল সুধাময়ের, 'মানে আপনি খুব ভাল ছেলে, আজকের দিনটা আপনার সঙ্গে কাটাতে চাই। ভাল করে আলাপ-পরিচয় এখনও হয়নি সেটাও হবে। আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাকা করে নেওয়া আর কি।'

এতদিন তো এই হোস্টেলে কাটালাম কিন্তু এমন বাসনা আগে কখনও হয়নি সুধাময়ের! উদ্দেশ্য কী তার ? সে যা-ই থাক, বলেছিলাম, 'ভাল ছেলে বলে লজ্জা দেবেন না। তবে বন্ধুত্বের যে কথাটা বললেন তার লোভ আমারও আছে। কিন্তু আজ আমাকে ক্ষমা করতেই হবে। প্রত্যেক শনিবার বাড়ি যাই, হঠাৎ এবার না গেলে সবাই খুব চিন্তা করবেন। আগে থাকতে না যাবার কথাটা বলা থাকলে অবশ্য কেউ ভাবতেন না।'

'কিন্তু—'

'বলুন—'

'আমি যে খুব আশা করে এসেছিলাম চিরন্তনবাবু। একটা প্রোগ্রামও ঠিক করেছিলাম, আপনাকে সঙ্গে নিয়ে এক জায়গায় বেড়াতে যাব। জায়গাটা চমৎকার। আপনার ভাল লাগবে—'

'আমি অত্যন্ত লজ্জিত সুধাময়বাবু—' কুণ্ঠিত মুখে বলেছিলাম, এ সপ্তাহে কোনোভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। যদি বলেন আসছে সপ্তাহে না হয় বেড়াতে যাব, মাকে বলে আসব, আসছে শনিবার বাড়ি ফিরব না।'

'তা হলে আর কি হবে, আজ চলি।' সুধাময় উঠে দরজার দিকে চলে গিয়েছিল।

প্রথমটা আমার মনে হয়েছিল, সুধাময় ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কিন্তু আমি নিরুপায়। ইচ্ছা সত্ত্বেও তাকে সঙ্গদান করা সেই মুহূর্তে আমার পক্ষে কিভাবে সম্ভব, ভেবে পাচ্ছিলাম না।

কিন্তু আমার খানিক আগের ধারণাটা কতখানি ভ্রান্ত পরক্ষণেই টের পেয়ে-

ছিলাম। দরজার বাইরে একটা পা দিয়েই হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়েছিল সুধাময়। তার মুখে ক্ষোভের কোনো চিহ্নই নেই বরং সেই টেপা ঠোঁটের নিঃশব্দ হাসিটা আরো অর্থময় হয়ে উঠেছিল।

মনে মনে চকিত না হয়ে পারিনি। সুধাময়ের ঐ হাসিটা'র অর্থ কী? ওটা দিয়ে কী সে বোঝাতে চায়? কিসের ইঙ্গিত বহন করছে হাসিটা? বুঝতে পারছিলাম না। পারছিলাম না বলেই সম্ভবত অস্বস্তিটা ক্রমশ স্ফীত এবং ফেনায়িত হয়ে উঠছিল।

সুধাময়ের চোখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে স্খলিত স্বরে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আর কিছু বলবেন?'

মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে আস্তে আস্তে নেড়েছিল সুধাময়, অর্থাৎ বলবে।

বুকের ভেতর অস্বস্তি নিয়ে আমি অপেক্ষা করে যাচ্ছিলাম

সুধাময় ফিসফিসিয়ে বলেছিল, 'আমার সঙ্গে গেলে ভালই করতেন চিরন্তন বাবু—'

বলেছিলাম, 'কিন্তু—'

গলার ভেতর থেকে আর কোনো শব্দ বেরুবার আগেই সুধাময় বলে উঠেছিল, 'আমি আপনাকে কোথায় নিয়ে যেতাম, জানেন?'

'কোথায়!'

'বলছি। তার আগে আমার ক'টা কথার জবাব দিন।'

'বলুন।'

'আজ এক শনিবার। ঠিক এক সপ্তাহ আগের এই দিনটায় আপনি কী করেছিলেন?'

'কেন, কলেজ ছুটির পর চারটে সাতচল্লিশের ট্রেন ধরে বিবিবাজার গিয়েছিলাম।'

'এখানে ফিরেছিলেন কবে?'

'তার পরের দিন।'

'মানে, রবিবারে তো?'

'হ্যাঁ। প্রতি সপ্তাহেই শনিবার বিবিবাজার গিয়ে রবিবার সন্ধ্যের ট্রেনে এখানে ফিরে আসি।'

'সন্ধ্যের সময় ফিরে আসেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'এই রবিবারও তাই ফিরেছিলেন? বেশ ভাল করে মনে করুন

আমি চমকে উঠেছিলাম। উল্টোপাল্টা নানা প্রশ্ন করে বিরুদ্ধ পক্ষের উকীল

যেভাবে আসল খবরটা বার করে নেয় তেমন কোন উদ্দেশ্য আছে নাকি সুধাময়ের? থতমত খেয়ে বলেছিলাম, 'না, সেদিন সন্ধ্যেবেলা ফিরতে পারিনি, ট্রেন ফেল করেছিলাম। এ কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন বলুন তো?'

আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেনি সুধাময়। বরং উল্টে সে-ই প্রশ্ন করেছিল, 'সেদিনকার সব কথাই আপনার মনে আছে?'

'আছে বোধ হয়। কেন?'

'ভাবতে চেষ্টা করুন, ট্রেন ফেল করবার পর আপনি কী করেছিলেন?'

জেরায় জেরায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। বিরক্তি বোধ হয় আর গোপন রাখতে পারিনি। ঈষৎ রুক্ষ স্বরেই বলেছিলাম, 'কি আর করব, স্টেশনে বসে থেকে থেকে শেষ পর্যন্ত লাস্ট ট্রেন ধরে ছিলাম।'

'সেদিন তা হলে এতকালের নিয়ম ভেঙে সন্ধ্যার বদলে মাঝরাতের গাড়িতে এসেছিলেন—'

'হ্যাঁ।'

'একাই এসেছিলেন?'

ঠাকুর টেবিলে একটা ঘড়ি ছিল। উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়েছিল সেটার ওপর। তখন চারটে বেজে পনের। অর্থাৎ আর আধ ঘণ্টা পরেই বিবিবাজারের ট্রেন। স্টেশনে যেতেও খানিকটা সময় লাগবে। অতএব আমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, 'দেখুন সুধাময়বাবু, আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। আর দেরি করলে ট্রেনটা ফেল করতে হবে।' বলে দ্রুত হাত চালিয়ে স্যুটকেস গুছিয়ে তালা লাগিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম।

আমার কথা এবং ভাবভঙ্গির মধ্যে পরিষ্কার ইঙ্গিত ছিল, সুধাময়কে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, তার সঙ্গে অনাবশ্যক বকে বকে ট্রেনটা আমি ফেল করতে পারব না। আমাকে মুক্তি দিয়ে এবার তার বিদায় হওয়া উচিত। কিন্তু এত স্পষ্ট করে বোঝানো সত্ত্বেও দরজা ছেড়ে সে নড়েনি। আমার ইঙ্গিত সে বুঝেছে, এমন কোনো লক্ষণই তার মধ্যে দেখা যায়নি।

সুধাময় বলেছিল, 'কই, আমার কথার উত্তর দিলেন না?'

তাকে এড়াবার জন্য তাড়াতাড়ি বলেছিলাম, 'একলাই ফিরেছিলাম সেদিন।'

'উঁহু—'

'কী?'

'একলা সেদিন আপনার ফেরা হয়নি।'

আমার হৃৎপিণ্ডের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চমকের মত শিরশিরিয়ে কী যেন একটা

রয়ে গিয়েছিল। বিভ্রান্তের মত সুধাময়ের কথার প্রতিধ্বনি করে বলেছিলাম, 'একলা ফেরা হয়নি!'

'না।'

'তবে?'

'আপনার সঙ্গে একজন এই ডিস্ট্রিক্ট টাউন পর্যন্ত এসেছিল, তাই না?'

স্নায়ুগুলো ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল আমার, বিহ্বলের মত সুধাময়ের দিকে তাকিয়ে থেকেছি। কী বলা উচিত, সেই মুহূর্তে তা খুঁজে পাইনি।

সুধাময় এবার দরজার কাছ থেকে এগিয়ে এসে আমার কাঁধে একখানা হাত রেখেছিল। গলার স্বর অতল খাদে নামিয়ে বলেছিল, 'শুধু একই সঙ্গে আপনারা স্টেশনে নামেন নি, একটা ফীটনে করে হোস্টেল পর্যন্ত এসেছিলেন।'

'কিন্তু -' আমার স্তব্ধ ধমনীর ভেতর থেকে এবার শব্দটা যেন লাফ দিয়ে উঠে এসেছিল।

'কী?'

'আপনি এসব জানলেন কী করে?'

সুধাময়ের চোখে দুর্জ্ঞেয় হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গিয়েছিল। আমার কথার উত্তর না দিয়ে ফিসফিসিয়ে সে বলেছিল, 'সেদিন যে ফীটনে করে আপনাকে হোস্টেলে পৌঁছে দিয়েছিল সে কে জানেন?'

'না।'

'জানতে ইচ্ছে করে?'

'হ্যাঁ' অথবা 'না', আমি কী উত্তর দিয়েছিলাম এতকাল পর আর মনে করতে পারি না।

সুধাময় বলেছিল, 'যদি জানতে ইচ্ছে হয়, আমার সঙ্গে আসতে পারেন।' বলে আর দাঁড়ায় নি, সামনের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

তারপর কিছুক্ষণ কী হয়েছিল, আমি কী করেছিলাম, মনে নেই। আমার নিজের চেতনা সেই সময়টুকু আমার বশে ছিল না। খানিকটা পর আবিষ্কার করেছিলাম, ডিস্ট্রিক্ট টাউনের রাস্তায় সুধাময়ের পিছু পিছু হেঁটে চলেছি।

এগারো

আগেই বলেছি জেলা শহরটা ছিল আদিকালের কোনো নগরী। সবই তার প্রাচীন, জরাগ্রস্ত, পুরনো গন্ধমাখা। দু ধারের বাড়িগুলো ভাঙাচোরা ধ্বংসস্তূপের মত। কবে

কোন শতাব্দীতে, মোগল আমলে অথবা পাঠান রাজত্বে কিংবা হিন্দু সভ্যতার গৌরবময় কোনো যুগে ওগুলো তৈরি হয়েছিল কে বলবে।

এতকাল এ শহরের প্রায় কিছুই আমার দেখা হয়নি। স্টেশন থেকে হোস্টেল, হোস্টেল থেকে কলেজ, কিংবা কলেজ থেকে হোস্টেল আর হোস্টেল থেকে বিবি-বাজারের ট্রেন ধরতে স্টেশন—এই কক্ষপথে আড়াইটা বছর চলাফেরা করেছি। এই জগৎটুকুর ভেতর ঘুরতে ফিরতে যা চোখ পড়েছে মাত্র ততটুকুই দেখেছিলাম। এর বাইরে দু পা বাড়িয়ে যে কিছু দেখব, আমার প্রাণে তেমন ইচ্ছা বা আকর্ষণ জাগিয়ে এ শহর কোনোদিন হাতছানি দিয়ে ডাকেনি।

যাওয়া-আসার পথের ধারে যতটুকু দেখেছি ততটুকুই আমার চেনা। তার বাইরে আর সব কিছুই ছিল আমার কাছে অজানা, অনাবিষ্কৃত।

সুধাময় আমাকে চেনাশোনা রাস্তা ছাড়িয়ে অচেনা পথে নিয়ে গিয়েছিল। চলতে চলতে প্রাচীন গীর্জা চোখে পড়ছিল। মিনার, গম্বুজ, পুরনো আমলের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাচ্ছিলাম। মোগল-পাঠান-ইংরেজ-ফরাসী, সবাই এখানে নিজের নিজের কীর্তির শীলমোহর মেরে গেছে। জেলা শহর তার সংগ্রহশালায় সুদূর অতীতকে ধরে রেখেছে। যে কেউ এখানকার পথ দিয়ে হাঁটুক, মনে হবে, কুয়াশাময় এক স্মৃতিলোকে এসে পড়েছে।

আমার চোখের সামনে দিয়ে মিনার, গম্বুজ, গীর্জা, মন্দির অথবা সারিবদ্ধ ধ্বংসস্তূপের মত বাড়িগুলো মিছিল করে যাচ্ছিল। আমি দেখছিলাম ঠিকই কিন্তু সে দেখায় বিশ্লেষণ ছিল না, নতুন কিছু দেখার উদ্দীপনা ছিল না। অন্য সময় হলে কী হ'ত বলতে পারব না কিন্তু সেই মুহূর্তে ঐ পুরনো শহরটা তার ঝাঁপি খুলে সমস্ত প্রাচীনতা উজাড় করে দিয়েও আমাকে চমৎকৃত করতে পারে নি। আচ্ছন্নের মত আমি শুধু সুধাময়কে অনুসরণ করে যাচ্ছিলাম।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা জেলা শহরের দক্ষিণ প্রান্তে চলে এসেছিলাম। শ্বাসরুদ্ধ ঘিঞ্জি শহর এখানে এসে হাত-পা ছড়িয়ে বসতে পেরেছিল। জায়গাটা বেশ ফাঁকা। প্রাচীরে-ঘেরা বিরাট বিরাট কম্পাউণ্ডের ভেতর একেকটা সুদৃশ্য বাড়ি। এই জায়গাটা বোধ হয় শহরের অভিজাত অংশ।

এখানকার বাড়িগুলো গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে নেই, বিচ্ছিন্নভাবে দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিল।

চলতে চলতে একসময় একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সুধাময়। ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে বলেছিল, 'আমরা এসে গেছি।'

ধমনীতে রক্তস্রোত মুহূর্তের জন্ম থমকে গিয়েছিল বুঝি, আমি কিছু বলিনি।

সুধাময় ডেকেছিল, 'আসুন—'

দু-জনে ভেতরে ঢুকেছিলাম। গেটের পর থেকে সুড়ি বিছানো একটা দীর্ঘ পথ সোজা সামনের দিকে চলে গেছে, পথটার দু-ধারে একই মাপের সারি সারি পাম গাছ।

কম্পাউণ্ডটা হীরুদের বাড়ির প্রায় সাত গুণ। এককালে পথের দু পাশে চমৎকার ফুলের বাগান ছিল, ফাঁকে ফাঁকে মর্মর-নগ্নিকা আর ফোয়ারা। ঘাসের জমিতে লাল সিমেন্টের অগুনতি ছাতা বানিয়ে সেগুলোর তলায় বসবার জায়গা।

ইদানীং আর ফুলের সমারোহ নেই, আগাছা আর জঙ্গল এগিয়ে এসে ফুলেদের উদ্বাস্তু করে কবে যে বাগানটার দখল নিয়ে বসেছিল, কে বলবে। শুভ্র দেহে অসীম মাদকতা মেখে মর্মর-নগ্নিকারা একদা হয়ত বিভ্রান্ত করত, কিন্তু সেদিন আমি যখন প্রথম দেখি, কালে আর জলে, রোদে আর ঝড়ে তারা ভেঙেচুরে মলিন হয়ে গিয়েছিল। ফোয়ারাগুলিও উচ্ছ্বাস হারিয়ে মূক দাঁড়িয়ে ছিল। সিমেন্টের ছাতা আর বসবার জায়গাগুলো ভেঙে গিয়েছিল।

সুড়ির পথটার সব জায়গায় বাদামী রঙের ছোট ছোট পাথর সমানভাবে ছড়ানো ছিল না। অধিকাংশ জায়গা থেকেই পাথর উঠে উঠে মাটি বেরিয়ে পড়েছিল। দু-ধারের পাম গাছগুলো যে জরাগ্রস্ত, প্রাচীন, দেখেই টের পাওয়া গিয়েছিল। বেশির ভাগেরই ডালপালা নেই. সারি সারি কঙ্কালের মত দু-ধারে পুরাতন তরুগুলি দাঁড়িয়ে ছিল।

আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম। চলতে চলতে যেখানে এসে থেমেছিলাম সেটা বিশাল একখানা দোতলা বাড়ি। অসংখ্য সিঁড়ি, গথিক স্থাপত্যের রীতি অনুযায়ী বিশাল থাম, খিলান, কার্নিস ইত্যাদি দেখতে দেখতে আমার মনে হয়েছিল, ইংল্যাণ্ডের মধ্যযুগে কোন এক অভিজাত ব্যারনের ক্যাসেলে এসে পড়েছি।

একদা এই প্রকাণ্ড বাড়িখানার ওপর সম্ভোগ আর সমৃদ্ধির ঈশ্বর তার সমস্ত আশীর্বাদ দু-হাতে ঢেলে দিয়েছিল। কিন্তু সে ইতিহাস বোধহয় অনেক কাল আগের। আমি যখন প্রথম বাড়িটাকে দেখি, সেটার কার্নিস আর খিলানগুলি ভেঙে ভেঙে পড়েছে। দেওয়াল, সিঁড়ি, উঁচু উঁচু স্তম্ভগুলোর গা থেকে পলেস্তারা খসে ভেতকার ইট বেরিয়ে পড়েছে। বট আর অশ্বত্থেরা ফাটলে ফাটলে শিকড়ের পঞ্চমবাহিনী চালিয়ে ধ্বংসের কাজ অনেকখানিই এগিয়ে রেখেছে।

খিলান আর কার্নিসের ফাঁকে ফাঁকে পায়রাদের বসতি চোখে পড়েছিল, বংশ-

পরম্পরায় ওরা নিশ্চয়ই ওখানে সংখ্যা বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। আমার কেন যেন ধারণা হয়েছিল, আর কিছুদিন এভাবে চললে পায়রাদের হাতেই এ বাড়ির সর্বস্ব চলে যাবে।

কোথাও একটি মানুষ চোখে পড়ছিল না। মনে হচ্ছিল, এ বাড়ি ছেড়ে বাসিন্দারা বহুদিন আগেই চলে গেছে। পরিত্যক্ত জনশূন্য এই ক্যাসেলে কেন আমাকে নিয়ে এসেছে সুধাময়? কী উদ্দেশ্য তার? কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আমার কেমন যেন ভয় ভয় লাগছিল।

অবশেষে যেখানে এসে আমরা পৌঁছেছিলাম, সেখান থেকে সারি সারি সিঁড়ি উঁচুর দিকে উঠে গেছে। আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম।

ঘাড় ঘুরিয়ে সুধাময় বলেছিল, 'এ কি, থামলেন যে?'

অস্পষ্ট গলায় বলেছিলাম, 'মানে—'

'কী?'

'এখানে তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। কেউ এখানে থাকে বলেও মনে হচ্ছে না।'

ঠোঁট টিপে আগের সেই মতই হেসেছিল সুধাময়, 'এখন কেউ থাকে বলে মনে হচ্ছে না?'

আমি মাথা নেড়েছিলাম, অর্থাৎ তাই।

'আচ্ছা, আসুন তো।'

'কোথায়?'

'বা রে, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকলে মানুষ দেখা যায় নাকি? ভেতরে চলুন।' সুধাময় সিঁড়ি বাইতে শুরু করেছিল।

খানিকক্ষণ দ্বিধান্বিত থেকে মরিয়ার মত আমিও পা বাড়িয়েছিলাম। এতদূর যখন এসেছি, তখন শেষটুকু দেখাই যাক।

মোট পনেরটা সিঁড়ি। তারপর একটা বিশাল বারান্দা, সেখানে অনেকগুলো মোটা মোটা উঁচু থাম ছাদে গিয়ে ঠেকেছে।

বারান্দা পার হয়ে ডান দিকে একটা বিশাল দরজা দিয়ে বৃত্তাকার প্রকাণ্ড হল ঘরে গিয়ে আমরা ঢুকেছিলাম।

সময়টা তখন বিকেলও না, সন্ধ্যেও না। পশ্চিম আকাশের ধনুরেখা ধরে সূর্যটা বেশ কিছুক্ষণ আগেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। সূর্য নেই, তবু হঠাৎ লজ্জা পাওয়া মেয়ের আরক্ত মুখের মত আকাশ লাল হয়ে ছিল।

হল ঘরের চারদিকের জানালাগুলো ছিল বন্ধ। রঙিন কাচের পাল্লাগুলোর মধ্যে দিয়ে দিনান্তের যে রক্তিম আলোটুকু ভেতরে প্রতিফলিত হয়েছিল তাতে স্বপ্নময় মনে হচ্ছিল সব কিছু।

চারপাশের নীলাভ গোলাকার দেওয়ালে কালিদাসের বিভিন্ন কাব্য থেকে নানা ছবি আঁকা। কোথাও হরিণশিশু, কোথাও গাছ, জলভারনত মেঘ, ঋষি-আশ্রম, সখিবেষ্টিতা শকুন্তলা, বসন্তকালের প্রকৃতি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মাঝখানে একটা কার্পেট পাতা, জায়গায় জায়গায় সেটা ছেঁড়া। একধারে সিংহাসনের মত একটা কৌচ, সেটাকে ঘিরে অনেকগুলো কারুকাজ-করা সোফা। মধ্যে কাশ্মীরী টেবিল। মাথার ওপর হাতে-টানা পাখা আর ঝাড়লণ্ঠন। এককোণে পিয়ানো, আরেক কোণে বড় বড় ফুলদানি।

সুধাময় বলেছিল, 'বসুন—'

নিঃশব্দে, অত্যন্ত সন্তর্পণে এবং ভয়ে ভয়ে একটা সোফায় আলতোভাবে বসেছিলাম।

সুধাময় আবার বলেছিল, 'একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।'

'কোথায় যাচ্ছেন?'

'বাড়ির ভেতর।' বলে যে দরজা দিয়ে হল ঘরে ঢুকেছিলাম, সেটা দিয়ে নয়, অন্য আরেকটা দরজা দিয়ে ভেতর দিকে চলে গিয়েছিল সুধাময়।

আমার মনে হয়েছিল, এ বাড়ির সর্বত্র তার অবাধ অনায়াস গতিবিধি। একটু পর ফিরে এসে সুধাময় বলেছিল, 'আপনি থাকুন, আমি চলি।'

'মানে?'

'মানে আপনাকে এখানে পৌঁছে দেবার কথা ছিল, পৌঁছে দিয়েছি। আমার কাজটি ফুরলো, অন্য জায়গায় বিশেষ একটা দরকার আছে। এক্ষুনি যেতে হবে।'

'কী বলছেন, বুঝতে পারছি না।'

'বেশ, বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমার এখানে থাকার দরকার নেই। যাকে দেখতে এসেছেন তাকে খবর দিয়ে এসেছি। এক্ষুনি এসে পড়বে, আপনি বসুন।'

সুধাময়কে ধরে রাখা যায়নি। সে চলে গিয়েছিল।

আর আমার বুকে ডুরু ডুরু ঢাক বেজে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, আমাকে একলা ফেলে যাওয়া উচিত হয়নি সুধাময়ের। ভীষণ ভয় করছিল আমার, কপালে আর হাতের তালুতে ঘাম জমেছে, বুঝতে পারছিলাম। একবার ভেবেছিলাম, এভাবে এখানে আসা ঠিক হয়নি ভেবেছিলাম, পালিয়ে যাব। কিন্তু পালাতেও পারিনি।

এতকাল পর মনে হয়, ঘড়ির হিসেবে খুব বেশিক্ষণ বসে থাকিনি। কিন্তু সেদিন প্রতিটি মুহূর্ত একেকটি যুগ মনে হয়েছিল। সময় যেন টন টন ভারী হয়ে চারদিক থেকে আমার নিশ্বাস বন্ধ করে আনছিল।

জানালার রঙিন কাচে দিনের আলো মলিন হতে হতে যখন ছায়াচ্ছন্ন হয়ে এসেছে ঠিক সেইসময় খুট করে খুব আস্তে ভেতর দিকের দরজায় শব্দ উঠেছিল। চমকে চোখ তুলে দেখেছিলাম, পালকের মত পা ফেলে ফেলে সে—হ্যাঁ, সেদিনের সেই যাদুকরী—হল ঘরে চলে এসেছে।

না, কোন ভুল নেই। নিঃসংশয়ে সে-ই। শীতের রাতের আলো-আঁধারিতে যাকে স্বপ্ন মনে হয়েছিল, বিভ্রম মনে হয়েছিল, মনে হয়েছিল দিনের আলোয় কোনোদিন তাকে দেখা যাবে না, সে কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার সামনে দাঁড়িয়ে। লাস্ট ট্রেনের সেই সঙ্গিনী তবে মিথ্যে নয়, কল্পনা নয়, নিশার স্বপন নয়!

সেই সুবিশাল হল ঘরখানিতে সময় যেন কিছুক্ষণের জন্য তার সব স্রোত সব গতি হারিয়ে থমকে গিয়েছিল। একদৃষ্টে, স্থির নিষ্পলকে আমি তাকিয়ে ছিলাম।

দুই হাত জড়ো করে বুক পর্যন্ত তুলে সে বলেছিল, 'নমস্কার—'

নিজের অজ্ঞাতসারে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। হয়ত দু-হাত তুলে প্রতি-নমস্কারও জানিয়েছিলাম, হয়ত জানাই নি। কী করেছিলাম, এতকাল পর আর মনে পড়ে না। তবে পলকহীন তাকিয়ে যে ছিলাম তা অনায়াসেই স্মরণ করতে পারি।

আবছা আলোছায়ায় প্রথম তাকে যা দেখেছিলাম তার চাইতেও সে অনেক বেশি মাদকতাময়ী। দিনান্তের বিষন্ন-রক্তিম আলো এসে পড়েছিল তার চোখেমুখে, সর্বাঙ্গে, ফলে গায়ের রং গলানো গিনির মত মনে হচ্ছিল। জয়পুরী ফুলদানি যেন তার গলার উপমা। নীলাভ দুটি চোখ সরোবর হয়ে টলমল করছিল। কমলার কোয়ার মত পুষ্ট রসালো রক্তাভ ঠোঁট দুটি মদিরতায় মাখা, লাস্ট ট্রেনে প্রথম দেখেই মনে হয়েছিল, বাহু দুটি তার লতা আর আঙুলগুলি চাঁপার কলি। দ্বিতীয় বার তাকে দেখে ভেবেছিলাম, আহা, লতা এবং চাঁপার কলির চাইতে ভালো উপমা যদি কোথাও পাওয়া যেত!

সেদিন ছোট পানপাতার মত মসৃণ কপালের ওপর থেকে কুঞ্চিত ঘনকৃষ্ণ চুল পিঠময় ছড়িয়ে ছিল। বেগুনি রঙের টিপটি যেন চতুর্দশীর চাঁদ। চোখে ছিল সুর্মা অথবা কাজলের সূক্ষ্ম টান, কানে দক্ষিণী দুল, হাতে ব্রেসলেট, গলায় যে হারটা তার জড়োয়া লকেট বুকের কাছে দুলছিল। প্রসাধনের আর কী কী উপকরণ সেদিন সে ব্যবহার করেছিল, আজ আর মনে পড়ে না।

তবে তার দেহ থেকে উগ্র সুরভি নাকে এসে লেগেছিল। এই ঝিম ঝিম-করা গন্ধটা আমার চেনা, সেদিন ট্রেনে আর ফীটনে পাশাপাশি বসে ওটা প্রথম পেয়েছিলাম। ঐ গন্ধটা আমার নাকের মধ্য দিয়ে মাথার ভেতর ঢুকে স্নায়ুগুলোকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। পরনে তার ছিল জর্জেটের ধবধবে ফাঁপানো পোশাক।

রূপের অতিরিক্ত আরো একটা কী যেন পাতলা আবরণের মত, নাকি ধাম-তেলের মত তাকে জড়িয়ে ছিল। তক্ষুনি টের পেয়েছিলাম রমণীদেহের যে লক্ষণ পুরুষমানুষকে অস্থির, উদ্‌ভ্রান্ত আর উন্মাদ করে তোলে তার সবগুলিই তার মধ্যে ছিল। কামশাস্ত্রের পদ্মিনী, শঙ্খিনী, চিত্রিণী—এই তিন নায়িকার মিলিত রূপ হচ্ছে সে। তার আকর্ষণ তীব্র এবং অমোঘ, অভ্রান্ত আর গভীরসঞ্চারী।

সে হেসেছিল, ঠোঁটদুটি সামান্য দ্বিধাবিভক্ত হয়ে তিনটি মুক্তো বেরিয়ে পড়েছিল। বলেছিল, 'আপনি তো আর নিজের থেকে খোঁজ করলেন না। তাই সুধাময়বাবুকে দিয়ে আপনাকে ধরে আনতে হল। ও কি, দাঁড়িয়ে কেন, বসুন—' বলে মাঝখানে সেই সিংহাসনের মত কৌচটায় বসেছিল।

আমিও নিজের জায়গায় আবার বসে পড়েছিলাম। কাঁপা গলায় বলেছিলাম, 'খুঁজবার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু—'

'কী ?'

'আপনার নামটা যদি জানা থাকত—'

'নাম ছাড়া অন্য হদিস তো দিয়েছিলাম। সেগুলো ধরে এগুলে সহজেই আমাকে পেয়ে যেতেন। আসলে—' কথা শেষ না করে ঠোঁট টিপেছিল সে।

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলাম।

সে আবার বলেছিল, 'আসলে আমাকে খুঁজে বার করবার এতটুকু ইচ্ছাও আপনার ছিল না।'

তার অভিযোগটা সত্যি নয়। তাকে আর একবার অন্তত দেখবার জন্য মনে মনে একটা সপ্তাহ আমি অস্থির হয়ে ছিলাম। আমার ভাবান্তর আশেপাশের প্রায় সবার চোখেই ধরা পড়েছে। কিন্তু তা প্রমাণ করা অসম্ভব। অতএব চুপ করে থাকতে হয়েছিল।

সে আরো কী বলতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় ভেতর দিকের দরজা দিয়ে একটি বর্ষীয়সী মহিলা এ ঘরে এসেছিলেন। তাঁর চোখেমুখে, সারা দেহে মেয়েটির চেহারার আদল ছিল। দেখেই বোঝা গিয়েছিল মা এবং মেয়ে, কিংবা দুই বোন। বয়েসের তফাত না থাকলে যমজই বলা যেত।

বর্ষীয়সী পঞ্চাশোর্ধ্বে। গলানো গিনির মতই গায়ের রঙ ছিল একদা। কিন্তু সে

একদা আর নেই। অদৃশ্য মাকড়সা সারা গায়ে সরু রেখার জাল বুনতে শুরু করেছিল। বয়েসের মেদ জমেছিল ঘাড়ে, কাঁধে, গালে, চিবুকে, বাহুতে। ফলে তাঁকে ভারী, গম্ভীর দেখাচ্ছিল। তাই বলে থলথলে মোটেও নন, শরীরে বয়েসের তুলনায় অনেক বেশি বাঁধুনি ছিল।

শরীরের দিকে নয়, মাথার দিকে তাকিয়ে বয়েসটা যেন খানিক অনুমান করা যাচ্ছিল। কালো চুলের ফাঁকে ফাঁকে সেখানে অসংখ্য রুপোর তার।

সেই বয়সেও মহিলা বেশ শৌখিন। কানের ওপর দিয়ে পাতা কেটে চুল বেঁধেছিলেন, খোঁপায় রুপোর ফুল গোঁজা, যেখানে যে গয়নাটি পরলে তাঁকে মানায় সেটি সেখানেই ছিল। পোশাকরুচিও তাঁর চমৎকার। পরনে টাঙ্গাইলের নক্সাপাড় ফিনফিনে শাড়ি আর রেশমী ব্লাউজ।

সাজ দেখে তাঁকে সধবা মনে হয়েছিল কিন্তু কপালে অথবা সিঁথিতে সিঁদুর দেখিনি।

মহিলা আমার দিকে চোখ রেখে সেই মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'ছেলেটি কে রে?'

মেয়েটি বলেছিল, 'চিরন্তন গঙ্গোপাধ্যায়, খুব ভাল ছাত্র। থার্ড ইয়ারে পড়েন। ম্যাট্রিকে, আই. এস. সি-তে ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়েছেন।' আমাকে বলেছিল, 'উনি আমার মা।'

দু-জনের সম্পর্কের ব্যাপারে আমার প্রথম অনুমানটাই তা হলে ঠিক। অর্থাৎ মা আর মেয়ে। আমি উঠে গিয়ে প্রণাম করবার জন্য বর্ষীয়সীর পায়ের দিকে ঝুঁকেছিলাম। কিন্তু পা ছোঁবার আগেই প্রায় আতকে তিনি অনেকখানি পিছিয়ে গিয়েছিলেন। অস্ফুট কাতর কণ্ঠে বলেছিলেন, 'না-না—'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বিমূঢ় মুখে তাকিয়েছিলাম।

মহিলা আবার বলেছিলেন, 'আমাকে প্রণাম করতে নেই বাবা। প্রণামের যোগ্য আমি নই। তা ছাড়া তুমি ব্রাহ্মণ।'

বলেছিলাম, 'মায়ের কাছে ছেলের জাত আছে নাকি?'

'না বাবা, না—' জোরে জোরে মাথা নেড়ে বিব্রতভাবে মহিলা বলেছিলেন, 'তোমরা কথা বল। আমি যাই।' বলে একরকম ছুটেই পালিয়ে গিয়েছিলেন।

আমার বিমূঢ়তা কাটেনি। মা তো চলে গিয়েছিলেন, মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম, 'কী ব্যাপার বলুন তো? উনি আমার প্রণাম নিলেন না!'

'প্রণাম নিতে উনি অভ্যস্ত নন। এখানে যারা আসে তারা মাকে প্রণাম করে না।

'মানে ?'

'সব কথার মানে হয় নাকি। আর হয়ই যদি, এত তাড়াতাড়ি কি, কিছুদিন যদি যাতায়াত করেন নিজেই বুঝতে পারবেন।'

অতএব আমি চুপ।

সে আবার বলেছিল, 'যাক গে. আমার নাম জানবার জন্যে নিশ্চয়ই খুব ইচ্ছে হচ্ছে ?'

আস্তে মাথা নেড়ে জানিয়েছিলাম, হচ্ছে।

'আমার নাম নয়নতারা।'

আমি কী বলব, ভেবে পাচ্ছিলাম না।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর হঠাৎ একটা কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল। বলেছিলাম, 'আচ্ছা, সুধাময়বাবু আপনার কেউ হন ?'

'না, কেন ?'

'এমনি।'

'এমনি নয়, বলুন।'

খানিক ইতস্তত করে দ্বিধান্বিত স্বরে বলেছিলাম, 'ওর সঙ্গে কিভাবে আপনার আলাপ ?'

ঠোঁট ছুঁচলো করে নয়নতারা হেসেছিল। চোখের তারায় কাঁপন তুলে বলেছিল, 'আপনার সঙ্গে যেমন করে আলাপ হয়েছে ওর সঙ্গেও তেমনি হঠাৎ একদিন হয়েছিল।'

আমি নিরুত্তর।

এদিকে জানালার কাচ থেকে দিনান্তের শেষ আলোটুকু মুছে গিয়েছিল। বুঝতে পারছিলাম, বাইরে সন্ধ্যা নেমে গেছে। ঘরের ভেতরটাও অন্ধকার, ছায়াচ্ছন্ন।

নয়নতারা উঠে দাঁড়িয়ে ডেকেছিল, 'গোবিন্দ, গোবিন্দ—'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মধ্যবয়সী চাকরজাতীয় একটা লোক ঘরে এসে ঢুকেছিল। নয়নতারা তাকে বলেছিল, 'আলো জ্বালিয়ে দাও।'

এ বাড়িতে বিজলী আলোর দাক্ষিণ্য এসে পৌঁছয় নি, খুব সম্ভব তাকে দেউড়ি পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। মধ্যযুগের মত ঝাড়লণ্ঠনের ভেতর বড় বড় মোমবাতি ছিল। চাকরটা সেগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে একটু পর চলে গিয়েছিল।

রঙীন ঝাড়ের ভেতর থেকে দোলায়িত মোমের আলো হল ঘরে স্বপ্নলোকের বিভ্রম ছড়িয়ে দিয়েছিল।

নয়নতারা বলেছিল, 'চা খাবেন ?'

বলেছিলাম, 'আমি চা খাই না।'

'শুভ বয়।' নয়নতারা হেসেছিল, সে হাসিতে দ্রুত লয়ে জলতরঙ্গের টুং টাং বেজে গিয়েছিল। ট্রেনের কামরায় এমন জলতরঙ্গ আমি আগেও শুনেছি।

আমি নিশ্চুপ।

নয়নতারা বলেছিল, 'চা তো খাবেন না, তা হলে কী খাবেন বলুন ?'

'এখন কিছু খাব না।'

তা হ ে । সবাই আসুক, তখন একসঙ্গে বসে খাওয়া যাবে।'

'সবাই মানে ?'

নয়নতারা বলেছিল, 'একটু অপেক্ষা করুন, দেখতে পাবেন।'

বেশি দেরি করতে হয়নি। মিনিট পাঁচেক পর ভারী বুট মসমসিয়ে যিনি এসে হল ঘরে ঢুকেছিলেন তাঁর পরনে উত্তর প্রদেশী খাকি ব্রীচেস আর মিলিটারী ইউনিফর্মের মত জলপাই রঙের দুই বুক-পকেটওলা হাফ শার্ট। সিঁথিটা মাথার মাঝখান দিয়ে চুল দু-ভাগ করে গেছে। নাকের তলায় মোমে-মাজা এক জোড়া গোঁফ, সে দুটির প্রান্ত আবার ছুঁচের মত সূক্ষ্ম এবং পাকানো। চোখের তারা কটা। গালে লম্বা কাটা দাগ। পিঠের দিকে একটা দু-ব্যারেলের রাইফেল। ভদ্রলোকের পোশাকে, গালের কাটা দাগে এবং সঙ্গী রাইফেলটাকে ঘিরে সীমাহীন নিষ্ঠুরতা ছিল। বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি।

তা ছাড়া তাঁর চওড়া কাঁধ, বিশাল পেশল বুক, দীর্ঘ ছ'ফুট শরীর এবং জানু পর্যন্ত নেমে আসা হাত—সবই যেন অফুরন্ত বলশালীতার প্রতীক।

ভদ্রলোক হলে ঢুকে সোজা নয়নতারার কাছে চলে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'তোমার সভা এখনও জমেনি, দেখছি। সন্ধে হয়ে গেছে। ভাবছিলাম, লেট হয়ে গেছি, এর ভেতর তোমার পোষা কুকুরগুলো সবাই হয়ত এসে পড়েছে। এখন দেখছি আমিই ফার্স্ট এ্যাটেণ্ডাণ্ট।'

'উঁহু—' চোখ আধেক বুজে ঠোঁটে নিঃশব্দ হাসি ফুটিয়ে নয়নতারা মাথা নেড়েছিল।

কী ?'

'এখানে আসার ব্যাপারে কোনদিন আপনি ফার্স্ট হয়েছেন ?'

'অন্য দিন অবশ্য হইনি কিন্তু আজ হয়েছি।'

'না।'

'না, মানে ?'

'আমি ছাড়া আপনার আর কোনোদিকেই তো নজর থাকে না।' নয়নতারা

ঠোঁটের সেই হাসিটাকে ঢেউয়ের মত চোখেমুখে ছড়িয়ে দিয়েছিল, 'একবার পেছন ফিরে দেখুন তো—'

'পেছনে কী?' ভদ্রলোক অবাক। হয়ত ভেবেছিলেন, নয়নতারা তাঁর সঙ্গে ঠাট্টা-টাট্টা করছে।

'দেখুনই না—'

অগত্যা ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন ভদ্রলোক। তৎক্ষণাৎ আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গিয়েছিল। একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সবিস্ময়ে তিনি বলেছিলেন, 'ইনি—'

নয়নতারা হেসেই যাচ্ছিল, 'দেখলেন তো, আজও আপনি ফার্স্ট হতে পারেন নি।'

ভদ্রলোকের বিস্ময়ের ঘোর কাটে নি। তিনি বলেছিলেন, 'কিন্তু ইনি কে, তা বললে না তো? আগে আর কখনও তোমার এখানে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না!'

'মনে পড়ার কথা নয়, উনি আজই প্রথম এলেন। আসুন, আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই।' আমার পরিচয় দিয়ে ভদ্রলোক সম্বন্ধে নয়নতারা বলেছিল, 'উনি মিস্টার সোমনাথ ব্যানার্জী, নবীগঞ্জের জমিদার। তার চাইতেও বড় পরিচয় ওঁর পিঠের ঐ বন্দুকটায় রয়েছে। সেটা কী বলুন তো চিরন্তনবাবু?'

প্রশ্নটা আমার উদ্দেশে, উত্তরটা আমারই দেওয়া উচিত। কিন্তু কী উত্তর দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না। বিমূঢ় মুখে বলেছিলাম, 'আজ্ঞে, আমি মানে ঠিক—'

মিস্টার ব্যানার্জী অর্থাৎ সোমনাথ বলেছিলেন, 'আরে মশাই বন্দুক দেখেও বুঝতে পারছেন না? আমি শিকারী। বাঘ-ভাল্লুক মারা আমার শখ— হবি'। নেশাও বলতে পারেন।'

নয়নতারা বলেছিল, 'শুধু শিকারী নন, মস্ত শিকারী। সুন্দরবনের দশটা রয়্যাল বেঙ্গল, হাজারীবাগের বিশটা ভাল্লুক, পঁচিশটা বুনো মোষ, আরো যেন কি কি মেরে এখন বিগ গেম ছেড়ে দিয়েছেন। এখন ছোট্ট এক কবুতরীকে নিশানা করেছেন।' বলে চোখের কোণে কেমন করে যেন হেসেছিল।

সোমনাথও হেসেছিলেন, 'বাঘ- গণ্ডার মারা অনেক সহজ ছিল কিন্তু কবুতরীকে লক্ষ্যভেদ করা অনেক কঠিন কাজ।'

ওদের দু-জনের সাংকেতিক কথাবার্তা বুঝতে পারছিলাম না। বিমূঢ়ের মত তাকিয়েই ছিলাম।

চোখেমুখে ঝিলিক দিয়ে এবার হেসে উঠেছিল নয়নতারা, 'তাই নাকি মিস্টার ব্যানার্জী?'

'ভাই।' বলে আমার দিকে ফিরে সোমনাথ বলেছিলেন, 'পরিচয় হল, আসুন—' নিজের ডান হাতখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। অর্থাৎ পরিচয় পর্বটাকে তিনি করমর্দনের মধ্যে গাঢ় করতে চেয়েছিলেন।

আমি অবশ্য নমস্কার করার জন্য হাতজোড় করে বুকের দিকে তুলে আনছিলাম। সোমনাথ বলেছিলেন, 'উঁহু—উঁহু, দিশি মতে না, হাত বাড়িয়ে দিন।'

অতএব হাত বাড়াতে হয়েছিল। আর আমার হাতখানা নিজের বিশাল থাবার ভেতর নিয়ে প্রচণ্ড চাপ দিয়েছিলেন সোমনাথ। মনে হয়েছিল, হাড়গুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে।

'উঁ-উঁ-উঁ—' কাতর শব্দ করে হাতটা টেনে নিতে চেয়েছিলাম।

সোমনাথ হাত ছাড়েন নি। তাঁর চোখের তারা দুটি আমার মুখে স্থির নিবদ্ধ ছিল, সেখানে বিচিত্র এক নিষ্ঠুরতা খেলা করছিল। কিন্তু অত্যন্ত নিরীহ সদয় সুরে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী হল? লাগছে?'

উত্তর দিইনি। সোমনাথের চোখের দিকে তাকিয়ে আমার প্রাণের কোন অজ্ঞাত প্রান্তে ছায়া পড়েছিল। মনে হয়েছিল, এই মানুষটি সহজ নন। ভয়ে আমার হৃৎপিণ্ড দুরু দুরু করতে শুরু করেছিল।

সোমনাথের হাতের চাপে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। সেটা বোধ হয় তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। আমার হাত ছেড়ে দিয়ে খুব আস্তে, একমাত্র আমি যাতে শুনতে পাই, এমনভাবে ফিসফিসিয়ে বলেছিলেন, 'এই হিম্মত নিয়ে কম্পিটিশনে নামতে এসেছেন?'

কম্পিটিশন অর্থাৎ প্রতিযোগিতা। সেটা কিসের বুঝতে পারছিলাম না। তবে চকিত হয়ে উঠেছিলাম।

সোমনাথ এবার গলা তুলে বলেছিলেন, 'বসুন।' আমি বসলে, পাশের সোফাটায় তিনিও শরীর এলিয়ে দিয়েছিলেন।

একটু নীরবতা।

তারপর সোমনাথ নয়নতারাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'তা হলে আরেক জন ক্যাণ্ডিডেট বাড়ালে নয়ন?'

ভুরু নাচিয়ে নয়নতারা বলেছিল, 'ভয় পেয়ে গেলেন নাকি?'

সোফায় শরীর এলিয়ে ছিলেন সোমনাথ, দ্রুত খাড়া হয়ে বসে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বলা হয়নি। তার আগেই শৌখিন নাগরা পায়ে, নক্সাকরা কাশ্মীরী শালের প্রান্ত আর কুঁচনো মিহি ধুতি লুটোতে লুটোতে যিনি এসে ঢুকেছিলেন তাঁর বয়েস চল্লিশোর্ধ্বে অবশ্যই। রোগা ফুরফুরে চেহারা, উড়ু উড়ু চাঁদর,

ফাঁপানো চুল, ঢুলুঢুলু চোখ, হাঁসের মত লম্বা গলা।

ভেতরে ঢুকেই সুরেলা মিহি গলায় আগন্তুক আবৃত্তি করেছিলেন :

'জানি প্রিয়া, স্বপ্নদূতী, তুমি মোরে
ভালো বাসিয়াছ।
নন্দন-কাননে যবে ময়ূরী পেখম ধরে
কাছে আসিয়াছ।
তব লাগি প্রিয়তমা চাঁদের হৃদয় লুটে
আনিয়াছি আলো।
জানি তুমি—'

কবিতার উচ্ছ্বাস শেষ হবার আগেই শিকারী সোমনাথ হুঙ্কার ছেড়েছিল, 'একদম রোখ্‌কে—'

চমকে আবৃত্তি থামিয়ে নবাগত বলেছিলেন, 'কী ব্যাপার, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মত এমন গর্জন ছাড়লে কেন হে?'

'পিন পিন করে কী যেন বললে, ঐ সরু সরু লিকলিকে হাত দিয়ে চাঁদের হৃদয় না কী যেন লুটপাট করে আলো এনেছ?'

বলার ভঙ্গিতে হাসি পেয়েছিল. সেটা সামলাতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল। অনুমান করেছিলাম, আগন্তুকের সঙ্গে শিকারীর সম্পর্কটা মধুর প্রীতির।

আগন্তুক কেশরের মত চুলগুলি ঝাঁকিয়ে বলেছিলেন 'ও সব কাব্যের ব্যাপার, তোমার নিরেট মাথায় ঢুকবে না।'

'ঢুকতে দেবও না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। তবে—'

'কী?'

'তুমি ঐ সব আলো-টালো আনবার আগেই আরেক জন তা এনে বসে আছে।'

'কে হে, তুমি নাকি!' সকৌতুকে আগন্তুক বলেছিলেন, 'তুমি তো জানি বাঘছাল, মোষের শিং, হাতীর দাঁত—এসব এতকাল এনেছ। আজকাল আলো-টালো নিয়ে—'

'আমি না হে, আমি না।' সোমনাথ বলেছিলেন, 'চিরকালই তো তোমার হুঁশ কম, সব সময় ভাবের ঘোরে আছ। আমার ডান পাশের ভদ্রলোককে দেখ।'

আমার মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে কাঁপুনি বয়ে গিয়েছিল। শিকারীর এতক্ষণের খেলাটার লক্ষ যে আমিই, তা কি ভাবতে পেরেছিলাম! যাই হোক, আগন্তুকের দৃষ্টি এসে পড়েছিল আমার ওপর। সবিস্ময়ে বলেছিলেন, 'ইনি! নতুন মনে হচ্ছে—'

আমার পরিচয় দিয়ে সোমনাথ আগন্তুকেরও পরিচয় দিয়েছিলেন, কবি পারিজাত কুসুম চাকলাদার।

নমস্কার বিনিময়ের পর কবি পারিজাত আমার উদ্দেশে বলেছিলেন, 'হে নবাগত, নয়নতারা দেবীর এই ইন্দ্রাণীসভায় আপনাকে বরণ করে নিচ্ছি।' বলে একটা সোফায় গিয়ে বসেছিলেন।

কবি পারিজাতের পর একে একে আরো সাত-আট জন এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট টাউনের সব চাইতে বড ব্যবসায়ী ধনঞ্জয় কুণ্ডু। ঘোরকালো রং। মাথার চুল নিরপেক্ষভাবে সমান করে ছাঁটা, তেলে জলে কিংবা চিরুনিতে কোন কিছু দিয়েই সেগুলোকে নোয়ানো যায়নি, ফলে সজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে ছিল। শীতকাল বলে সাদা সার্জের পাঞ্জাবি আর কাঁচী ধুতি, পায়ে চকচকে পাম্প শু। গলায় সোনার সরু চেন, গোটা তিনেক দাঁতও তাঁর সোনা বাঁধানো। বেঁটে বেঁটে মোটা আঙুলগুলোতে গোটা সাতেক পাথর-বসানো আংটি। পাথরগুলোর কোনোটা হীরে, কোনোটা প্রবাল, কোনোটা পান্না, কোনোটা বৈদূর্যমণি, কোনোটা বা নীলা।

আরেক জনের নাম সিতাংশু চট্টোপাধ্যায়। কলকাতার এক বিখ্যাত কলেজের নামকরা অধ্যাপক। সুদর্শন, মার্জিত, সুশিক্ষিত। সেদিন নয়, পরে জেনেছিলাম, প্রতিদিন কলেজ ছুটির পর সন্ধের ট্রেনে তিনি ডিস্ট্রিক্ট টাউনে আসতেন। নয়নতারার সভায় হাজিরা দিয়ে লাস্ট ট্রেনে আবার কলকাতায় ফিরে যেতেন। এ একেবারে নিয়মিত এবং দৈনন্দিন। অবশ্য মাঝে মধ্যে একটা করে রাত জেলা শহরে কাটিয়ে যেতেন। কেন যেতেন, সে কথা পরে।

পঞ্চম ব্যক্তিটির নাম প্রেমকুমার মল্লিক। বিরাট সরকারী চাকুরে, গোলাকার গম্ভীর চেহারা। ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল আর চাওড়া ফ্রেমের চশমা তাঁর ব্যক্তিত্বে অতিরিক্ত মাত্রা জুড়ে দিয়েছিল। বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। মাথার চুলে অবশ্যম্ভাবী নিয়মে সাদা ছোপ ধরতে শুরু করেছিল। মুখের চামড়ায় বয়েস তার শিলালিপি এঁকে যাচ্ছিল। তবে হঠাৎ দেখলে এসব বোঝা যেত না। কলপ, প্রসাধন আর সুগন্ধি নির্যাসের অস্ত্রে জরাকে তিনি তফাতে রাখতে চেয়েছিলেন।

ষষ্ঠ ব্যক্তির নাম রাধহরি কুণ্ডু, ডিস্ট্রিক্ট টাউনের একমেব সিনেমা হাউসের মালিক। শৌখিন, মধ্যবয়স্ক। পরে জেনেছিলাম, কথায় কথায় খেউড় আওড়াতে আর আদিরসের মিশেল দিয়ে রসিকতা করতে ভালবাসেন।

সেদিন আরো কয়েক জন এসেছিলেন, এতকাল পর তাঁদের নাম আর মনে করতে পারি না।

তবে এটুকু মনে আছে, সবাই আমাকে দেখে প্রথমটা অবাক হয়েছিলেন আর একমাত্র কবি পারিজাত ছাড়া বাকি সবার সঙ্গেই নয়নতারা আমায় আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। পারিজাতের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন শিকারী সোমনাথ।

আরো একটা কথা মনে পড়ে, নয়নতারার সভায় যাঁরা এসে ভিড় জমাতেন তাঁরা সবাই কৃতী। ব্যবসা, শিকার, শিক্ষা, শিল্প, কাব্য—জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তাঁরা সফল। অকৃতী, অসফল একটি মানুষকেও সেখানে দেখতে পাইনি।

মনে পড়ছে, আমি ছাড়া সবাই শৌখিন, ধনী। তাঁদের পোশাক চমৎকার। সেই ধনবান আর কৃতী মানুষদের মেলায় আমি ভীত, কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত হয়ে ছিলাম। আমিই ছিলাম সেখানে সব চাইতে দরিদ্র, আমার পোশাকই সব চাইতে দীন, মলিন। অভাবের জন্য সর্বাঙ্গে অপুষ্টি ছিল, যৌবন তার দুর্বার ঢ- নিয়ে এসেও আমার স্বাস্থ্যকে ভরে দিতে পারেনি। বংশগ- রূপটুকু বাদ দিলে তখনও আমি কৃশ, করুণ।

আরেকটা কথা মনে পড়ে, নয়নতারার সিংহাসনটাকে ঘিরে গোল একটা মালার মত করে আমরা বসেছিলাম। মনে হচ্ছিল, নয়নতারা যেন সম্রাজ্ঞী, রাজেন্দ্রাণী। আর সবাই—আমাকে বাদ দিলে বয়স্ক, অভিজাত, জ্ঞানী, কৃতী এতগুলি মানুষ যেন তার বশংবদ প্রজা অথবা ক্রীতদাস।

ঝাড়লণ্ঠনের রঙীন আলোয় নয়নতারাকে অলৌকিক মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, সে বুঝি স্বর্গের অপ্সরা কিংবা রূপ এবং সৌন্দর্যের দেবী। আমি একদৃষ্টে বিহ্বলের মত মুগ্ধের মত তাকিয়ে ছিলাম।

এদিকে কখন যেন একসময় সেই চাকর জাতীয় লোকটা, যার নাম গোবিন্দ, একখানা দুধসাদা নক্সাপাড় শাল নয়নতারার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে এবং মাঝখানের টেবিলটায় চা এবং লোভনীয় মুখরোচক খাবারের স্তূপ সাজিয়ে রেখে চলে গিয়েছিল।

খেতে খেতে সবাই টুকরো টুকরো এলোমেলো কথা বলছিলেন। আমি কিন্তু স্বচ্ছন্দ হতে পারছিলাম না, খাবার অথবা চায়ের দিকে হাতও বাড়াই নি। নয়নতারার তা নজরে পড়েছিল। সে বলেছিল, 'এ কি, আপনি হাত গুটিয়ে কেন? নিন—খান।'

আধফোটা গলায় বলেছিলাম, 'আমার খিদে নেই—'

'আপনি ভারি লাজুক তো। খান বলছি—' কৃত্রিম ভ্রূভঙ্গ করে যেন আদেশই দিয়েছিল নয়নতারা।

সম্রাজ্ঞীর আদেশ পালনের জন্য ঘাড় গুঁজে এবার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

খাওয়ার পালা চুকলে কবি পারিজাত পকেট থেকে একটা সুদৃশ্য ফাউণ্টেন পেন বার করে নয়নতারার হাতে দিতে দিতে বলেছিলেন, 'এটা দেখ তো—'

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কলমটা দেখতে দেখতে নয়নতারার চোখ চক চক করে উঠেছিল। প্রশংসার সুরে বলেছিল, 'বাঃ, বাঃ। জিনিসটা চমৎকার তো। কোথায় পেলেন?'

'কিনেছি।'

'আপনার বেশ রুচি আছে।'

'বলছ?' কবি পারিজাত বিগলিত গদগদ হয়েছিলেন।

'নিশ্চয়ই।' ঘাড় কাত করে মধুর হেসেছিল নয়নতারা।

'কার জন্যে কিনেছি জানো?

'কার জন্যে?'

'তোমার।'

'সত্যি!'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, সত্যি গো—সত্যি।' কৃতার্থ কবির কণ্ঠ তরল শুনিয়েছিল। খুশিতে, অপরিমিত আনন্দে ডগমগ দেখিয়েছিল নয়নতারাকে। সরলা কিশোরীর মত হাততালি দিয়ে উঠেছিল সে। কলমটা বুকের কাছে আটকে রাখতে রাখতে বলেছিল, 'আপনি যে কী চমৎকার মানুষ, কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব—'

'ধন্যবাদ তো তোমার পাওনা। কলমটা নিয়ে আমায় তুমি ধন্য করেছ।' কবি পারিজাত কুসুম একেবারে চরিতার্থ হয়ে গিয়েছিলেন।

কবি আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় গলায় খাকারি দিয়ে উঠেছিলেন ধনঞ্জয় কুণ্ডু, 'আমার একটা কথা ছিল সখি।' 'সখি' শব্দটা নয়নতারার উদ্দেশে।

'বলুন—' হাসিহাসি জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল নয়নতারা।

ধনঞ্জয়ও তাঁর পকেট থেকে একটা আংটি বার করে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, 'দেখ তো এটা পছন্দ হয় নাকি?'

কবি পারিজাতের কলমটা যেভাবে দেখেছিল ঠিক সেইভাবেই আংটিটা দেখেছে নয়নতারা। তেমনই অভিভূত সুরে বলেছিল, 'ভারি সুন্দর জিনিস তো।'

'ওটা তোমার।'

'আমার?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তোমার আঙুল ছাড়া ওটা আর কারো আঙুলে মানাবে না।'

আহ্লাদীর মত মুখ করে ঘাড় হেলিয়ে নয়নতারা বলেছিল, 'তা হলে এটা পরে ফেলি?'

ধনঞ্জয় কুণ্ডু বলেছিলেন, 'পরবে বৈকি, তোমার জন্যেই তো আনা।'

'তা হলে আপনি পরিয়ে দিন—' নয়নতারা সামনের দিকে হাত মেলে দিয়েছিল।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—' ধনঞ্জয় কুণ্ডু মোটা ভারী থাবাটা যতখানি সম্ভব মোলায়েম করে নয়নতারার হাতখানা তুলে নিয়েছিলেন। তারপর আস্তে আস্তে বাঁ হাতের অনামিকায় আংটিটা পরিয়ে দিয়েছিলেন।

ধনঞ্জয়ের পর কলকাতার সেই বিখ্যাত অধ্যাপক বার করেছিলেন রুপোর সুদৃশ্য একটা ব্রোচ। সিনেমা হলের মালিক রাধাহরি কুণ্ডু দিয়েছিলেন সিল্কের শাড়ি। প্রেমকুমার মল্লিক দিয়েছিলেন হাতীর দাঁতের ময়ূরপঙ্খী। আর কে কে কী দিয়েছিলেন, মনে নেই।

শুধু মনে পড়ে সবার শেষে উঠেছিলেন শিকারী সোমনাথ। প্যান্টের পকেট থেকে একটা জড়োয়া নেকলেস বার করে নয়নতারার গলায় নিজের হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন।

আমার মনে হচ্ছিল, বশংবদ প্রজারা তাদের রাজেশ্বরীকে ভেট দিয়ে কৃতার্থ হচ্ছে। মনে হচ্ছিল, এতগুলি মানুষের ভেতর একটা প্রাণান্ত প্রতিযোগিতা চলছে, নয়নতারাকে উপহার দেবার প্রতিযোগিতা। আরো একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিলাম, কাউকেই প্রত্যাখ্যান করেনি নয়নতারা, একই রকম খুশি মুখে সবার উপহার নিয়েছে সে, সবাইকেই ধন্য করেছে।

কেন যেন আমার মনে হচ্ছিল, এখানে আসতে হলে নয়নতারার হাতে দেবার মত কিছু নিয়ে আসতে হয়। সেটা বোধ হয় এখানকার অলিখিত নিয়ম। আমি কিছুই আনিনি, সে জন্য অত্যন্ত কুণ্ঠিত এবং লজ্জিত বোধ করছিলাম। নিজের কাছেই আমার মাথা কাটা যাচ্ছিল।

উপহার পর্বের পর কবি পারিজাত হাত কচলে বলেছিলেন, 'আজ একটা কবিতা লিখেছি নয়ন, শুনবে?'

নয়নতারার চোখের তারায় আলো নেচে গিয়েছিল, 'নিশ্চই শুনব। পড়ুন—'

কবি পারিজাত সরু মিহি গলায় আবৃত্তি শুরু করেছিলেন। সেই কবিতাটা যেটা আওড়াতে আওড়াতে হল ঘরে ঢুকেছিলেন, তখন সেটা গোটা আবৃত্তি করতে পারেন নি, শিকারী সোমনাথের হুঙ্কারে থমকে যেতে হয়েছিল। এবার বিনা বাধায় সেটা পড়ে যেতে পেরেছিলেন। কোন এক স্বপ্নদূতী মানসীর জন্য নন্দনকানন থেকে, চাঁদের হৃদয় থেকে, ইন্দ্রসভা থেকে এবং আরো নানা জায়গা থেকে কী কী তিনি নিয়ে এসেছেন তারই দীর্ঘ মনোহর একটি তালিকা পেশ করে একসময় থেমেছিলেন।

নয়নতারা হাততালি দিয়ে উঠেছিল। মুগ্ধ স্বরে বলেছিল, 'খুব ভাল হয়েছে কি সুন্দর যে আপনি কবিতা লেখেন!'

প্রশংসায় কবি পারিজাত ডগমগ বিগলিত মুখে, শরীরখানা সাপের মত বাঁকিয়ে বলেছিলেন, 'তোমার তা হলে ভাল লেগেছে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ হাঁ। এমন কবিতা আগে আর কখনও শুনিনি। আচ্ছা কবি—'

'বল—'

'যার জন্যে এত এত কাণ্ড আপনি করেছেন সেই স্বপ্নদূতী মানসীটা কে বলুন তো?'

'বুঝতে পারো নি?' কবিকণ্ঠ এবার আহত শুনিয়েছিল।

'উঁহু—' চোখ আধেক বুজে চিবুক তুলে জোরে মাথা নেড়েছিল নয়নতারা।

ফিসফিসিয়ে কবি এবার বলেছিলেন, 'পরে বুঝিয়ে দেব।'

টের পেয়েছিলাম, এ সভার সভাকবি হচ্ছেন কবি পারিজাত। যাই হোক, এবার সিনেমা হলের মালিক রাধাহরি কুণ্ডু বলেছিলেন, 'আমি একটা হাসির গল্প শোনাতে চাই।'

'হাসির গল্প, কী মজা।' নয়নতারার চোখমুখ থেকে অপরিমিত খুশি যেন উছলে পড়েছিল, 'বলুন—বলুন—'

উঠে দাঁড়িয়ে অঙ্গভঙ্গি এবং অভিনয় সহযোগে মজাদার একটা গল্প বলেছিলেন রাধাহরি কুণ্ডু। বুঝেছিলাম এই ভদ্রলোক এ সভার বিদূষক।

হাসির গল্প শুনে আমরা প্রাণভরে হেসেছিলাম। সবার হাসি ছাপিয়ে জলপ্রপাতের কলধ্বনির মত নয়নতারার হাসি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, 'আপনি কি হাসাতে যে পারেন কুণ্ডু মশাই—'

'হাসাতে যে পেরেছি তাতেই আমি ধন্য।'

এর পর কলকাতার সেই নামকরা অধ্যাপক একখানা টপ্পা গেয়ে শুনিয়েছিলেন:

'নাগরী হে, আমি আর প্রেম করব না
ফিরে যাই।
ছি-ছি-ছি—
আমায় লোকে বলবে কি?
আমি আপনার প্রাণ পরকে দিয়ে
আপনি ঠকেছি।'

ইনিই তবে এই ইন্দ্রাণীসভার সভাগায়ক? অধ্যাপকের কণ্ঠ যে এত মধুর ধ্বনিময় আগে বুঝতে পারিনি। প্রশংসায় এঁকেও ধন্য করেছিল নয়নতারা।

অধ্যাপকের পর ধনঞ্জয় কুণ্ডুর পালা। তিনি বলেছিলেন, 'আমি ব্যবসাদার মানুষ, কাব্যি-গান-এ্যাক্টো ট্যাক্টো আমার আসে না। আমি বরং তাসের ম্যাজিক দেখাই।'

'তাসের ম্যাজিক! বাঃ বাঃ!' নয়নতারা ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল।

পকেট থেকে এক বাণ্ডিল তাস বার করে যাদুকরের মত নানারকম খেলা দেখিয়ে সবাইকে চমৎকৃত করে দিয়েছিলেন ধনঞ্জয় কুণ্ডু।

ভারিক্কী চেহারা এবং চালের ব্যবসাদার প্রেমকুমার মল্লিক শুনিয়েছিলেন বাঁশী। কী রাগ বাজিয়েছিলেন বুঝতে পারিনি, তবে তার সুর বিচিত্র আবেশে হল ঘরটাকে ভরে দিয়েছিল।

বাকি যাঁরা ছিলেন তাঁরা কী কী গুণ জাহির করেছিলেন, মনে নেই। তবে সবার শেষে শিকারী সোমনাথ হাজারীবাগের জঙ্গলে বাঘ শিকারের এক দুঃসাহসী রোমাঞ্চকর গল্প বলেছিলেন। শুনতে শুনতে ভয়ে আতঙ্কে আমাদের শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে এসেছিল।

একটা ব্যাপার অনুভব করেছিলাম, হৃদয়চর্চায় সবাই বেশ কুশলী, অভিজ্ঞ এবং চতুর। কাব্য-সঙ্গীত-বাঁশি, শিকার কাহিনী, অভিনয়, তাসের ম্যাজিক—সব কিছুর লক্ষ একটিই। তা নয়নতারার হৃদয়হরণ। এতগুলি জ্ঞানী-গুণী-ধনী, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষ উদ্‌ভ্রান্তের মত নিদারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিলেন যেন। যে ভাবেই হোক, যেমন করেই হোক, নয়নতারার নজরে পড়বেন, এই তাঁদের জীবনের একমাত্র প্রতিজ্ঞা।

আশ্চর্যের কথা নয়নতারার মনোভাব বুঝবার উপায় নেই, তার মন কোন অদৃশ্য সোনার কৌটোয় পোরা কে বলবে। সমুদ্রের অতল তলে কোন মুক্তোঝিনুকের ভেতর শুক্তির মত নিজের হৃদয়টিকে সে লুকিয়ে রেখেছিল, তা খুঁজে খুঁজে এতগুলি পুরুষ একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেটা যে কোথায়, কে তার হদিস দেবে।

এতগুলি মানুষ নানাভাবে তাকে আরতি করে যাচ্ছিল, এত উপহার দিচ্ছিল কিন্তু কোনটা তার সব চাইতে মনে ধরেছিল, বুঝবার উপায় নেই। রুপোর ব্রোচ পেয়ে সে যতখানি উচ্ছ্বসিত, জড়োয়া গয়নাটি তার চাইতে বেশি উল্লসিত করতে পারেনি। একই রকম হাসি বিতরণ করে নয়নতারা সবার সব উপহার হাত পেতে নিয়েছিল। কবিতা-অভিনয়-ম্যাজিক, সব কিছুই তাকে সমান মুগ্ধ সমান চমৎকৃত করেছিল। এটার চাইতে ওটা এক তিল বেশিও না, কমও না। এমন রহস্যময়ীর মনের কথা পড়তে পারা সহজ নয়।

গল্প, তাদের ম্যাজিক ইত্যাদি হয়ে যাবার পর হঠাৎ আমার ওপর দৃষ্টি পড়েছিল নয়নতারার। হাসিমুখে বলেছিল, 'আপনি তো কিছু করলেন না—'

কাঁপা গলায় বলেছিলাম, 'কী করব ?'

'এই গান-বাজনা-গল্প-আবৃত্তি, যা আপনার ইচ্ছে—'

'আমি—আমি—আমি—' সেই শীতের রাতে আমি ঘেমে নেয়ে উঠেছিলাম।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ আপনি। নিন শুরু করুন—'

'আমি তো, আমি তো—'

নয়নতারার এবার বোধ হয় করুণা হয়েছিল, 'আজ প্রথম দিন, থাক তবে। এর পর যেদিন আসবেন সেদিন কিন্তু এমনি এমনি ছাড়া পাবেন না, একটা কিছু দেখাতে বা শোনাতে হবে।'

আমি উত্তর দিইনি।

রাত বেড়ে যাচ্ছিল। লক্ষ করেছিলাম, সভাসদদের অনেকেই চঞ্চল হয়ে উঠতে শুরু করেছেন। ধনঞ্জয় কুণ্ডু অবশেষে বলেছিলেন, 'আমরা যা শোনাবার শোনালাম, যা দেখাবার দেখালাম। এবার তোমার খেলা শুরু কর নয়ন—'

'আমার খেলা!' নয়নতারা চোখ তুলে তাকিয়েছিল।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেই লটারীটা—'

অন্য সবাই সমস্বরে সায় দিয়েছিলেন, 'অনেক রাত হল. লটারীটা সেরেই ফেল। দেখি আজ কার কপাল ভাল।'

কিসের লটারী বুঝতে পারছিলাম না। বিমূঢ়ের মত এর ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছিলাম।

নয়নতারা বলেছিল, 'বেশ, সবার যখন ইচ্ছে তখন ওটা সেরেই ফেলি। আপনারা একটু বসুন, আমি কাগজ কলম নিয়ে আসছি।'

নয়নতারা উঠে ভেতরে চলে গিয়েছিল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাগজ ছুরি আর কলম নিয়ে ফিরে এসেছিল। সম্রাজ্ঞীর সেই আসনটিতে আবার বসে ধীরে সুস্থে ছোট ছোট অনেকগুলো চারকোণা টুকরো করে কাগজটা কেটেছিল সে। আমরা হল ঘরে যে ক জন পুরুষ ছিলাম তাদের নাম আলাদা করে একেকটা কাগজে লিখে লিখে ভাঁজ করে ফাঁকা কাগজগুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল। তারপর সেগুলো ভাল করে ঝাঁকিয়ে একটা প্লেটের মধ্যে রেখে সামনের টেবিলটায় রেখেছিল। বলেছিল, 'ধনঞ্জয়বাবু, একটা কাগজ তুলে আমার হাতে দিন।'

কথামত ধনঞ্জয় কুণ্ডু নয়নতারার হাতে রুদ্ধশ্বাসে একটা কাগজের টুকরো তুলে দিয়েছিল। ভাঁজ খুলে নয়নতারা দেখেছিল, কাগজটা ফাঁকা, তাতে কোন নাম

লেখা নেই। লক্ষ করেছিলাম, ধনঞ্জয় কুণ্ডুর মুখখানা হতাশায় কালো হয়ে গিয়েছিল।

নয়নতারা এবার অধ্যাপককে কাগজ তুলতে বলেছিল। এ কাগজটাও ফাঁকা।

অধ্যাপকের পর কবি পারিজাত কুসুম, শিকারী সোমনাথ, প্রেমকুমার মল্লিক—একে একে সবাই দমবন্ধ করে কাগজ তুলেছিল। সবার কাগজই শূন্য, নামচিহ্ন-হীন। লক্ষ করেছিলাম, ধনঞ্জয় কুণ্ডুর মত সবার মুখই নৈরাশ্যে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।

সবার হয়ে গেলে আমাকে ডেকেছিল নয়নতারা, 'আপনি বসে কেন, আসুন।'

বলেছিলাম, এ ভাগ্য পরীক্ষা কিসের?'

'পরে বলব, আগে একটা কাগজ তো তুলে দিন।'

কিছু না বুঝেও অপার কৌতূহলের বশে এক টুকরো কাগজ তুলে নয়নতারার হাতে দিয়েছিলাম।

কাগজের ভাঁজ খুলে আমার চোখে চোখ রেখে ঠোঁট টিপে বিচিত্র হেসেছিল নয়নতারা। হাসির অর্থ না বুঝে আমি বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে ছিলাম।

অধ্যাপক জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী ব্যাপার, নাম কিছু উঠেছে?'

'হ্যাঁ।' নয়নতারা ঘাড় কাত করেছিল।

'কার, কার?' হলের প্রায় সবাই সমস্বরে চিৎকার করে উঠেছিলেন।

নয়নতারা আমার দিক থেকে চোখ সরায় নি। দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ফিসফিসিয়ে বলেছিল, 'আজ নতুন যিনি এসেছেন তাঁর।'

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে থেকে জোড়া জোড়া তীক্ষ্ণ ঈর্ষাকাতর চোখ আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সবাইকে দেখতে দেখতে হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। আমার নাম ওঠাতে কী এমন ব্যাপার ঘটেছিল যাতে সবার মর্মদাহের কারণ হয়েছিলাম? বুঝতে পারছিলাম না।

সবাইকে দেখতে দেখতে শিকারী সোমনাথের চোখে এসে আমার দৃষ্টি থমকে গিয়েছিল। সে চোখ বাঘের চোখের মত জ্বলছিল, হত্যা সেখানে ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছিল। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, বুকের ভেতরে দুরু দুরু কাঁপতে শুরু করেছিল। ভদ্রলোক কেন এমনভাবে তাকিয়েছিলেন সেদিন সেই মুহূর্তে বুঝিনি, বুঝেছিলাম অনেক পরে। পরের কথা আগে বলে লাভ নেই।

ধনঞ্জয় কুণ্ডু অসীম হতাশার সুরে বলে উঠেছিলেন, 'তা হলে আর কি, নাম যখন উঠে গেছে অকারণে বসে থেকে আর কী হবে। রাতও ঢের হয়েছে, এবার ওঠা যাক—'

ঈর্ধার্জর হতাশের দল একে একে বিদায় নিয়েছিলেন। সবাই চলে গেলে আমি বলেছিলাম, 'এবার আমিও চলি। আর দেরি করলে হোস্টেলের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।'

'সে কি, আপনি কেন যাবেন। লটারীতে আপনার নাম উঠল না!'

'লটারীতে নাম উঠলে কী হয়?'

'তার যাওয়া হয় না। তাকে নিয়ে আমি—'

'তাকে নিয়ে কী?' আমি উন্মুখ হয়েছিলাম।

নয়নতারা বলেছিল, 'তাকে নিয়ে ফীটনে করে আমি বেড়াতে বেরুই। অনেকক্ষণ ঘুরে আবার এই বাড়িতে ফিরে আসি। তারপর বাকি রাতটুকু একসঙ্গে কাটিয়ে দিই।'

আচ্ছন্নের মত নয়নতারার দিকে তাকিয়েছিলাম। সে যা বলেছিল তার অর্থ বুঝেও যেন বুঝতে পারছিলাম না। যে অনুভূতি দিয়ে মানুষ বুঝতে পারে সেটাই যেন ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল আমার। তবে টের পেয়েছিলাম, আমার হৃৎপিণ্ডের ভেতর দিয়ে কি এক শিহরণ দুর্বার বেগে বয়ে চলেছে।

নয়নতারা বলেছিল, 'চলুন, আগে খাওয়া-দাওয়া সেরে নি। তারপর বেরুব।'

'এখানে খাব!'

'তাতে জাত যাবে না। আমাদের বাড়ি যে রাঁধে সে বামুন।'

'জাতের কথা নয়, বলছিলাম হোস্টেলে ফিরে গিয়ে—'

'সারা রাত আমার কাছে থাকবেন, হোস্টেলে ফেরার তো প্রশ্নই ওঠে না। আসুন—' নয়নতারা উঠে দাঁড়িয়েছিল।

এরপর ঘোরের মধ্যে নয়নতারার পিছু পিছু কত বারান্দা, অলিন্দ, দরজা পার হয়ে অন্দরমহলের কোন একটা ঘরে পৌঁছেছিলাম, এতকাল পর আর মনে করতে পারি না। এখন প্রৌঢ় বয়েসে কেউ যদি আমাকে সেই ঘরখানা খুঁজে বার করতে বলে, পারব না।

মনে আছে সেই মধ্যবয়সিনী মহিলাটি—নয়নতারার মা—সে ঘরে ছিলেন। আমাকে দেখে মেয়েকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আজ এই ছেলেটির নাম উঠল নাকি?' তাঁর বলার সুরে বিস্ময়ের একটু টান ছিল।

মনে হয়েছিল, লটারীর কথা নয়নতারার মা জানেন।

নয়নতারা বলেছিল, 'হ্যাঁ, মা।'

'কিন্তু—'

'বল।'

'সেই শিকারী জমিদার ভদ্রলোক, কি যেন নাম ?'

'ব্যানার্জী সাহেব—'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ব্যানার্জী সাহেব ছাড়া এতকাল তো কারো নাম লটারীতে উঠত না। আজ ছেলেটি নতুন এল, আর আসা মাত্রই নাম উঠে বসল ?'

নয়নতারার মায়ের কণ্ঠস্বরে কি সংশয়ের আভাস ছিল ? সে উত্তর এতকাল পর আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। সেই মুহূর্তে আমি কিন্তু শিকারী সোমনাথের মুখখানা ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম। চিরদিন তাঁর নামই লটারীতে উঠেছে, আমি আসতে তাঁর দুর্ভাগ্যের শুরু, সেই জন্যই কি অমন বাঘের মত হিংস্র নিষ্ঠুর চোখে তাঁর ভাগ্যের নতুন ভাগীদারকে বিদ্ধ করছিলেন ? যত ভাবছিলাম আমার সমস্ত সত্তা ততই চকিত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছিল।

নয়নতারা বলেছিল, 'রোজ ব্যানার্জী সাহেবের নাম যে উঠবে, তার কি কোন ঠিক আছে। অন্য লোকের ভাগ্যও তো এক আধদিন ফিরতে পারে।'

আমার কেন মনে হয়েছিল লটারীতে নাম ওঠার ব্যাপারে নয়নতারার হাতে কিছু কারসাজি আছে।

যাই হোক লটারীর ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন করেন নি নয়নতারার মা। একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিলেন, 'তারপর আজ কে কী দিলে ?'

জড়োয়ার হার, আংটি, শাড়ি, কলম—যে যা দিয়েছিল,সব সঙ্গে করে এনেছিল নয়নতারা। সেগুলো মায়ের হাতে দিতে দিতে বলেছিল, 'এই নাও—'

উপহারগুলো একপাশে একটা টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে নয়নতারার মা হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আজ যে সব চাইতে ভাগ্যবান সে কী দিলে ?,

ভাগ্যবান বলতে যে আমি তা অনায়াসেই বুঝতে পেরেছিলাম। মুহূর্তে আমার হৃদ্‌স্পন্দন থমকে গিয়েছিল যেন। নয়নতারার সভায় সেদিন আমি নতুন এসেছিলাম। উপহার দেওয়া যে সেখানে একটা নিয়ম, আমার পক্ষে তা জানা সম্ভব ছিল না। আর জানা থাকলেই বা কি, উপহার দিতামই বা কোথা থেকে ? আমার সে সামর্থ্য বা আর্থিক সচ্ছলতা কোথায় ?

এত যে সপ্রতিভ সাবলীলা নয়নতারা, সে-ও একটুক্ষণ চুপ করে ছিল। তারপর আস্তে আস্তে টেবিল থেকে সোমনাথের দেওয়া জড়োয়া নেকলেসটা তুলে নিয়ে বলেছিল, 'এইটা—এই হারখান চিরন্তনবাবু আমায় দিয়েছেন।' গলার স্বর তার বিন্দুমাত্র কাঁপেনি।

আমার ওপর কেন যে নয়নতারার এমন অসীম অনুগ্রহ, বুঝতে পারছিলাম না। তবে এ যে মিথ্যে, নিদারুণ নির্ভেজাল মিথ্যা—এই কথাটা গলা ফাটিয়ে চিৎকার

করে বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু কেউ বুঝি ভেতর থেকে কণ্ঠস্বরটাকে সবলে দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরে রেখেছিল। ফলে এতটুকু আওয়াজ সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পথ পায়নি।

এবার নয়নতারার মা হঠাৎ যেন আমার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। একটা টেবিলকে ঘিরে খানকয়েক কারুকাজ-করা চেয়ার সাজানো ছিল। দেখেই অনুমান করেছিলাম, ওটা খাবার টেবিল। একটা চেয়ার দেখিয়ে সাদরে তিনি বলেছিলেন, 'বসো বাবা, বসো—'

আমি বসেছিলাম। অনুমানে বুঝেছিলাম, উপহারের মাপে এখানে আপ্যায়নের ঘটাও কমে, বাড়ে।

খানিকক্ষণ এলোমেলো কথার পর নয়নতারার মা বলেছিলেন, 'তুমি রাত্রিতে ক'টার সময় খাও ?'

'সাড়ে ন'টা নাগাদ।'

'সাড়ে ন'টা তো বাজতে চলল, এবার খেতে দিতে বলি ?'

আমি চুপ করে ছিলাম।

নয়নতারা বলেছিলেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, দিতে বল।'

নয়নতারার মা গলা চড়িয়ে ডেকেছিলেন, 'বামুন দিদি—অ বামুন দিদি—'

মনে আছে সেদিন প্রায় নেমন্তন্ন বাড়ির খাওয়া খেয়েছিলাম। তিন চার রকমের মাছ, পাঁঠার মাংস থেকে শুরু করে দই-মিষ্টি-লুচি-পায়েস-চাটনি—প্রায় একটা রাজসূয়ের ব্যবস্থা ছিল। নয়নতারার মা কাছে বসিয়ে জোর করে করে আকণ্ঠ খাইয়েছিলেন। বলতে ভুলেছি, নয়নতারাও ঐ সময় খেয়ে নিয়েছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর একটা সুগন্ধি মশলাদার পান দিয়েছিলেন নয়নতারার মা। খেয়েছিলাম—জীবনে সে-ই আমার প্রথম পান খাওয়া।

পান মুখে দেবার পর নয়নতারা বলেছিল, 'চলুন, একটু ঘুরে আসি—'

নয়নতারার পিছু পিছু হেঁটে অলিন্দ-খিলান-বারান্দা পার হয়ে একসময় বাইরে সেই উঁচু উঁচু গথিক থামগুলোর কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। কি আশ্চর্য, এখন সেখানে সিঁড়ির তলায় সেদিনের সেই ফীটনটাকে দেখতে পেয়েছিলাম। ফীটনটাকে কে কখন এখানে এসে দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়েছিল, কে বলবে।

নয়নতারা ডেকেছিল, 'মকবুল—'

কোচোয়ানের বাক্স থেকে সাড়া এসেছিল, 'জী—'

'ঘুমিয়ে পড়নি তো ?'

'ঘুমোলে কি করে সাড়া দিলাম দিদিজী ?'

'তা বটে।' হেসে নয়নতারা আমার দিকে ফিরেছিল, 'চলুন, গাড়িতে গিয়ে বসা যাক।'

দু-জনে পাশাপাশি গাড়িতে বসেছিলাম। সেই সেদিনের মত। ঠিক সেদিনের মত নয়। সেদিন লাস্ট ডাউন ট্রেন থেকে নেমে ফীটনে আমরা পাশাপাশি বসেছিলাম ঠিকই, তবে মাঝখানে খানিক দূরত্ব ছিল। আজ খুব নিবিড় হয়ে বসেছিল নয়নতারা।

ওপর থেকে মকবুল বলেছিল, 'কোন দিকে যাব দিদিজী?'

'কোনদিকে যাবে?' নয়নতারা খানিক ভেবে বলেছিল, 'নদীর ধারে যে রাস্তাটা, সেই দিকে চল—'

ফীটন চলতে শুরু করেছিল। বাড়ির কম্পাউণ্ড থেকে বেরুবার পর সেই চলায় দুলকি তালের দোলা লেগেছিল। ফলে গাড়িটা দুলছিল।

নয়নতারা খুব ঘন হয়ে বসার জন্য গাড়ির দোলানিতে তার গায়ে আমার গা ঠেকে যাচ্ছিল, তার নিশ্বাস এসে পড়ছিল আমার কাঁধে। তার শরীর থেকে, চুলের অরণ্য থেকে উগ্র মাদক একটা গন্ধ আমাকে যেন মাতাল করে তুলতে শুরু করেছিল।

নয়নতারার পাশে বসে একবার, মাত্র একবার আমার ঝুলনের কথা মনে পড়েছিল। ঝুলনদেরও একটা ফীটন ছিল। কিন্তু আশ্চর্য, কোনদিন সে আমাকে এভাবে পাশে বসিয়ে বেড়াতে বেরোয় নি।

গাড়ির তালে তালে আরো এগিয়ে আসছিল নয়নতারা। তার বাহুর, উরুমূলের স্পর্শই শুধু পাচ্ছিলাম না, অজস্র অপর্যাপ্ত চুল মাঝে মাঝে আমার চোখমুখ ঢেকে দিচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম, আমার সমস্ত সত্তা কি একটা অতলতায় ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে।

নিজের আচ্ছন্ন বিহ্বলতা কিংবা সম্পূর্ণ আত্মবিলুপ্তি ঘটবার আগেই মনটাকে অন্য দিকে ফেরানো দরকার। প্রায় জোর করেই বলে উঠেছিলাম, 'আচ্ছা—'

'বলুন—'

'তখন মাকে ঐ মিথ্যে কথাটা কেন বললেন, সত্যিই তো ঐ হারটা আমি আপনাকে দিইনি—'

ফিসফিসিয়ে নয়নতারা বলেছিল, 'আমার ইচ্ছে তাই বলেছিলাম—'

'কিন্তু কেন?' জিজ্ঞাসু চোখে নয়নতারার দিকে তাকিয়েছিলাম।

'আপনাকে আজকের রাতের রাজা করব বলে।'

একটু চুপ করে থেকে বলেছিলাম, 'আপনার সভা তো দেখলাম। এখানে আসতে হলে রাজেন্দ্রাণীর জন্যে ভেট আনা বুঝি নিয়ম?'

'রাজেন্দ্রাণীর। ভেট—বলেছেন ভালো। রাজেন্দ্রাণী যখন বললেন তখন ভেট পেট্রিআনতেই হবে।'

লাস্ট ট্রেনে যেদিন আসি সেদিনকার মত আকাশে কুয়াশা ছিল না। দুধের মত ধবধবে জ্যোৎস্নায় চারদিক ধুয়ে যাচ্ছিল। শীতটাও যেন ঢের কম। পাশে বসে-থাকা নয়নতারাকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। নয়নতারার সাদা জর্জেটের ফাঁপানো পোশাক স্তূপীকৃত ফেনার মত মনে হচ্ছিল, তার পটে মুখখানা মনে হচ্ছিল গভীর নিশীথে সবার চোখের আড়ালে ফোটা কোন শুভ্র ফুলের মত।

কুণ্ঠিতভাবে বলেছিলাম, 'কিন্তু আমি তো কিছু নিয়ে যাইনি। আমি জানতাম না যে—'

'ভয় নেই, সে জন্যে আপনার গর্দান নেব না।' নয়নতারা বলেছিল, 'আর এখন ওসব আপনাকে ভাবতে হবে না।' বলতে বলতে আমার একটা হাত নিজের কোলে তুলে নিয়ে আঙুলে আঙুল জড়িয়ে খেলা করতে শুরু করেছিল।

আমার চোখমুখ নাক কান ঝাঁ ঝাঁ করছিল। কী করব, ভেবে পাচ্ছিলাম না। অসাড় দেহে অবশ অনুভূতিতে কাঠ হয়ে বসে ছিলাম।

আমার আঙুলের সঙ্গে নিজের আঙুলের ফাঁস পরাতে পরাতে হঠাৎ এক কাণ্ডই করে বসেছিল নয়নতারা। আবছা গলায় বলেছিল, 'আপনার কোলে একটু শুই?'

উত্তর দিতে পারিনি। কিছু একটা বলতে অবশ্য চেষ্টা করেছিলাম, গলায় স্বর ফোটে নি। আজন্ম আমি বোধ হয় বোবা। সারাজীবনে কখনও কোনদিন কথা বলেছি কিনা, সেই মুহূর্তে এ সম্বন্ধে আমার সংশয় হচ্ছিল।

আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকেনি নয়নতারা। কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়েছিল।

রমণী সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার ঘরে সেদিন একটি মাত্র কিশোরীই ছিল, সে ঝুলন। কিশোরী ঠিক না, কৈশোর আর যৌবনের মাঝখানে তখন সে পা রেখে-ছিল।

এমনিতে ঝুলনের রসনা ক্ষুরধার, তীক্ষ্ণ সে মুখরা, স্বচ্ছন্দ, সাবলীলা। কিন্তু এক জায়গায় আশ্চর্য কুণ্ঠিত, দ্বিধাগ্রস্ত সেখানে সে ভীরু হরিণী অথবা সেই লাজুক লতাটি ছুঁতে গেলেই যে গুটিয়ে যায়। জীবনের বাঞ্ছিত পুরুষটির কাছে নিজের হৃদয়খানি মেলে ধরতে তার দশটি বছর লেগেছিল। প্রাণের আড়ালে অস্ফুট বঙ্কিম কুঁড়িটিকে পরিপূর্ণ ভগভগে ফুলে প্রস্ফুট করে তুলতে মনে মনে কত কাল সাধনা করেছে, শুধু সে-ই জানত।

কিন্তু এই মেয়েটি, নয়নতারা—প্রথম পরিচয়েই সে আমাকে তার ফীটনে তুলে-

ছিল। দ্বিতীয় দিন দেখার পর সে আমার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিল। আমার সংক্ষিপ্ত সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার জগতে এমন রমণীর অস্তিত্ব কোথাও ছিল না। অভিজ্ঞতা দূরে থাক, কোনদিন এমন প্রমত্তা, মদালসা, স্বেচ্ছাচারিণীর কথা শুনিও নি।

আমার স্মৃতিতে ঝুলনের একটি মাত্র স্পর্শই ছিল, একটি মাত্র চুম্বন। সেই স্পর্শ এবং চুম্বনটির জন্য দশ বছর ধরে নিজেকে প্রস্তুত হতে হয়েছে।

রমণী-রমণ- রণে অনভিজ্ঞ আমি, দিশাহারা আমি, শঙ্কাভীরু আমি— মনে হচ্ছিল, আমার হৃৎপিণ্ড জমাট বেঁধে যাচ্ছে। আমার কোলে শায়িতা যে মদিরেক্ষণা ঊর্ধ্ব-মুখে নির্নিমেষে মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল, তাকে নিয়ে কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। আমার বিমূঢ় অস্তিত্ব, আমার বিহ্বল ইন্দ্রিয় সবাই সমস্বরে যেন চিৎকার করে বলছিল, দুই উন্মাদ বাহুবেষ্টনে এই দুর্লভাকে বুকের কাছে এনে পীড়িত কর, ওষ্ঠের স্বাদু উষ্ণতা শুষে শুষে মাতাল হয়ে যাও। কিন্তু আমার চিরন্তন ভীরুতা বাদ সাধছিল, বাধা দিচ্ছিল। আমার ইচ্ছাশক্তিকে আমার সমস্ত পৌরুষকে সে দুর্বল, শক্তিহীন, অসাড় করে রেখেছিল।

অলস মন্থর গলায় নয়নতারা একসময় ফিসফিসিয়ে উঠেছিল, 'অমন চুপ করে বসে কেন?'

এতক্ষণে আমার গলার স্বর ফুটেছিল। কাঁপা শিথিল স্বরে বলেছিলাম, 'কী করব?'

হঠাৎ খিল খিল করে শরীরে আঁকাবাঁকা হিল্লোল তুলে হেসে উঠেছিল নয়ন-তারা। হঠাৎ যেমন হাসি শুরু করেছিল তেমনই হঠাৎ সেটা থামিয়ে গুনগুনিয়ে গেয়েছিল:

'সে কেন রে করে অপ্রণয়,
ও তার উচিত নয়।
আঁখিতে যে কত হেরে
সকলি কি মনে ধরে?
এই পোড়া মন যাকে মনে ধরে
সেই তো মনোরঞ্জন।
তবু কেন রে সে করে অপ্রণয়,
ও তার উচিত নয়—'

কখন গুনগুনানি থামিয়ে দিয়েছিল নয়নতারা, খেয়াল নেই। তবে তার রেশ বাইরের চাঁদের আলো, নিঝুম নির্জন রাতের সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গিয়েছিল।

আমার মনে হয়েছিল, নয়নতারার এ গান নিতান্ত অকারণে নয়। এর নেপথ্যে কিছু একটা অর্থ ছিল—গভীর, ইঙ্গিতময় এবং গহন-সঞ্চারী। কিন্তু হায়, আমি তা বুঝতে পারছিলাম না, তার ইঙ্গিত ধরতে পারছিলাম না।

শহর ছাড়িয়ে একসময় আমরা প্রান্তবাহিনী নদীর পারে চলে এসেছিলাম, নদীটার স্থানীয় নাম মৌরেয়া। কে জানে তার মানে কী।

নদীর পার ধরে দু-ধারে সারিবদ্ধ গাছগুলিকে সাক্ষী রেখে দীর্ঘ জনহীন পথ সোজা চলে গেছে। গাছের পাতার ফাকফি দিয়ে টুকরো টুকরো চাঁদের আলো এসে পড়েছিল রাস্তায়। নদীর জল তরল রুপোর ঢল হয়ে গিয়েছিল। ঢেউগুলোকে ঢেউ মনে হচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল লক্ষ লক্ষ রুপোর মাছ লাফালাফি করে যাচ্ছে।

আমার কোণের ভেতর সব চাইতে দুর্লভ রূপের স্তূপ উন্মুখ হয়ে ছিল, ঠোঁটের কাছে সুধার পাত্র সাজানো ছিল কিন্তু হাত বাড়িয়ে তাকে যে ছোঁব ঠোঁট নামিয়ে সুধাপাত্র যে চুমুক দেব তেমন শক্তি আমার মধ্যে আর অবশিষ্ট ছিল না।

নয়নতারা জিজ্ঞেস করেছিল 'কেমন লাগল গান?'

স্খলিত স্বরে বলেছিলাম, 'খুব ভাল।

'মানে কিছু বুঝলেন গানটার?'

ঢোক গিলে উত্তর দিয়েছিলাম, 'না।'

'তা কেন বুঝবেন, তা কেন বুঝবেন—'অতর্কিতে ছিলাছেঁড়া ধনুকের মত বিদ্যুৎবেগে উঠে বসেছিল নয়নতারা। উত্তেজনায় বুক ওঠানামা করছিল, চোখ দুটি নীলার মত জ্বলছিল।

নয়নতারার রূপান্তর আমাকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। গোঙানির মত শব্দ করে কী বলেছিলাম, এতকাল পর আর মনে করতে পারি না।

সাপের শিসের মত আওয়াজ করে নয়নতারা আমাকে ধিক্কার দিয়েছিল, 'অপদার্থ কোথাকার? আমারই ভুল হয়েছিল, আগে বুঝলে আজকের রাতটা এভাবে নষ্ট হত না।'

আমি চুপ। আমার অপদার্থতার প্রমাণ কিভাবে নয়নতারা পেয়েছিল, কিভাবে আমি তার রাতটা নষ্ট করে দিয়েছিলাম—বুঝতে পারিনি। না বুঝেও অপরাধীর মত মাথা নীচু করে বসে ছিলাম।

নয়নতারা এবার চিৎকার করে কোচোয়ানকে বলেছিল, 'গাড়ি ফেরাও মকবুল—'

সে সময় দু-বার নয়নতারার সংস্পর্শে এসেছিলাম। তাকে রহস্যময়ী, যাদুকরী মনে হয়েছিল। কিন্তু এমন অসহিষ্ণু উগ্র উত্তেজিত রূপ আগে আর দেখিনি।

হঠাৎ সে কেন যে এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, রমণীর রীতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ সেদিনের আমি বুঝতে পারিনি।

গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে মকবুল বাড়ির দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

নয়নতারা বলেছিল, 'আপনাকে আগে বাড়িতে নিয়ে যাই, তারপর দেখব সত্যি সত্যিই অপদার্থ কিনা। না কিছু পদার্থ আছে?'

আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমার আতঙ্ক প্রায় শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে গিয়েছিল। নিরীহ আত্মকেন্দ্রিক, মুখচোরা মানুষ আমি। সবার কাছ থেকে সন্তর্পণে চিরদিন নিজেকে লুকিয়ে রেখেছি। নিভৃত নির্জন থেকে ছিঁড়ে এনে আমাকে নিয়ে কোন ভয়ঙ্কর খেলায় মেতেছিল নয়নতারা? কেন ঝড়ের দোলায় আমাকে ছুঁড়ে দিয়েছিল? কী উদ্দেশ্য তার?

অস্পষ্ট গলায় বলেছিলাম, 'আমি হোস্টেলে যাব।'

'হোস্টেলে যাবেন মানে।' তীক্ষ্ণ চিৎকারে রাত্রিটাকে বিদীর্ণ করে দিয়েছিল নয়নতারা।

'আমার ভীষণ ভয় করছে।'

'ভয় করছে!'

'হ্যাঁ—'আমার গলার স্বর অতলে ডুবে গিয়েছিল।

'ভীতু কোথাকার।' বলেই খিল খিল শব্দ করে উন্মত্তের মত হেসে উঠেছিল নয়নতারা। মনে হয়েছিল, তার ওপর অশরীরী একটা আত্মা ভর করে বসেছে।

এরপর আর কোন কথা হয়েছিল কিনা, মনে নেই। শুধু মনে পড়ে, সেদিন আর নয়নতারার বাড়িতে গিয়ে নিশিযাপন করতে হয়নি। এটুকু অনুগ্রহ সে অন্তত করেছিল, করুণাবশে হোস্টেলের সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল।

নামিয়ে যাবার সময় আমার দিকে ফিরেও তাকায় নি, একটি কথাও বলে নি। তবু অনুমান করেছিলাম, তার মুখে যেন জগৎ ঘৃণা আর ধিক্কার মাখানো ছিল।

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে সে মকবুলকে হুকুম করেছিল, 'বাড়ি চল—'

অত রাত্রে হোস্টেল বাড়িতে কেউ জেগে ছিল না। সতর্ক পা ফেলে ফেলে নিজের ঘরের কাছে এসে হীরুর ঘুম ভাঙিয়েছিলাম।

আমাকে দেখে হীরু হতভম্ব। বলেছিল, 'কি রে, বাড়ি যাসনি?'

মুখ লুকিয়ে কোনরকমে উত্তর দিয়েছিলাম, 'না।'

'তোর স্যুটকেস পড়ে রয়েছে। ভাবলাম ভুল করে ফেলে গেছিস।'

আমি চুপ।

হীরু আবার বলেছিল, 'বাড়ি যাসনি, তা এত রাত পর্যন্ত ছিলি কোথায় ?'

জড়িত স্বরে কী উত্তর দিয়েছিলাম, মনে নেই।

হীরু ঈষৎ উদ্বিগ্ন সুরে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোর শরীর কি ভালো নেই ?'

'ভালই।'

হীরু কী আন্দাজ করেছিল জানি না। বলেছিল, 'তোর কী হয়েছে বল তো ?'

'কিছু না' হীরুর দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল তাকালেই ধরা পড়ে যাব। বিকেল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে যা যা ঘটেছে সবই যেন আমার চোখেমুখে কেউ ছাপ মেরে দিয়েছে।

'কিছু না বললেই হল !' হীরু এগিয়ে এসে আমার কাঁধে একখানা হাত রেখেছিল।

হীরুকে হতবাক করে তার হাতখানা ঠেলে দিয়ে নিজেকে বিছানায় ছুড়ে দিয়েছিলাম। হীরুর প্রতিক্রিয়া যাতে দেখতে না হয় সে জন্য তাড়াতাড়ি কম্বল মুড়ি দিয়ে পাশ ফিরেছিলাম।

বারো

মনে আছে, জীবনে সেই প্রথম বিবিবাজারের বাহিরে, দাদু-দিদিমা-মা-ভাইবোনদের বাদ দিয়ে শনিবারের রাত কেটেছিল আমার।

পরের দিন রবিবার। সকালবেলা চোখ মেলতেই দেখেছিলাম, হীরু তার বিছানায় বসে পলকহীন আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চোখোচোখি হতেই চোখ ফিরিয়ে জানালার বাহিরে নিয়ে গিয়েছিল সে। কখন সে উঠেছিল, কতক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, বলতে পারব না।

বাইরে সুদূর নীলাকাশে সাঁতার-ক্লান্ত ক'টি পাখি ছাড়া আর কিছু দর্শনীয় বস্তু ছিল না। আশ্চর্য, খুব মনোযোগ দিয়ে মগ্ন হয়ে তা-ই দেখছিল হীরু।

কিন্তু আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলাম, হীরুর ঐ দেখাটা ছলনা মাত্র। আসলে সে মনে মনে আহত হয়েছে, ক্ষুব্ধ হয়েছে। কাল বিকেল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত কোথায় কিভাবে কেটেছে, হীরু বার বার জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও বলিনি। আমাদের দীর্ঘ বারো বছরের বন্ধুত্বে এমন দুর্ঘটনা আর কখনও ঘটে নি। কোনোদিন কোন ব্যাপার হীরুর কাছে লুকোই নি, ছাপাই নি। হীরুও আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলেনি। পরস্পরের কাছে দু-জনের ভিতর-বাহির এবং অন্ধবন্ধের সকল দিকই আমরা মেলে ধরেছিলাম।

কিন্তু কেমন করে তাকে নয়নতারার কথা বলব ? না, তা অসম্ভব। জীবনে সেই প্রথম হীরুর কাছে আমার কিছু গোপন করা। কাজেই হীরু যে আমাকে ক্ষমা করতে পারছিল না, বরং ক্ষোভে-অভিমানে কষ্ট পাচ্ছিল, তা টের পেতে অসুবিধে হয়নি। কিন্তু আগের দিনের সব ঘটনা খুলে বলে বিপন্ন বন্ধুত্বটাকে আবার যে সহজ করে তুলব, তাই বা কি করে সম্ভব ? হীরুর জন্য মনে মনে খানিক অসহায় যে বোধ করছিলাম না, তা নয়।

হীরুর ভাবনা আমাকে কিন্তু খুব বেশিক্ষণ বিব্রত রাখতে পারেনি। এমন কি মা-দিদিমা-দাদু-ভাইবোনেরা, বিবিরাজার, ঝুলন—কারো কথাই ভাবতে পারছিলাম না। ডিষ্ট্রিক্ট টাউনে আসার পর সেই প্রথম একটা শনিবার যে ঝুলনের সঙ্গে দেখা হয়নি—এমন একটা ব্যাপারও আমার ভাবনায় বিশেষ রেখাপাত করতে পারেনি।

সবাইকে পেছনে সরিয়ে বার বার ঘুরে ঘুরে আমার ভাবনায় সেই মেয়েটির মুখ দেখা দিচ্ছিল। সেই মেয়েটি যার নাম নয়নতারা। নিশাব স্বপনের মত মাত্র দু-বার তাকে দেখেছি আব এই দু-বারেই আমার সমস্ত অস্তিত্বে, আমার মর্মমূলে সে আলোড়ন তুলেছিল। প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগের মত আমার সত্তার গভীরে কোথায় যেন অবিরত ভাঙচুর শুরু হয়েছিল।

নয়নতারা কে ? সে কি স্বৈরিণী ? স্বেচ্ছাচারিণী ? বহুজনেব সম্ভোগের জন্যই কি তার সৃষ্টি ? পরিচয় তার যা-ই থাক, যতই ঘৃণ্য আর কদর্য হোক, আচ্ছন্ন অস্তিত্বে তার মোহ কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। আমার রক্তের প্রতি কণায়, আমার প্রাণের চারিদিকের দেওয়ালে তার হাসি, কণ্ঠস্বব বেজে বেজে যাচ্ছিল। আমি ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছিলাম, এবং অসহিষ্ণু ও উত্তেজিত।

আগের দিন রাত্তিরে নয়নতারাকে খুব ভয় লাগছিল। মনে হচ্ছিল, সর্বনাশের শেষ প্রান্তে সে আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে। কাদার মত তাল তাল ধিক্কাব আর ঘৃণা আমার মুখে ছুঁড়ে দিয়ে সে হোস্টেলের সামনে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। তবু তার কাছে যাবার জন্য আমার দেহের প্রতিটি পরমাণু উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। কি বিচিত্র তার ঘৃণা, কি নিদারুণ তার আকর্ষণ।

নয়নতারার সভায় যাব কিন্তু সে তো কাল যেতে বলে যায়নি। বিনা ডাকেই কি অনাহুতের মত হাজিরা দেব ? আমার হৃদপিণ্ড ফাটিয়ে চৌচির করে কে যেন লাফালাফি দাপাদাপিতে আকাশ-পাতাল রসাতলে পাঠিয়ে সমানে চিৎকার করে যাচ্ছিল—যেতে হবে, যেতে হবে, যেতে হবে।

জীবনে কোন কিছুরই তো আমার অভাব ছিল না। দাদু-দিদিমার উচ্ছ্বসিত

স্নেহ, ভাইবোনেদের শ্রদ্ধা, হীরুর বন্ধুত্ব—সবই তো পেয়েছিলাম। মায়ের মমতা ছিল কিছু চাপা, নিরুচ্ছ্বাস, অনেকটা বরফে-ঢাকা সাগরের মত। কিন্তু আমার চাইতে কে আর ভাল জানত, ওপরের আচ্ছাদনে একটু আঘাত দিতে পারলে ভেতর থেকে অফুরন্ত একটা ফোয়ারা বেরিয়ে আসবে। বাবাও যে ক'বার এসেছেন অপার স্নেহে আমাকে ঢেকে দিয়েছেন। সবার ওপরে ছলি ঝুলন। প্রথম যৌবনের সমস্ত সুষমা আর মাধুর্য, নিষ্পাপ দেহের ডালি সাজিয়ে জগতের সবটুকু পবিত্রতা আমাকে দেবার জন্য সে উন্মুখ হয়ে ছিল।

বুঝতে পারছিলাম, নয়নতারার কথা ভাবা পাপ, তাকে চিন্তা অন্যায়। কিন্তু আমি অসহায়, দুর্বল এক যুবক—আমার সাধ্য কি নয়নতারাকে দূরে সরিয়ে রাখি! তার আকর্ষণ এত তীব্র, এত দুর্বার, এত অমোঘ যে আমার যা কিছু পুরাতন, এতকাল যে জগতে হাত-পা মেলে ফুসফুসে বাতাস টেনে বড় হয়েছি, সব কিছু থেকে আমাকে উন্মূল করে ছুটিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিল।

হ্যাঁ, আমি যাব, যাব, যাব। অনাহূতের মতই যাব, বিনা আহ্বানেই যাব। একদিন ধিক্কার নিয়ে ফিরেছি, এবার জয়মাল্য নিয়ে আসব।

হঠাৎ আমার মনে হয়েছিল, যাব তো কিন্তু সেই সুবেশ সৌখিনদের মেলায় আমি একেবারে বেমানান, মূর্তিমান ছন্দপতন। সঙ্গে সঙ্গে নজর গিয়ে পড়েছিল নিজের পোশাকের ওপর। লংক্লথের আধময়লা শার্ট, মিলের মোটা ধুতি তার ওপর শীতের জন্য জ্যালজ্যালে একটা পুলওভার—কাল এই বেশেই আমি গিয়েছিলাম।

জীবনে কোনদিন নিজের সাজসজ্জা অথবা পোশাক-টোশাকের দিকে ফিরেও তাকাই নি। তেমন রুচি বা সৌখিনতা কোনটাই ছিল না। হাতের সামনে যা পেয়েছি, ছেঁড়া কি ময়লা কি মোটা, ফিরেও দেখিনি। অন্যমনস্কের মত পরে ফেলেছি।

সেদিন কিন্তু মনে মনে স্থির করেছিলাম, শৌখিন রাজহাঁসের রাজ্যে অন্ত্যজ কাদাখোঁচার মত যাব না, পোশাকে কিঞ্চিৎ চেকনাই অন্তত ফোটাতে হবে। কিন্তু তেমন ঝকমকে জেল্লাদার পোশাক কোথায় আমার? নিজেকে যে রঙীন মলাটে মুড়ব, তেমন সামর্থ্য নেই। অতএব কী করা?

মনে পড়ে, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত, কিভাবে পোশাক যোগাড় করা যায়, ভেবে ভেবে অস্থির হয়েছিলাম। ওদিকে হীরু মুখ কালো করে আড়ে আড়ে শুধু আমাকে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। খুব কাছে সে আসছিল না, একটা কথাও বলছিল না।

ভেবে ভেবে অস্থিরতা আমার যখন চূড়ান্তে সেই সময় হীরুর কথাই মনে পড়েছিল। কি আশ্চর্য, হীরু থাকতে আমি কিনা দামী বাহারে জামাকাপড়ের

কথা ভেবে দিশেহারা হচ্ছিলাম ? ওর বাক্স বোঝাই কত যে চমৎকার চমৎকার জামা-প্যান্ট ধুতি-পাঞ্জাবি, তার হিসেব নেই।

মনে আছে নিজেই সেধে হীরুর সঙ্গে কথা বলেছিলাম, 'এ্যাই হীরু, আমার ওপর রাগ করেছিস ?'

মুখ ভার করে সে বলেছিল, 'না।'

ক্ষোভ যে তার কাটেনি সে সম্বন্ধে আমার মনে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। এ সম্পর্কে অবশ্য আর কোন প্রশ্ন করিনি। ঘন হয়ে অন্তরঙ্গ সুরে অন্য কথা বলেছিলাম, 'হীরু, আমাকে একটা জিনিস দিবি ?'

'কী ?'

'তোর একটা ধুতি, একটা পাঞ্জাবি, নতুন শালটা আর—'

'আর কী ?' হীরু অবাক।

'গেল মাসে নতুন যে পাম্প-শু্য কিনেছিস, সেটা—'

হীরুর চোখেমুখে বিস্ময় ছিলই। একটু রসিকতার লোভও ছাড়তে পারে নি। বলেছিল, 'হঠাৎ বরবেশের কী দরকার পড়ল রে ?'

আরক্ত মুখে বলেছিলাম, 'কী বলছিস যা তা !'

'যা তা !'

'নয় তো কী ? কোনদিন জামাকাপড়ের দিকে তোর নজর তো ছিল না।' হীরু সাময়িকভাবে ক্ষোভ, দুঃখ ভুলে ঠাট্টায় মেতে উঠেছিল, 'ছেঁড়া ময়লা জামাকাপড় পরেই তো আমার বোনটাকে মজিয়েছিস ! ও ঝামেলা মিটেই গেছে। তবে আবার জামাইবাবু সাজবার ইচ্ছে কেন ? নাকি—'

'কী ?'

'আর কারো মনোহরণ করতে হবে ?'

নিতান্ত পরিহাসের সুরেই বলেছিল হীরু। তবু আমার বুকের ভেতর দিয়ে চমক খেলে গিয়েছিল। হীরু কি অন্তর্যামী ? নাকি ভাল সাজসজ্জার কারণটা আমার চোখেমুখে লেখা ছিল ? জড়িয়ে জড়িয়ে আধফোটা গলায় বলেছিলাম, 'বাজে কথা বলতে হবে না। যা চাইলাম দিবি কিনা বল—'

'দেব না বলেছি ? বাক্স খুলে নিয়ে নে না—'

আমি তৎক্ষণাৎ হীরুর স্যুটকেস থেকে ধুতি-পাঞ্জাবি টাঞ্জাবি বার করে নিয়েছিলাম।

হীরু বলেছিল, 'এবার বল দেখি, কাল কোথায় ছিলি ?'

হঠাৎ আমি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম, 'জামাকাপড় দিয়েছিস বলে জবাবদিহি

করতে হবে নাকি? এই শর্তে যদি দিয়ে থাকিস তোর জামাকাপড় রেখে দিলাম, আমার দরকার নেই—'

ফস করে খুব বেশি পাওয়ারের আলো নিভে গেলে যেমন হয় হীরুর মুখখানা তেমনি মলিন হয়ে গিয়েছিল। ঠোঁটদুটো থর থর কাঁপতে শুরু করেছিল। কি যেন বলতে যাচ্ছিল সে, আর সেই সময় আমার পরের ভাই মুকুল ঘরে এসে ঢুকেছিল।

মুকুল বিবিবাজারে ক্লাস টেনে পড়ত। এর আগে কোনোদিন ডিস্ট্রিক্ট টাউনে আমার হোস্টেলে একা একা আসেনি। তাকে দেখে বুকের ভেতরটা কেঁপে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, কিছু একটা অশুভ ব্যাপারের দূত হয়ে সে বিবিবাজার থেকে ছুটে এসেছে। ভয়ে ভয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কি রে, হঠাৎ তুই এলি?'

'কাল তুমি যাওনি, এদিকে—' বলতে বলতে মুকুল হঠাৎ থেমে গিয়েছিল।

'কী?'

'তুমি গেল শনিবারে বাড়ি গিয়ে রবিবার এখানে এলে। আর সোমবার থেকেই দাদুর খুব জ্বর। অ্যাদ্দিন একরকম যাচ্ছিল, কাল রাত থেকে খুব বাড়াবাড়ি চলছে, জ্ঞান নেই। মা আমাকে পাঠিয়ে দিলে, শিগগীর চল।'

যা আশঙ্কা করেছিলাম, তা-ই। রুদ্ধশ্বাসে বলেছিলাম, 'সোমবার থেকে জ্বর, আগে খবর দিস নি কেন?'

'শনিবার তো তুমি যাওই, তাই মা আমাকে পাঠায় নি। তা ছাড়া এমন বাড়াবাড়ি তো ছিল না।'

'চল। ঘণ্টাখানেকের ভেতর একটা ট্রেন আছে, সেটা ধরতে হবে।'

হীরু পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনেছিল। ঘর থেকে বেরুতে যাব, সে বলেছিল, 'তোদের সঙ্গে আমি যাব?'

হীরুর মত বন্ধু পাওয়া পরম সৌভাগ্য, আমার জীবনে সে ঈশ্বরের আশীর্বাদের মত। খানিক আগে তাকে ক্ষুব্ধ করেছি, আহত করেছি, কষ্ট দিয়েছি ভেবে গ্লানিতে মন ভরে গিয়েছিল। মাথা নীচু করে বলেছিলাম, 'তোর এখন যেতে হবে না। দরকার হলে খবর পাঠাব।'

'আচ্ছা। আর হ্যাঁ—'

'বল—'

'গিয়ে যদি কোন অসুবিধে হয়, বাবাকে জানাবি। কোনরকম সঙ্কোচ করবি না।'

'আচ্ছা—' আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম।

মৃত্যু যে এমন আকস্মিকভাবে দাদুর শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছিল, কে জানত: আমার হোস্টেলে এসে মুকুল জানিয়েছিল, শনিবার থেকে দাদুর জ্ঞান নেই। জ্ঞান আর ফেরেওনি। আমি বিবিবাজারে আসার ঘণ্টা তিনেকের ভেতরেই চিরদিনের জন্য দাদু আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

দাদু—আমার জীবন থেকে আনন্দময়, ভোজনবিলাসী, রসিক মানুষটির ভূমিকা শেষ হল।

দাদুর মৃত্যুর পর দিদিমাও বেশিদিন বেঁচে থাকেন নি। মাত্র দিনসাতেক পর তিনিও আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

একটা কথা এখনও আমি নির্ভুল মনে করতে পারি। দাদুর মৃত্যুতে দিদিমা কিন্তু একটুও কাঁদেন নি, তাঁর চোখে এক বিন্দু জল কেউ দেখেনি। দাদুকে যখন শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় তখন উদ্‌ভ্রান্তের মত বারকয়েক শুধু বলেছিলেন, 'এভাবে আমাকে ফেলে গেলে, এমন কথা তো ছিল না। না, কিছুতেই না। একা একা কেমন করে আমি থাকব?'

দিদিমার মুখে সেই শেষ কথা। তারপর একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। শুধু কথাই না, খাওয়াও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। হাজার পীড়াপীড়ি করেও এক বিন্দু জল তাঁকে খাওয়াতে পারিনি। একটা সপ্তাহ এভাবে কাটবার পর রাত্রিবেলা তিনি যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, সেই তাঁর শেষ ঘুম। ঘুমের ভেতরেই তাঁর জীবনের সমাপ্তি নেমে এসেছিল।

কৈশোরের শুরু থেকেই দাদুর সঙ্গে নিজের জীবনকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন দিদিমা। তারপর দীর্ঘ পঞ্চাশটা বছর দাদুর পায়ে পায়ে ফিরেছেন, স্বামীর প্রতি কথায় প্রতিটি কাজে তাল দিয়ে বেজে উঠেছেন। সারা জীবনে একটা দিনও কোন ব্যাপারে তাঁদের মতের অমিল ঘটেনি, পরস্পরকে ছেড়ে একটা দিনও তাঁরা থাকেন নি। মৃত্যুর সাধ্য কি, সাত দিনের বেশি তাঁদের বিচ্ছিন্ন রাখতে পারে!

দাদু আর দিদিমা আমাদের ওপর বনস্পতির মত ছায়া মেলে রেখেছিলেন। নিমেষে ছায়ার আড়াল সরে গিয়েছিল। এবার থেকে আমাদের সামনে, যতদূর চোখ যায়, শুধু রুক্ষ কর্কশ নিষ্করুণ পথ।

পর পর দুটো মৃত্যু। তারা এসেছিল অভাবনীয় রূপে, বিন্দুমাত্র ভূমিকা না করে। তাদের জন্ত আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। অতর্কিতে আলো নিভে যাবার মত আমাদের চারপাশে চাপ চাপ অন্ধকার নিবিড় হয়ে এসেছিল।

পরিণত বয়েসের মৃত্যু—তা একান্ত স্বাভাবিক। তবু আমাদের প্রত্যাশা ছিল ভিন্ন, ভেবেছিলাম দাদু-দিদিমা আরো দীর্ঘায়ু হবেন। মৃত্যু মাত্রেই অপূরণীয় ক্ষতি, তার শূন্যতা সহজে পূরণ হবার নয়। কিন্তু দাদু-দিদিমার সমাপ্তি আমাদের যেখানে ঠেলে দিয়েছিল তার একটাই নাম—অনাহার। দুটি মৃত্যু, বিশেষ করে দাদুর মৃত্যু সংসারের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। সামনে-পেছনে-ডাইনে অথবা বাঁয়ে কোনদিকেই বাঁচবার মত একটি পথও খোলা ছিল না।

বলতে ভুলেছি, আমাদের পরম দুঃখের দিনে সব সময় কাছে কাছেই ছিলেন হীরুর বাবা। দাদুর অসুখের খবর পেয়েই তিনি ছুটে এসেছিলেন। তারপর থেকে প্রতিদিন দু-বেলা আসতেন। দাদু যেদিন মারা যান, তার এক সপ্তাহ পর দিদিমাও স্বামীর পায়ের চিহ্ন ধরে বিদায় নিলেন—এই দু-দিন হীরুর বাবাই শুধু আসেন নি, হীরুর মা-ও এসেছিলেন, ঝুলন এসেছিল। হীরুর বাবা-মা আমাদের সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, সজল চোখে সহানুভূতি মিশিয়ে বার বার ঘুরে ঘুরে আমাদের দিকে তাকিয়েছিল ঝুলন। জেলা শহর থেকে হীরুও এসেছিল।

সংসারে পুরুষ মানুষ বলতে অনভিজ্ঞ আমি আর নাবালক ভাইয়েরা। কাজেই হীরুর বাবা শ্মশানে যাবার ব্যবস্থা, শ্রাদ্ধ শান্তির আয়োজন, সবই নিজে করেছিলেন। ক'টা দিন অপার সমবেদনায় তিনি আমাদের ঢেকে রেখেছিলেন।

শ্রাদ্ধের দিন ওঁদের বাড়ির সবাই তো এসেই ছিলেন। তার পরও তাঁর যাওয়া-আসা বন্ধ হয়নি। দিনে অন্তত একবার করে আসতেন। মাকে বলতেন, 'কিছু দরকার থাকলে আমাকে বলবেন, একেবারেই সঙ্কোচ করবেন না।'

মৃদু গলায় মা বলতেন, 'সঙ্কোচ করব এমন পথ কি আপনি খোলা রেখেছেন ?'

শ্রাদ্ধ শান্তির পর শোকের প্রাথমিক প্রবল উচ্ছ্বাসটা খানিক স্তিমিত হয়ে এলে নিদারুণ একটা প্রশ্ন আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, এবার থেকে সংসারটা কিভাবে চলবে ?

আমি তখন ভাইবোন এবং সংসারের চিন্তায় অস্থির। বলেছিলাম, 'পড়া ছেড়ে দিয়ে চাকরি করব।'

মা তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, 'পড়া ছাড়বি! এত বড় সাহস তোর, আমার সামনে এ কথা তুই মুখে আনতে পারলি!'

'না এনে কী করব বল। সবাইকে বাঁচতে তো হবে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর দাদু যখন বলেছিল চাকরিতে ঢুকতে তখনই যদি ঢুকতে দিতে—'

আমার কথা শেষ হবার আগেই মা শরীরের সবটুকু শক্তি গলায় ঢেলে দিয়ে চিৎকার করেছিলেন, 'বকু!'

ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, 'কী বলছ?'

'মনে রাখিস আমি এখনও বেঁচে আছি। যতক্ষণ আমি কিছু না বলছি, ততক্ষণ পড়া চালিয়ে যাও।'

'কিন্তু—'

'বলছি না, আমার মুখের ওপর কথা বলবি না। ছেলেবেলায় মার খেতিস, এই বুড়ো বয়েসেও কি মার খাবার ইচ্ছে হয়েছে?'

আমি চুপ। মা খানিক কী ভেবে বলেছিলেন, 'এক কাজ করিস, ঝুলনের বাবাকে একটু ডেকে আনিস তো। আচ্ছা তোর যেতে হবে না, মুকুলকে পাঠাব'খন।'

সেই দিনই হীরুর বাবা এসেছিলেন। তাঁকে ঘরের ভেতর একটা চেয়ারে বসিয়ে মা দরজার আড়ালে ভুরু পর্যন্ত ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি হীরুর বাবার কাছেই ছিলাম।

হীরুর বাবা বলেছিলেন, 'আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কিছু দরকার আছে?

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' ঘোমটার ভেতর মা মাথা নেড়েছিলেন।

'বেশ তো, বলুন—'

'বকু ছেলেমানুষ, ও পারবে না দয়া করে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে। আর একটা বিষয়ে পরামর্শ দিতে হবে। বেশ ভেবে চিন্তে পরামর্শটা দেবেন। মনে রাখবেন, এতে আপনারও স্বার্থ আছে।'

'আগে কাজটার কথাই বলুন—' হীরুর বাবা উন্মুখ হয়েছিলেন।

'বাবার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে হাজার দুই আড়াই টাকা জমা আছে। আইনত ঐ টাকাটার ওয়ারিশান আমরা। বাবার অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে ওটা আমাকে তুলে দিতে হবে।'

'নিশ্চয়ই। দশ বারো দিনের ভেতর যাতে ওটা পেয়ে যান আমি তার বন্দোবস্ত

করব।' হীরুর বাবা বলেছিলেন, 'কাজের ব্যাপার তো হল। এবার পরামর্শের কথাটা বলুন।'

তৎক্ষণাৎ মা কিছু বলেন নি। একটু চুপ করে থেকে মনে মনে বক্তব্যটাকে খুব সম্ভব গুছিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর এভাবে শুরু করেছিলেন, 'আপনি বোধ হয় জানেন না, বাবাই ছিলেন আমাদের সংসারে একমাত্র রোজগেরে মানুষ, তাঁর মৃত্যুতে বুঝতেই পারছেন, আমরা বিপদে পড়েছি।'

হীরুর বাবাকে চিন্তিত দেখিয়েছিল, 'কিন্তু—'

'কী?'

'আপনার স্বামী মানে বকুর বাবা, তিনি তো আছেন।' বলতে বলতে হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে গিয়েছিল হীরুর বাবার, 'ভাল কথা দু-দুটো মানুষ মারা গেলেন, শ্রাদ্ধশান্তি হল। কই, তাঁকে তো দেখিনি।'

মা নিশ্চুপ। দূর থেকে লক্ষ্য করেছিলাম, ঘোমটার আড়ালে তাঁর মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে, ঠোঁট শক্তবদ্ধ, চোখের তারা দুটি নিশ্চল।

হীরুর বাবা আবার বলেছিলেন, 'বকুর মুখে শুনেছি, উনি কলকাতার বাইরে কোথায় যেন চাকরি করেন। তাঁকে কি খবর পাঠান নি?'

খুব আস্তে মা বলেছিলেন, 'না।'

হীরুর বাবা হতবাক, কিছুটা বা বিমূঢ়। সবিস্ময়ে বলেছিলেন, 'কেন বলুন তো?'

'কারণ তিনি নেই।' ঘোমটার তলায় মায়ের চোখমুখ কণ্ঠস্বর নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল।

আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম, 'মা!'

হীরুর বাবা বিভ্রান্তের মত মায়ের শেষ কথাটার প্রতিধ্বনি করেছিলেন, 'নেই!'

'হয়ত আছেন, হয়ত নেই। তবে আমাদের কাছে তিনি মৃত।' অশরীরী কিছু একটা মায়ের ওপর যেন ভর করেছিল। সজ্ঞানে নয়, ঘোরের ভেতর থেকে তিনি যেন বলে যাচ্ছিলেন।

আমার গলার ভেতর থেকে আরেক বার তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এসেছিল, 'মা।'

মা ধমকে উঠেছিলেন, 'তুই চুপ কর বকু।'

হীরুর বাবা বলেছিলেন, 'আপনি কি বলছেন, আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না।'

মা বলেছিলেন, 'আপনি দু-দিন পর আমাদের কুটুম্ব হতে চলেছেন। আপনাকে সব কথা খুলে বলা দরকার।'

ঘরের ভেতর থেকে আমি বলেছিলাম, 'ওসব কথা থাক মা।'

'না, থাকবে না। তুই আমাকে বাধা দিস না বকু।' বলে হীরুর বাবার দিকে

ফিরেছিলেন মা, 'আপনি সব শুনুন, আপনার সব কিছু জানা প্রয়োজন।'

হীরুর বাবা উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে ছিলেন।

এরপর মা বিশদভাবে বাবার স্বভাব ব্যাখ্যা করেছিলেন, সারা জীবন তাঁর দায়িত্বহীনতার জন্য কিভাবে বাপের বাড়ি ছেলেপুলে নিয়ে মাথা নীচু করে পড়ে থাকতে হয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি সবিস্তারে বলেছিলেন মা। অবশেষে আমাদের সঙ্গে বাবার সম্পর্ক যে চিরদিনের মত শেষ হয়ে গেছে এবং আর কোনদিনও তিনি ফিরবেন না, তা-ও জানিয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য একদিন মধ্যরাতে মা-ই যে তাঁকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিলেন, সেটা জানান নি।

মা যেভাবে বাবার স্বভাব বিশ্লেষণ করেছিলেন, তাঁর দিক থেকে সেটা ঠিক। কিন্তু বাবাকে আমি অন্যভাবে আবিষ্কার করেছিলাম। বাবার দায়িত্বহীনতা, উদাসীন আনমনে বাউলের মত ঘুরে বেড়ানো—এ সবের কোনটাই ইচ্ছাকৃত নয়। এর পেছনে গভীর ব্যাপক কোন তাৎপর্য ছিল। কিন্তু এসব কথা সেদিন সেখানে বলে কোন লাভ ছিল না। কাজেই মুখ বুজেই থেকেছি।

মা বলেছিলেন, 'আমাদের সমস্ত কথা শুনলেন, বাবা মারা যাওয়াতে আমরা কোথায় এসে পড়েছি নিশ্চয়ই তা-ও অনুমান করতে পারছেন। এ অবস্থায় বকু কী করতে চায়, শুনুন—'

'কী?'

'পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে চাকরিতে ঢুকতে চায়।'

'চাকরি! কিন্তু—' কিছু একটা বলতে চেয়েছিলেন হীরুর বাবা কিন্তু অর্ধেক বলেই মাঝপথে থেমে গিয়েছিলেন।

তাঁর মনের কথা খানিক অনুমান করতে পেরেছিলাম, আমার চাকরি সম্বন্ধে মায়ের মনোভাব না জেনে তিনি কোন মন্তব্য করবেন না।

মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন?'

একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে হীরুর বাবা বলেছিলেন, 'বকুর ব্যাপারে আমার বলার চাইতে আপনার বলার গুরুত্ব অনেক বেশি। আপনি যা বলবেন তা-ই হবে।'

'উঁহু। আমার একার বলায় কিছু হবে না, আপনাকেও বলতে হবে।'

'দেখুন, এ সম্বন্ধে আমাকে যদি কিছু বলতে হয় তা হলে বলব—'

'মনের ভেতর বিন্দুমাত্র দ্বিধা না রেখে বলুন।'

অভয় সত্ত্বেও ভয়ে ভয়ে হীরুর বাবা বলেছিলেন, 'এত ভাল ছাত্র বকু, আমার তো ইচ্ছা, ও পড়েই যাক।'

'আমারও তাই ইচ্ছে।' মা বলেছিলেন, 'বাবার প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে দু-আড়াই হাজার টাকার মত পাব। টেনেটুনে চালালে দেড়টা বছর কাটিয়ে দিতে পারব। এর ভেতর বকু বি. এসসি-টা পাশ করে যাবে। আপাতত বি. এসসি-টা তো পাশ করুক। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে। আপনি কি বলেন?'

'বি. এসসি তো পাশ করবেই। ইঞ্জিনীয়ারিংটাও পাশ করতে হবে। এ ব্যাপারে আমার কিন্তু একটা আবদার আছে, সেটা আপনাকে রাখতেই হবে।' এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে হাতজোড় করেছিলেন হীরুর বাবা।

'কী?'

'আপনার ওপর আমার অসীম শ্রদ্ধা। আপনার সম্মান রেখেই বলছি বকুর পড়াশোনার দায়িত্ব আমার হাতে দিন। ও যদি বড় হয়, মানুষ হয়, তাতে আপনার আমার দু-জনেরই স্বার্থ সিদ্ধি হবে।'

এর আগেও হীরুর বাবা আমার লেখাপড়ার দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন। মা তখন অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। মনে হয়েছিল, এবারও তিনি রেগে উঠবেন।

কিন্তু না, মা রাগ করেন নি। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শুধু বলেছিলেন, 'বেশ তাই হবে। তবে এখন নয়, যখন দরকার হবে আপনাকে বলব।'

'বলবেন তো? কথা দিলেন?' সাগ্রহে জিজ্ঞেস করেছিলেন হীরুর বাবা।

'হ্যাঁ।'

চোদ্দ

দাদুর প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা দিয়ে দেড বছর সংসার সচল রাখা যাবে। সেই টাকাটা তোলার দায়িত্ব নিয়েছিলেন হীরুর বাবা।

আপাতত বছর দেড়েক অন্তত সংসার সম্পর্কে দুর্ভাবনার কিছু নেই। মা বলেছিলেন, 'সব তো চুকল, এবার তুই হোস্টেলে ফিরে যা। বাড়ি বসে থেকে পড়াশোনার ক্ষতি করে কী হবে?'

সে কথা আমিও বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু মা বলামাত্রই আমি জেলা শহরে ফিরে যাইনি।

দাদু-দিদিমার জন্য শোক অবশ্যই ছিল। তবে শ্রাদ্ধশান্তির পর তার তীব্রতা কমে আসতে শুরু করেছিল। আকস্মিক মৃত্যু প্রথম দিকে যতখানি হকচকিয়ে দিয়েছিল, পরে সেই ভাবটা আর ছিল না।

উত্তাল শোক থিতিয়ে মন যত শান্ত হয়ে আসছিল ততই আরেকটি ভাবনা লম্বা

লম্বা পা ফেলে চারিদিক থেকে আমাকে গ্রাস করে ফেলছিল। সেই ভাবনাটার নাম নয়নতারা।

মনে আছে, দাদুর অসুখের খবর পেয়ে বিবিবাজার আসার পর একদিনও ঝুলনদের বাড়ি যাইনি। তার কাছে যাবার মুখ আমার ছিল না। নয়নতারার কথা অবশ্য সে জানত না। সে কেন, সুধাময় আর নয়নতারার সভার সেই লোকগুলি ছাড়া কেউই জানত না। যা ছিল সঙ্গোপনে, সবার চোখের আড়ালে, তার জন্য নিদারুণ এক পাপবোধ আমাকে পীড়িত করছিল। মনে হচ্ছিল, ঝুলনের কাছে গেলেই ধরা পড়ে যাব। আমার পাপের বোধ ঝুলনের কাছ থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছিল। আর মনে হচ্ছিল যত দূরে আমি সরে যাচ্ছি ততই নয়নতারা যেন আমার কাছে এগিয়ে আসছে। একটা ঢালু পিছল পথ ধরে অতি দ্রুত আমি নয়নতারার দিকে ছুটতে শুরু করেছিলাম।

পড়াশোনার কথা নয়, সংসারের কথা নয়, দাদু-দিদিমার মৃত্যুর কথাও নয়। —আমার মন, আমার অস্তিত্ব, আমার ভাবনা, আচ্ছন্নের মত নয়নতারার সত্তাকে ঘিরে পাক খাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, জেলা শহরে ফিরে যাবার পর দুর্বার আকর্ষণে নয়নতারা যখন আমাকে টানতে থাকবে তখন কী করব? উর্ধ্বশ্বাসে তার দিকে ভেসে যাওয়া ঠেকিয়ে রাখা আমার সাধ্যের বাইরে।

কিন্তু নয়নতারার কাছে তো যাব? আমার সাজ নেই, পোষাক নেই, বাহার নেই। তা ছাড়া উপহারই বা কী দেব? হঠাৎ আমার মনে পড়েছিল, বাবা তাঁর হাত থেকে খুলে একটা সোনার তাবিজ আমায় দিয়েছিলেন। সেটাই ছিল আমার কাছে বাবার একমাত্র এবং শেষ স্মৃতিচিহ্ন।

তাবিজের কথাটা মনে হওয়া মাত্র সেটা ভাইবোন-মা সবাইকে লুকিয়ে খুঁজতে শুরু করেছিলাম। বাক্স-প্যাটরা-স্যুটকেস কিছুই বাকি রাখিনি। উল্টেপাল্টে আতিপাতি করে সব দেখে যাচ্ছিলাম।

খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একটা স্যুটকেসে কাপড়ের তলা থেকে একখানা ফোটো পেয়েছিলাম। বাবার বিয়ের সময়কার ফোটো। কিন্তু তাতে বরবেশী বাবার পাশে বধূবেশিনী উনি কে? মা তো নন। বিভ্রান্তের মত কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রুদ্ধশ্বাসে পায়ে পায়ে রান্নাঘরে মায়ের কাছে চলে গিয়েছিলাম।

মা কড়াইতে ডাল সাঁতলাচ্ছিলেন। আমি পেছন থেকে ডেকেছিলাম, 'মা—'

মুখ না ফিরিয়ে মা সাড়া দিয়েছিলেন, 'কি রে?'

'স্যুটকেসে আমি একটা ফোটো পেয়েছি।'

'কিসের ফোটো?'

'এই দেখ না—'

তাল সাঁতলানো হলে আমার হাত থেকে ফোটোটা নিয়েই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত শিউরে উঠেছিলেন মা, অসহ্য আবেগে ঠোঁটদুটো তার কাঁপছিল, চোখ দুটো ফেটে গিয়ে বুঝি রক্তই ছুটবে। মনে হচ্ছিল, বুকের ভেতর তাঁর শ্বাস আটকে আটকে যাচ্ছে।

খুব আস্তে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'বাবার পাশে ইনি কে মা ?'

উদ্‌ভ্রান্তের মত মা বলেছিলেন, 'সর্বনাশী।'

'সর্বনাশী!'

'তা ছাড়া কী ?' মা ক্ষিপ্তের মত বলে গিয়েছিলেন, 'তোর বাবাকে আমাদের কাছ থেকে এই রাক্ষুসীই তো ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।'

আমার কাছে ব্যাপারটা যেন একটু একটু করে স্পষ্ট হতে শুরু করেছিল। মায়ের জন্য সমবেদনায় করুণায় মন আর্দ্র, আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল। হৃৎপিণ্ডের উত্থান-পতন কিছুক্ষণের জন্য থেমে গিয়েছিল যেন। তারপর ঝাপসা গলায় বলেছিলাম, 'আচ্ছা মা—'

কিছু না বলে মা আমার দিকে চোখ ফিরিয়েছিলেন, সে চোখে প্লাবন থমকে ছিল। টলটলে জলের তলায় কালো মণি দুটো আবছা দেখাচ্ছিল।

বলেছিলাম, 'এই ব্যাপারটা তুমি কবে জানতে পারলে ?'

'শেষবার যখন সে এসেছিল তখন।'

'কী করে জানলে ?'

'নিজেই জানিয়েছিল। একদিন রাত্রিবেলা ঐ ফোটোটা বার করে বলেছিল, বর্ধমানে না কোথায় যেন পথ দিয়ে যেতে যেতে কান্নাকাটি শুনে একটা বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল। সেটা বিয়ে বাড়ি। কান্নাকাটির কারণ সাঙ্ঘাতিক। বিয়ের লগ্ন যায় যায়, অথচ বর বা বরযাত্রীরা কেউ এসে পৌঁছয়নি। লোক পাঠিয়ে জানা গেছে তারা আসবে না। মেয়ে সম্বন্ধে উড়ো চিঠি পেয়ে তারা বিয়ে ভেঙে দিয়েছে।'

রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তারপর ?'

'তারপর আর কি।' মা ভাঙা গলায় বলেছিলেন, 'মেয়েটা লগ্নভ্রষ্ট হয়ে যায়, এদিকে বাড়িসুদ্ধ লোক কান্নাকাটি জুড়েছে। তোর বাবা কি তা চেয়ে চেয়ে দেখতে পারে! দয়ার শরীর একেবারে গলে গেল, মেয়েটাকে উদ্ধার করতে বিয়ের পিঁড়েতে বসল সে।'

মা যেন এই কথাগুলো আমাকে বলছিলেন না। আমাকে উপলক্ষ্য করে মনে মনে বাবার সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

আর আমি দুঃখ পেলেও, মায়ের জন্য অপার বেদনা অনুভব করলেও স্তম্ভিত হইনি। বাবাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে আঙুল দেখিয়ে বলতে পারছিলাম না, এই লোকটা অপরাধী, এঁর শাস্তি চাই। বাবাকে যতটুকু আমি চিনেছি, যতটুকু দেখেছি তাতে মনে হয়েছে এ-ই স্বাভাবিক। আবেগ-তাড়িত অন্যমনস্ক মানুষটি হয়ত সজ্ঞানে গিয়ে দ্বিতীয় বার বিয়ের পিঁড়িতে বসেন নি। ভেতর থেকে অন্য কেউ, দুর্জ্ঞেয় কোন সত্তা তাঁকে ঠেলে ঠেলে বিয়ের আসরে নিয়ে গিয়েছিল। যে নির্মোহ আচ্ছন্নতার ঘোরে আজীবন তিনি নানা দিকে ছুটে বেড়িয়েছেন, পাহাড় দেখেছেন, সমুদ্র দেখেছেন, মরুভূমি দেখেছেন, এই বিয়েটা তেমনই একটা কিছু। ক্ষণিক আবেগে ছুটে গিয়ে ওটা করে ফেলেছেন। বাবাকে যতটুকু জানি তাতে আমি নিঃসংশয়, বিয়েটাই তিনি করেছিলেন, কিন্তু এর পেছনে তাঁর কোন গাঢ় আসক্তি ছিল বলে মনে হয়নি।

কিন্তু এ সব কথা আমার নিজস্ব। আমার অনুভূতি, আমার বিচারবোধ এই ভাবেই বাবার দ্বিতীয় বারের বিয়েটা বিশ্লেষণ করেছিল। কিন্তু মায়ের কাছে এ সব বলা অসম্ভব।

হঠাৎ একটা ঘটনা মনে পড়তে বলেছিলাম, 'আচ্ছা মা—'

'বল—'

'একটা কথা তোমার মনে আছে?'

'কী কথা?'

'যেদিন রাত্রিবেলা বাবাকে তাড়িয়ে দিলে সেই দিনই কি এই বিয়ের কথাটা জানতে পেরেছিলে?'

অন্য দিকে তাকিয়ে আবছা গলায় মা বলেছিলেন, 'হ্যাঁ।'

পনেরো

দাদু-দিদিমার মৃত্যুর পর বাবার দ্বিতীয় বিয়ের খবর আমার প্রাণে শেষ পর্যন্ত আঘাত দিয়েই গিয়েছিল। বিয়ে সম্বন্ধে বাবার আবেগ, অনাসক্তি অথবা মোহহীনতা—যে যুক্তিই সাজাই না, ওটা আঘাতই।

সারা জীবনে বাবাকে খুব বেশি বার আমি দেখিনি। চিরদিন উদাসীন আনমনে দূরে দূরেই তিনি থেকেছেন। তবু মনে হয়েছিল, আমাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারে অন্যায়ভাবে কোটোর ঐ মহিলা হাত বাড়িয়েছেন। একান্ত ন্যায্য পাওনা থেকে তিনি আমাদের বঞ্চিত করেছেন। আমাদের বলতে যা কিছু, সব ঠকিয়ে নিয়েছেন।

যিনি আমাদের সব চাইতে কাছের, সব চাইতে আপন আর নিজস্ব তাঁর ওপর আমাদের কোন স্বত্ব নেই। ঐ মহিলা চুপি চুপি, কারসাজি করে বাবাকে চিরদিনের মত আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন।

মনে আছে, বাবার দ্বিতীয় বিয়ের ফোটোটা যেদিন আবিষ্কার করি সেই দিনটা অদ্ভুত এক অস্থিরতা আর যন্ত্রণার ভেতর কেটেছে আমার।

কিন্তু ঐ একটা দিনই। তার পরেই বাবার ঐ ব্যাপারটা ধাক্কায় ধাক্কায় আমার ভাবনা থেকে বার করে দিয়ে নয়নতারা আবার সেখানে ফিরে এসেছিল। আর ফিরেই সম্পূর্ণভাবে আমাকে দখল করে নিয়েছিল। পর পর দুটো মৃত্যুর শোক, আচমকা আমাদের সঙ্গে বাবার বিচ্ছেদের কারণ জানতে পারা—এমন তীব্র আঘাতগুলিকে নিমেষে যে ভুলিয়ে দিতে পেরেছিল তার শক্তি যে কত নিদারুণ কত অমোঘ আর বিপুল—সেদিন তা যেন বুঝতে পারিনি। জীবনের এই শেষ পর্বে পৌঁছে সে কথা ভাবতে গিয়ে কত বার যে আমি বিস্মিত হয়েছি, হিসেব নেই।

সব চাইতে বড় কথা, ঝুলন কাছেই ছিল। এক যুগ ধরে, সেই অবোধ শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত, তাদের বাড়ি নিয়মিত হাজিরা দিয়েছি। প্রথম দিকে হীরুই আমাকে টেনে নিয়ে যেত। পরে যেতাম ঝুলনের টানে। সে টানটা প্রথম প্রথম আমার কাছে স্পষ্ট ছিল না, পরে অবশ্য দিনের আলোর মত স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।

আশ্চর্য, একদা যার কাছে যাবার জন্য সর্বক্ষণ লালায়িত হয়ে থাকতাম, লেখাপড়ার পালা শেষ হলে চিরকালের মত আমার জীবনের সঙ্গে যে জড়িয়ে যাবে তার কথা যেন ভাবতে পারছিলাম না। দাদুর অসুখের খবর পেয়ে সেই যে বিবিবাজারে এসেছিলাম তারপর সেখানে কম দিন তো থাকিনি। কিন্তু তার কাছে একবারও যাইনি। আমার জীবনে সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার বৈকি।

লজ্জা সঙ্কোচ পাপবোধ—হাজারো যুক্তি অবশ্যই ছিল। সে সব মনকে চোখ ঠারা। আসলে জেলা শহর থেকে নিশির ডাকের মত আমাকে হাতছানি দিয়ে যাচ্ছিল নয়নতারা। তাকে উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করার শক্তি আমার প্রাণের কোথাও ছিল না।

যাই হোক, বাবার দ্বিতীয় বিয়ের ফোটোটা নিয়ে সারাদিন দুঃখের ঘোরে কাটাবার পর আবার নতুন করে সোনার তাবিজটা খুঁজতে শুরু করেছিলাম। আমাদের বাড়ি তো রাজপ্রাসাদ নয়, দু-খানা মাত্র ঘর সেখানে, চার পাঁচটার বেশি বাক্স বা স্যুটকেস নেই। তাবিজটা খুঁজে বার করতে বেশি সময় লাগেনি। সেটা পাওয়ামাত্র আর অপেক্ষা করিনি। জেলা শহরে ফিরে এসেছিলাম।

জেলা শহরে ফেরার পর দিন তিনেক কেটে গিয়েছিল। এই দিন ক'টা হোস্টেল থেকে কলেজ আর কলেজ থেকে হোস্টেল—এর বাইরে কোথাও পা দিইনি। তবে মনে মনে মাধ্যাকর্ষণের দুর্বার শক্তিতে নয়নতারা আমাকে টানতে শুরু করেছিল। প্রতিদিন বিকেল হলেই ভাবছিলাম, যাব। কিন্তু যাওয়াটা হয়ে উঠছিল না। কেন না, দাদু-দিদিমার মৃত্যুর খবর এখানেও এসে গিয়েছিল।

বিকেল হলেই কেউ না কেউ আমার কাছে আসত, সান্ত্বনার কথা বলত। তা ছাড়া এতকাল যে হীরু ফুটবল-ক্রিকেট-ডিবেটিং এমনি দিগ্বিদিকে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে, হঠাৎ সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমার পাশে পাশে থাকছিল। সারাদিনের একটি মুহূর্তও সে আমাকে নিঃসঙ্গ থাকতে দিচ্ছিল না। ওদের সবার ধারণা, শোকে দুঃখে আমি কতই না মুহ্যমান হয়ে আছি !

কিন্তু মনে মনে এই সব সান্ত্বনা, হীরুর সঙ্গ ইত্যাদি থেকে একটু মুক্তি পাবার জন্য আমি অস্থির হয়ে উঠছিলাম, ব্যাকুল হচ্ছিলাম। খানিক অসহিষ্ণুও বা। আমার হৃৎপিণ্ডের উত্থান-পতনে ঘুরে ঘুরে বার বার একটি নামই বেজে যাচ্ছিল—নয়নতারা, নয়নতারা, নয়নতারা। তার সভায় যাবার জন্য আমার সমস্ত সত্তা উন্মুখ উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল। কিন্তু সমবেদনা সহানুভূতি জানাতে যারা আমাকে ঘিরে ধরেছিল তাদের বলা যাচ্ছিল না, 'তোমরা এখন যাও, আমার জরুরি কাজ আছে।' এ কথা বলা শোভন নয়, সঙ্গতও না। ভদ্রতা শব্দটার সঙ্গে যে আচরণবিধি জড়িত ঐ কথাগুলো তার সঙ্গে খাপ খায় না।

এই তিনদিনের ভেতর সুধাময়ের সঙ্গেও একবার দেখা হয়েছে। সে নিজেই এসেছিল আমার কাছে। বলেছিল, 'শুনলাম আপনার দাদু-দিদিমা মারা গেছেন···—'

'হ্যাঁ।' আমি মাথা নেড়েছিলাম।

'কী হয়েছিল ?'

মৃত্যুর কারণগুলো সংক্ষেপে জানিয়েছিলাম। সুধাময় আমাকে দু-একটা সহানুভূতির কথা বলেছিল।

আমি কিন্তু সহানুভূতির জন্য আদৌ লালায়িত ছিলাম না। ইতিমধ্যেই সহানুভূতিতে সহানুভূতিতে আমার ঝুলি পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। নতুন করে তার আর প্রয়োজন ছিল না।

আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে সুধাময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। মনে হচ্ছিল, সান্ত্বনার পালা চুকলে সে বুঝি নয়নতারার প্রসঙ্গ তুলবে। হয়ত নয়নতারা তার মারফত আবার ডাক পাঠিয়েছে।

কিন্তু না, আমার মনের কথা সুধাময় বোধ হয় পড়তেও পারে নি। 'সমস্ত

প্রত্যাশা আর ব্যাকুলতা চুরমার করে দিয়ে সে বিদায় নিয়েছিল।

দিন তিনেক পর সমবেদনার স্রোত স্তিমিত হয়ে গেছে। হীরুও আবার তার উদ্দামতাকে খেলাধুলোয় ছড়িয়ে দিতে শুরু করেছিল। আমি মুক্তি পেয়েছিলাম।

আর মুক্তিটা হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষা করিনি। বাবার সেই তাবিজটা ছিল বেশ ভারি, তিন ভরির মত সোনা ছিল তাতে। তাবিজটা এক গয়নার দোকানে ষাট টাকায় বন্ধক দিয়ে নয়নতারার জন্য একটা হাতীর দাঁতের সুদৃশ্য নৌকো কিনেছিলাম। তারপর হীরুর কাছ থেকে তার জামাকাপড় চেয়ে নিয়ে নয়নতারার বাড়ি রওনা হয়েছিলাম।

ষোল

মনে পড়ে, নয়নতারার সভায় সেই আমার দ্বিতীয় বার যাওয়া।

আমি পৌঁছুবার আগেই আসর জমে উঠেছিল। কবি, অধ্যাপক, শিকারী, সিনেমা হলের মালিক—সবাই সভা আলো করে বসে ছিলেন। আর সেই সিংহাসনটায় ঝঁাপানো সোনালী পোশাক পরে বসে ছিল নয়নতারা। তাকে সোনার ভ্রমরী বলে মনে হচ্ছিল।

আমি কিন্তু গিয়েই ভেতরে ঢুকিনি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার বুক দুরু দুরু করছিল। সেই শীতের দিনেও টের পাচ্ছিলাম, ঘামে জামা ভিজে উঠেছে। এর নামই কি স্নায়ুভীতি?

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম, মনে নেই। এক সময় নয়নতারাই প্রথম আমাকে দেখতে পেয়েছিল। ব্যস্তভাবে বলেছিল, 'ও কি, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে আসুন—'

ভেতরে যেতে নয়নতারা আবার বলেছিল, 'কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন ওখানে?'

'খানিকক্ষণ।' অস্পষ্ট উত্তর দিয়েছিলাম।

'আপনার লজ্জা আর ভাঙানো গেল না।' নয়নতারা কেমন করে যেন হেসেছিল, 'বসুন।'

তার হাসি দেখতে দেখতে বিদ্যুতের মত দুরন্ত চমকে আমার মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে কি যেন বয়ে গিয়েছিল। সেই অবস্থাতেই একটা সোফায় নিজেকে সঁপে দিয়েছিলাম।

নয়নতারা বলেছিল, 'এতদিন কোথায় ছিলেন? আসেন নি যে?'

না আসার কারণটা জানিয়েছিলাম।

হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল নয়নতারার চোখমুখ থেকে। বিষণ্ণ স্বরে সে বলেছিল, 'এই খবরটা তো জানতাম না। আহা, খুবই দুঃখের ঘটনা।'

আমি চুপ করে ছিলাম। মনে হচ্ছিল, এত লোকে তো এত সমবেদনা জানিয়েছে কিন্তু এমনটি আর কেউ জানায় নি। তা ছাড়া সেদিন রাত্রে যেভাবে হোস্টেলের সামনে আমাকে সে ছুঁড়ে দিয়ে গিয়েছিল, তাতে এমন অভ্যর্থনা পাব কল্পনাও করিনি। আমার শ্বাস-প্রশ্বাস সহজ হয়ে এসেছিল, বুকের ভেতর থেকে একটা উল্লসিত কলরোল যেন উঠে আসছিল।

কবি, অধ্যাপক এবং অন্যান্য সভাসদেরাও দাদু-দিদিমার মৃত্যুতে বিষণ্ণ বোধ করেছিলেন। মৌখিক সহানুভূতির কথাও দু-একটা বলেছিলেন। তবে শিকারী কোন মন্তব্য করেন নি, আপন মনে পাইপের ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে আংটির মত করে তিনি ছুঁড়ে যাচ্ছিলেন।

বিষাদের আবহাওয়াটা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। খানিক পরেই উপহারের পালা শুরু হয়েছিল। একে একে সবার দেওয়া হলে আমিও হাতীর দাঁতের নৌকোখানা নিয়ে নয়নতারার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

নয়নতারা বলেছিল, 'কি ব্যাপার ?'

'এটা এনেছি।'

হাসির বখশিস দিয়ে সবাইর কাছ থেকে যেভাবে নয়নতারা উপহার নিত আমাকেও পরম উদারতায় সেই হাসিই বিলিয়েছিল, তেমনই মুগ্ধ স্বরে বলেছিল, 'বাঃ! চমৎকার জিনিস তো।'

আমি চুপ।

নৌকো থেকে চোখ সরিয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল নয়নতারা। পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখতে দেখতে দৃষ্টিটা হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। তারপর গলাটা অতল খাদে নামিয়ে ফিসফিসিয়ে বলেছিল, 'গুণ বেড়েছে দেখছি!'

তার কথা একমাত্র আমিই শুনতে পেয়েছিলাম। নয়নতারার দৃষ্টি অনুসরণ করে নিজের দিকে তাকিয়েছিলাম। হীরুর কাছ থেকে ধার করা চাকচিক্য আমার সর্বাঙ্গে। লজ্জিত হয়ে মুখ নামিয়ে নিয়েছিলাম।

নয়নতারা আগের মতই ফিসফিসিয়ে বলেছিল, 'সাজসজ্জাখানা তো ভালই করেছেন। দাদু-দিদিমার শোকের বেশই বটে।'

তার কথায় কতখানি স্নেহ আর ব্যঙ্গ মেশানো ছিল, বুঝতে পারিনি। তবে আমার মাথা আরো অনেকখানি নুয়ে পড়েছিল।

আমরা দু'জনকে নিয়েই বোধ হয় মগ্ন ছিলাম। হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন

বলেছিল, 'অত ফিসফিস করে কী কথা হচ্ছে ? আমরাও এখানে বসে আছি যে—'

চকিত হয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে শিকারী সোমনাথের চোখে চোখ পড়েছিল। সে চোখ যেন ধিকি ধিকি জ্বলছিল।

নয়নতারা বলেছিল, 'যান বসুন গিয়ে।' আমি নিজের জায়গায় ফিরে গেলে চোখের তারা নাচিয়ে ঘাড় হেলিয়ে অন্যদের উদ্দেশে বলেছিল, 'চিরন্তনবাবুকে কী বলছিলাম জানেন ?'

সবাই সমস্বরে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী ?'

'চুপি চুপি ভালবাসার কথা বলেছিলাম।'

নয়নতারার বলার ধরনে সবাই হেসে উঠেছিল।

হাসাহাসি কিছু কমলে নয়নতারা কবিকে বলেছিল 'কি, আজ পদ্য লিখে আনেন নি ?'

'তোমার সভায় আসব আর নতুন কবিতা আনব না, এ কোনদিন হয়েছে নয়ন ?' কবিকে অত্যন্ত অভিমানী মনে হয়েছিল।

'তবে চুপচাপ বসে কেন, পড়ুন—'

পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বার করে কবি পারিজাতকুসুম আবেগে-ঠাসা একটি প্রেমের পদ্য কাঁপা কাঁপা মিহি সুরে আবৃত্তি করে গিয়েছিলেন। পদ্যটি কার উদ্দেশে কার পাদপদ্মে নিবেদিত, বুঝতে অসুবিধে হয়নি।

ছড়াপাঠের পর গান, তাসের ম্যাজিক, শিকারের গল্প—আগের দিন যা যা দেখে এবং শুনে গেছি, একে একে সে সবই শুনতে ও দেখতে হয়েছিল। তবে যে গান আগের দিন শুনিয়েছিলাম, সেদিন আর তা শুনিনি। অনুষ্ঠানগুলি একই ছিল, তবে বিষয়গুলি ছিল সবই নতুন।

গান-ম্যাজিক-কবিতা ইত্যাদি দিয়ে সবার স্তুতি শেষ হলে নয়নতারা আমার দিকে তাকিয়েছিল, 'এবার আপনি কিছু বলুন—'

আমি অসহায় বোধ করেছিলাম। দুর্বল স্বরে বলেছিলাম, 'ওদের মত আমার এমন কিছু গুণ নেই যা দিয়ে আপনাকে খুশি করতে পারি—'

'কোন কথা আমি শুনতে চাই না। সেদিন ফাঁকি দিয়েছেন, আজ কিন্তু ছাড়ব না।'

'কিন্তু—'

'উঁহু—' আস্তে করে মাথা নেড়েছিল নয়নতারা।

অর্থাৎ কিছু একটা করতেই হবে। ভেবে ভেবে ঘেমে নেয়ে উঠে ভয়ে ভয়ে বলেছিলাম, 'সাধুর গল্প যদি বলি, চলবে ?'

'সাধুর গল্প!' চারিদিক থেকে সবাই যেন আঁতকে উঠে ছিলেন। এ সভায় সাধুর গল্প যে নিদারুণ ছন্দপতন, একান্ত বেমানান—সেটাই তাঁরা আতঙ্কিত চিৎকারে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

নয়নতারা কিন্তু পরম উৎসাহে বলেছিল, 'নিশ্চয়ই শুনব, আপনি আরম্ভ করুন।'

বাবার কাছে অমরকণ্টকের সাধুদের চমকপ্রদ সব গল্প শুনেছিলাম। সেগুলো মনে ছিল। গুছিয়ে গাছিয়ে তা-ই বলেছিলাম।

শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল নয়নতারা, 'বাঃ বাঃ, চমৎকার গল্প।'

পাশে যাঁরা বসে ছিলেন তাঁদের কেউ কেউ তারিফ করেছিলেন। কেউ কেউ মন্তব্য না করে চুপচাপ ছিলেন। শুধু শিকারী সোমনাথ নাক সিটকে উন্নাসিক একটা ভঙ্গি করেছিলেন।

গান-আবৃত্তি-গল্প ইত্যাদির পর নয়নতারা বলেছিল, 'রাত তো অনেক হল। এবার তা হলে লটারীটা সেরে ফেলি?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ—' সবাই সমস্বরে সায় দিয়েছিলেন।

আগের দিনের মতই কাগজের টুকরো কেটে তাতে সবার নাম লিখে এবং কিছু কাগজ ফাঁকা রেখে একই রকম ভাঁজ করে মিশিয়ে নিয়েছিল নয়নতারা। তারপর এক একজন করে ডাকতে শুরু করেছিল। প্রত্যেকে একটি করে কাগজের টুকরো তুলে নয়নতারার হাতে দিয়ে আসছিলেন। আশ্চর্য, প্রতিটি কাগজের টুকরোই শূন্য। কোন নামই তাতে ছিল না।

একেক জনের ডাক পড়ছিল আর আমার বুকের ভেতর শ্বাস ততই আটকে আটকে আসছিল। ধমনীতে রক্তস্রোত থমকে থমকে যাচ্ছিল। নিজের অজান্তে মেরুদণ্ড খাড়া করে বসে ছিলাম।

আগের দিনের মত সেদিনও সবার শেষে ডাক পড়েছিল আমার। প্রাণের ভেতর সেই মুহূর্তে আশার শিখা কাঁপছিল, তখনও পর্যন্ত কারো নাম যখন ওঠেনি তখন নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই আমার নাম উঠবে। ভাগ্য একবার পাত্র ভরে আমার ঠোঁটের কাছে তুলে ধরেছিল, আমি চুমুক দিতে পারিনি। আরেক বার সুযোগ পেলে এ নিশি ব্যর্থ হতে দেব না।

শিথিল পায়ে একটা কাগজের টুকরো তুলে নয়নতারার হাতে দিয়ে নিজের আসনে ফিরে এসেছিলাম।

রক্তাভ নিটোল আঙুলে কাগজটার ভাঁজ খুলে নয়নতারা বলেছিল, 'এতক্ষণে নাম উঠেছে।' বলে আমার দিকে তাকিয়েছিল।

যে রক্তস্রোত এতক্ষণ ধমনীতে থমকে থেকেছে, এবার সেটা দুরন্ত ঢলের মত

ছুটতে শুরু করেছিল। তা হলে কি ভাগ্য দ্বিতীয় বার আমাকে অনুগ্রহ করেছে!

লক্ষ্য করেছিলাম, চারিদিকের সবাই উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। প্রত্যাশায়, উত্তেজনায় সকলের গলার শির ধনুকের ছিলার মত টান টান হয়েছিল, কপালে কণা কণা ঘাম জমেছিল, চোখের দৃষ্টি স্থির—নিষ্পলক।

অধ্যাপক জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কার নাম উঠেছে?'

আমার দিকে আড়চোখে একটু তাকিয়ে ঠোঁটের প্রান্তে হাসি টিপে নয়নতারা ফিসফিসিয়ে বলেছিল, 'শিকারী সাহেবের।'

মনে হয়েছিল, আমার পেশীগুলি নিমেষে আলগা হয়ে গিয়েছিল। হাত-পা-আঙুল—দেহের প্রত্যঙ্গগুলি যেন অসাড়।

শিকারী সোমনাথ উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে নাক কুঁচকে ভুরু নাচিয়ে কেমন করে যেন হেসেছিলেন। বলেছিলেন, 'ধন্যবাদ। আপনার হাতে তা হলে আমার ভাগ্য ফিরল।'

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। মাথা নীচু করে হতাশের দলের সঙ্গে আমি বেরিয়ে এসেছিলাম। একমাত্র সোমনাথই নয়নতারার সঙ্গে হল ঘরে বসে ছিলেন। ভাগ্য সে রাত্রে সোমনাথের হাতে পাত্র পূর্ণ করে তুলে দিয়েছিল।

সতেরো

সোনার তাবিজটা বাঁধা রেখে ষাট টাকা পেয়েছিলাম। আজকের নয়, তখনকার হিসেবে ষাটটা টাকার দাম অনেক।

হীরুর কাছ থেকে রোজ রোজ জামাকাপড় ধার চাইতে মাথা কাটা যেত। অতএব গোটা পনের টাকা খরচ করে এক প্রস্থ চমৎকার পোশাক আর শৌখিন নক্সাদার চপ্পল কিনে নিয়েছিলাম।

পোশাক কেনবার পরও হাতে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশটা টাকা ছিল। অঙ্কের হিসেবে ঐ টাকাটা হয়ত সামান্যই, কিন্তু আমার কাছে সেদিন তা কুবেরের ভাণ্ডার।

প্রতিদিন কলেজের ছুটি হলেই ফিনফিনে বাবুটি সেজে সস্তা অথচ সুদৃশ্য একটি উপহার হাতে নিয়ে নয়নতারার কাছে নিয়মিত হাজিরা দিতাম। আমার হাতে যে রসদ ছিল তাতে মাসখানেক অন্তত নিশ্চিন্ত। তার পরের ভাবনা নিয়ে সেই মুহূর্তে বিচলিত ছিলাম না।

নিয়মিত যাতায়াতের ফলে নয়নতারাদের কিছু কিছু পরিচয় জানতে পেরেছিলাম। ওরা বাংলাদেশের মানুষ না, লক্ষ্ণৌ অথবা এলাহাবাদের বাঈমহল্লায় ওদের আদি

জীবনের সূত্র পাওয়া যেতে পারে।

সামাজিক দিক থেকে নয়নতারাদের পরিচয়ের মধ্যে কোন গৌরব নেই। গ্লানি এবং অন্ধকারে তা অবলুপ্ত। পেছন দিকে যতদূর তাকানো যায়, কোথাও আলোর সংকেত নেই। পুরুষ দিয়ে ওদের পরিচয় নয়। আদিম মেট্রিয়ার্কাল সোসাইটির মত মায়ের নামেই ওদের পরিচয়।

বংশ পরম্পরায় নয়নতারারা বাঈজী। স্বৈরিণীকুলে ওরা শ্রেষ্ঠ, অভিজাত। গান-বাজনা-নাচ ইত্যাদি সূক্ষ্ম কারুকলায় লোকরঞ্জনই ছিল একদা ওদের জীবিকা।

একদা যে নয়নতারার মা আমার প্রণাম নেন নি, তার কারণ এতদিনে আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

যাই হোক, কে এক সমঝদার জমিদার-নন্দন বহুকাল আগে নয়নতারার মাতামহীকে এনে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারপর থেকে তারা এখানেই থেকে গেছে। ধীরে ধীরে এদেশের আচার-ব্যবহার, খাদ্যরুচি, পোশাক-রুচি, আহার-বিহার তারা গ্রহণ করেছে।

নয়নতারার মাতামহীর কথা বলতে পারব না। তবে তার মাকে যতটুকু দেখেছি, তাতে সুদূর লক্ষ্ণৌ বা এলাহাবাদের কোন চিহ্নই তাদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না। পুরোপুরি বাঙালিনী হয়ে গিয়েছিল তারা।

বাংলাদেশের কোন প্রান্তে প্রথম নয়নতারার মাতামহীকে আনা হয়েছিল তা আমার অজানা। কিভাবে বা কোন সুবাদে নয়নতারারা ভিক্টি টাউনের সেই সুবিশাল ক্যাসেলে এসেছিল, সে কথা কোনদিন তাকে জিজ্ঞেস করিনি।

বংশ-পরিচয় থাক। নয়নতারা প্রসঙ্গেই ফিরে আসা যাক। সে স্বেচ্ছাচারিণী, স্বৈরিণী।

স্বৈরিণী সম্বন্ধে আমাদের বোধোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই একটা সংস্কার বুঝি গড়ে ওঠে। ওরা অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ। ওদের কথা ভাবতে গেলে স্নায়ু কুঁকড়ে যায়, পাপবোধে শরীর ঘিন ঘিন করতে থাকে।

ভদ্র, শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক সমাজের বাইরে আবর্জনার কুণ্ডে ওদের জন্ম; বিষাক্ত রস শুষে শুষে ওদের পুষ্টি, বৃদ্ধি। নয়নতারার সঙ্গে আলাপটা আকস্মিক হলেও তার পরিচয় জানার পর তার কাছে নিয়মিত হাজিরা দেওয়া ছিল অভাবিত। প্রবল ঘৃণায় নয়নতারার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনাই উচিত ছিল। কিন্তু পারছিলাম না। বরং যত দিন যাচ্ছিল আকর্ষণ ততই তীব্র, প্রখর এবং দুর্নিবার হয়ে উঠেছিল। ঘৃণা করে তার কাছ থেকে সরে আসতে পারছিলাম কই?

জন্ম পরিচয় বাদ দিলে রূপের দিক থেকে সে মোহময়ী, যাদুকরী। শুধু রূপই না,

গুণও তার অফুরন্ত।

বাড়ীতে বসে ম্যাট্রিক স্ট্যাণ্ডার্ড পর্যন্ত পড়েছিল নয়নতারা। ইউনিভার্সিটির বিচারে ম্যাট্রিক পর্যন্ত যে পড়াশোনা তার চাইতে চর্চা ছিল অনেক বেশি। ইংরেজিটা ভালই জানত। বিদেশী ভাল ভাল গল্প-উপন্যাস সে ইংরেজিতেই পড়েছিল। তা' ছাড়া কীটস্, বায়রন, শেলি, ওয়ার্ডসওয়ার্থের অসংখ্য কবিতা তার কণ্ঠস্থ ছিল। বাংলা অনুবাদে মুদ্রারাক্ষস, মৃচ্ছকটিক, কুমারসম্ভব কিংবা অভিজ্ঞান শকুন্তলম্—সব পড়ে ফেলেছিল। তার ওপর বাংলা সাহিত্য তো ছিলই।

লক্ষ্য করেছি, কোন বইয়ের কোন অংশ না বুঝলে সন্ধ্যেবেলা যাঁরা হাজিরা দিতেন তাঁদের কাছে বুঝে নিত নয়নতারা। মোট কথা তার জ্ঞানের তৃষ্ণা ছিল অসীম। জানবার, দেখবার অথবা বুঝবার আকাঙ্খা অফুরন্ত।

রূপসী আর বিদুষীই না, নাম করা ওস্তাদ রেখে গান বাজনা এবং নাচ শিখেছিল নয়নতারা। সে কিন্নরী, কলাবতীও। একেক দিন গান গেয়ে অথবা নেচে আমাদের মুগ্ধ করে দিত নয়নতারা। একেক দিন সাহিত্য, দর্শন অথবা কাব্য কিংবা নাটক নিয়ে যখন আসর সরগরম হয়ে উঠত তখন এমন এমন মন্তব্য সে করে বসত যাতে অবাক হতে হত।

কিন্তু পরের প্রসঙ্গ আগে এসে পড়েছে। ধারাবাহিক ইতিহাসেই ফিরে যাওয়া যাক।

শুনেছি, নয়নতারার মাতামহী একনিষ্ঠই ছিলেন। যে জমিদার-নন্দন তাঁকে দেশান্তর থেকে নিয়ে এসেছিলেন আমরণ তাঁকেই স্বামীরূপে ভজনা করেছেন। নয়নতারার মা-ও নাকি তা-ই। একজন বড় ব্যবসাদারের তিনি মানসী ছিলেন। সেই ভদ্রলোক ছাড়া বিছানায় অন্য কোন পুরুষকে ডেকে আনেন নি।

বংশানুক্রমিক ধারাটা কিন্তু নয়নতারার কাছে এসে থমকে গিয়েছিল। প্রথম ব্যতিক্রম ঘটিয়ে দিয়েছিল সে। একজনকে সে ভজনা করে নি।

নয়নতারার প্রাণের দিগ্বিদিকে নানা স্রোতের খেলা, নানা তৃষ্ণার মেলা সাজানো। সে তৃষ্ণা কারো একজনের পক্ষে মেটানো সম্ভব ছিল না। জগতে যা কিছু ভালো, যা কিছু চমকপ্রদ এবং মূল্যবান—সে সবের জন্য তার আকাঙ্খা ছিল দুর্বার। আত্মবিশ্বাস ছিল প্রবল। সে জানত যেদিকে হাত বাড়াবে তাই ছিনিয়ে আনতে পারবে। সে জন্যেই বুঝি জীবনের বিভিন্ন দিকে যাঁরা কৃতী, সফল, সিদ্ধকাম— তাঁদের সবাইকে নিয়ে নিজের চারপাশে মালা গেঁথেছিল সে।

নয়নতারার চারপাশে যাঁরা সেদিন ভিড় করে এসেছিলেন তাঁরা সবাই ভদ্র, শান্ত, মার্জিত। তাঁরা অবশ্যই নয়নতারার রুচির টানে আসতেন। কিন্তু সেইটুকু তো সব

নয়। তার চাইতেও অনেক প্রবল এক আকর্ষণে তারা এখানে হাজিরা দিতেন।

নয়নতারার একটু হাসি, সামান্য সঙ্গ বা স্পর্শ—এটুকুতেই তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন না। বরং তাদের কামনা এবং প্রত্যাশাকে সেগুলি আরো উস্কে দিত। সামান্য ক্ষণের সঙ্গলোভে নয়, নয়নতারার সঙ্গে সম্পূর্ণ নিশিযাপনের জন্যই তারা এখানে ছুটে আসতেন।

কিন্তু এতগুলি মানুষের কামনার আগুনকে একদিনে নেভানো অসম্ভব। অতএব লটারীর ব্যবস্থা করতে হয়েছিল নয়নতারাকে। আসরে যারা উপস্থিত থাকবেন কাগজের টুকরোয় তাদের সবাইকার নাম লিখে এবং কিছু ফাঁকা কাগজ (আগেই আমি তা দেখেছি) একসঙ্গে মিলিয়ে প্রত্যেককে একটা কাগজ তুলতে বলত নয়নতারা। এভাবে প্রথম যে নামটা উঠত তার সঙ্গেই নিশিযাপন করত সে। এটাই নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অলিখিত চুক্তির মত সবাই তা মেনেও নিয়েছিলেন।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, প্রতিদিনই শিকারী সোমনাথের নাম লটারীতে উঠত। তবে মাঝে মাঝে নতুন নতুন একেকজন কৃতী পুরুষকে ধরে আনত নয়নতারা। প্রথম দিন যিনি আসতেন (যেমন আমি) তার নাম লটারীতে উঠত। নইলে লটারীর বাজি রোজ সোমনাথই জিতে নিতেন। এর ভেতর নয়নতারার কোন-কারসাজি ছিল কিনা, কে বলবে।

আঠারো

নয়নতারার সভায় প্রথম দিন এলেই লটারীতে নাম উঠত। আর একবার যার নাম উঠত তার পক্ষে মোহ কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব ছিল। মানুষের ইচ্ছাশক্তি, সংযমের ক্ষমতা আর কতটুকু? ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে ভাগ্য পরীক্ষা করতে তাকে আসতেই হত। অদৃশ্য শৃঙ্খলে এতগুলি পুরুষকে যেন বেঁধে রেখেছিল নয়নতারা।

লটারীতে নাম উঠুক আর না-উঠুক, নিয়মিত হাজিরা দিয়ে যাচ্ছিলাম। প্রতি-দিনই বিপুল আশা নিয়ে যেতাম, আজ নিশ্চয়ই নাম উঠবে। ফিরতাম অপার শ্রান্তি আর হতাশা নিয়ে। কিন্তু হতাশার আয়ু আর কতক্ষণ? পরের দিনই বাবুটি সেজে নতুন উদ্যমে নয়নতারার কাছে চলে যেতাম।

দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছিল কিন্তু নামটা আর উঠছিল না। বিচিত্র এক মোহময়তা অবিরাম হাতছানি দিয়ে যাচ্ছিল। অন্ধের মত, মূঢ়ের মত, উন্মাদের মত-আমি তার পিছু পিছু ছুটে যাচ্ছিলাম।

কিন্তু নয়নতারার সভায় হাজিরা দিলেই তো শুধু চলত না! তার মনোরঞ্জনের জন্য কিছু একটা করা দরকার।

আমি ম্যাজিক জানতাম না। গান-বাজনা কোন কিছুই শিখিনি। বিদূষক সাজা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। চৌষট্টি কলার সব ক'টিই ছিল আমার আয়ত্তের বাহিরে।

এক লেখাপড়ায় কিছুটা দখল ছিল আমার। তাও সে পড়াশোনায় কাব্য ছিল না, নাটক ছিল না। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। নীরস পদার্থতত্ত্ব আর রসায়নের মধ্যে এমন কিছু চমৎকারিত্ব ছিল না যা দিয়ে মনোহরণ করতে পারতাম।

অতএব বাবার দিকে চোখ ফেরাতে হয়েছিল। সেই উদাসীন বাউল মানুষটির কাছে মজার মজার গল্প শুনেছিলাম, সেগুলিই সাজিয়ে গুছিয়ে নয়নতারার সভায় হাজির করতাম।

কিন্তু আমার অর্থের মত গল্পের পুঁজিও যৎসামান্য। কৃপণের মত ব্যবহার করেও গল্পের ঝাঁপি একসময় শূন্য হয়ে গিয়েছিল।

আমার ঐ বয়েসে তো আর নতুন করে গান-বাজনা অথবা অন্য ছলাকলা শেখা সম্ভব ছিল না। তা হলে কিভাবে আমি নয়নতারাকে আনন্দ দেব? কিভাবে তার হৃদয়হরণ করব? ভেবে ভেবে যখন অস্থির তখন মনে পড়েছিল, বাবার মত আমিও তো বেরিয়ে পড়তে পারি। দিগ্বিদিকে কত বিচিত্র মানুষের মেলা সাজানো। প্রতি মুহূর্তে কত চমকপ্রদ ঘটনাই তো ঘটে যাচ্ছে। সে সব থেকে গল্প বার করে এনে নয়নতারাকে খুশি করতে পারি।

আমার মা আমার স্বভাবটাকে একটা দুর্গের মধ্যে পুরে রেখেছিলেন। তার ভেতর থাকতে থাকতে আমি যেন শিকল-পরা দাঁড়ের পাখিটি হয়ে গিয়েছিলাম।

দাঁড়ের পাখিকে মুক্তি দিলেও সে অবাধ আকাশে উড়ে যেতে পারে না, অভ্যাস-বশে ঐ দাঁড়েই বসে থাকে। সে বোধ হয় বুঝতেই পারে না তার পা থেকে শিকল খুলেছে। আসলে বাঁধা থাকতে থাকতে উড়বার সাধটা যায় নষ্ট হয়ে, মুক্তির তৃষ্ণা আর থাকে না।

আমারও হয়েছিল তা-ই। বাবা অবশ্য মাঝে মাঝে এসে আমার অভ্যাসের ভিত্‌টাকে জোরে জোরে নাড়িয়ে দিয়ে যেতেন। দুর্গের দেওয়াল খানিকটা ভেঙে আমাকে নিয়ে ছুট লাগাতেন মুক্ত প্রান্তরে, নীলাকাশের নিচে অথৈ নিঃসীম বিলে। আমার রক্তের ভেতর যাযাবরত্বের খানিকটা উত্তরাধিকার বুঝি সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছিলেন বাবা।

বাবা যে ক'টা দিন থাকতেন আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াতেন, পুরনো অভ্যাস

আর সংকীর্ণের কথা আর খেয়াল থাকত না। তার সঙ্গে সব শিকড় ছিঁড়ে আমিও ভেসে যেতাম।

কিন্তু বাবার প্রভাব যে কত ক্ষণস্থায়ী, তিনি চলে যাবার পরই টের পেয়ে যেতাম। তিনি গেলেই মায়ের সর্বব্যাপী অমোঘ ব্যক্তিত্ব আমাকে মুহূর্তে গ্রাস করে ফেলত। দুর্গের যে সব দেওয়াল বাবা ভেঙে দিয়ে যেতেন নিমেষে মা তা মেরামত করে আবার আমাকে তার ভেতরে পুরে দিতেন। বাবা থাকতে মনে হত শিকড় ছিঁড়ে ফেলেছি। তিনি যাবার পর তার খেয়াল হত, ছেঁড়া তো দূরের কথা, তা যেন আরো দৃঢ় আরো নির্মম হয়ে আমাকে কঠিন মুঠিতে ধরে রেখেছে।

মা আমাকে স্রোতের যে দিকে টেনে নিয়ে যেতেন মাঝে মাঝে এসে বাবা তার উল্টো দিকে টানতে চাইতেন। কিন্তু বাবার ধৈর্য কম, একাগ্রতা স্বল্প। সুতরাং উজান টানে আমাকে খানিকটা নিয়ে গিয়েই সব ছেড়ে ছুড়ে পালাতেন। তখন দ্বিগুণ বেগে মা আমাকে তাঁর দিকে টেনে নিতেন। এই টানাটানির খেলায় চিরদিনই মায়ের জিত আর বাবা প্রতিবারই হেরে যেতেন।

বাবা এসে হঠাৎ দোলায় দুলিয়ে যেতেন মাত্র। দীর্ঘকাল আমাদের কাছে থাকলে কী হত বলা যায় না। তবে যেটুকু প্রভাব আমার ওপর তিনি ফেলেছেন তাতে চারিদিকের অবরোধ ভেঙে উন্মুক্ত হয়ে দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

বাবা যা পারেন নি, নয়নতারা তা পেরেছিল। চারিদিকের দুর্গ-দেওয়াল চুরমার করে সে আমাকে উন্মাদ ঝড়ের মুখে ছুঁড়ে দিয়েছিল।

মাঝে মাঝে ক্লাসে যাওয়া বন্ধ করে জেলা শহরের পথে পথে, কখনও শহরের সীমানা ছাড়িয়ে দূর প্রান্তরে, মেলায়, যাত্রার আসরে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছিলাম। ঘুরে ঘুরে গল্প যোগাড় করতাম, মনোরম লোকগীতি সংগ্রহ করতাম। মানুষ এবং প্রকৃতির ভেতর চলতে চলতে মজার মজার যে সব ঘটনা চোখে পড়ত অথবা কানে শুনতাম, খাতায় টুকে নিতাম। আর সে সব এনে নয়নতারার সভায় বলতাম।

মনে আছে, শনিবার আর বিবিবাজারে যাওয়া হচ্ছিল না। সে অবকাশ কোথায়? নয়নতারা তার অসীম সম্মোহনে আমাকে জেলা শহরে ধরে আটকে রাখছিল।

বিবিবাজার থেকে সেই যে এসেছিলাম তারপর দু-সপ্তাহের মত সেখানে যাওয়া হয়নি। সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মেই মায়ের চিঠি এসেছিল। আমি লিখেছিলাম, লেখাপড়ার এখন খুব চাপ। এসময় বাড়ি যাওয়া সম্ভব হবে না। উত্তরে মা লিখেছিলেন, পড়াশোনার ক্ষতি করে বাড়ি যাবার দরকার নেই।

মাকে মিথ্যে লিখেছিলাম। জীবনে মায়ের সঙ্গে সেই আমার প্রথম মিথ্যাচার।

ঝুলনের চিঠিও আসছিল বিবিবাজার থেকে। মাট্রিকুলেশন পাশ করে জেলা শহরে আসার সময় প্রতিজ্ঞা করে এসেছিলাম, দু-দিন পর পর চিঠি লিখব আর সপ্তাহান্তে একবার অন্তত বিবিবাজারে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে আসব। কিন্তু শপথের কথা যেন ভুলতে বসেছিলাম। বিবিবাজারে যাওয়া তো হচ্ছিলই না, চিঠি লেখাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

অভিযোগ করে, অনুযোগ করে, পুরনো শপথের কথা স্মরণ করিয়ে ঝুলন চিঠির পর চিঠি লিখছিল। তাকেও লেখাপড়ার দোহাই দিয়ে থামাতে চেয়েছিলাম।

ঝুলনের সঙ্গেও সেই আমার প্রথম মিথ্যাচার।

উনিশ

শুধু মা আর ঝুলনের সঙ্গেই না, হীরুর সঙ্গেও আমাকে মিথ্যাচার করতে হয়েছিল। হীরুর সঙ্গেও জীবনে সেই আমার প্রথম মিথ্যাচার।

মনে আছে, আমার বাবুয়ানা, আমার পরিবর্তন এবং মাঝে মাঝে কলেজ কামাই হীরুর কাছে ক্রমশ ধরা পড়তে শুরু করেছিল।

প্রথমটা কৌতুকের সুরেই হীরু জিজ্ঞেস করেছিল, 'সাধু সন্ন্যাসী মানুষের হঠাৎ এমন মতিচ্ছন্ন হল কেন রে ?'

হীরুর ইঙ্গিত বুঝতে না পেরে চমকে উঠেছিলাম। কাঁপা শিথিল গলায় বলেছিলাম, 'মানে ?'

'নিজের দিকে তাকিয়ে দ্যাখ না।'

তাকিয়ে লজ্জা পেয়ে গিয়েছিলাম। পোশাকটাই শুধু বাহারে আর ঝকমকে নয়, সময়.প্রসাধনকলার আরো অনেক ছাপ তাতে ছিল। সেন্ট, পাউডার, সুগন্ধি ক্রিম—কবে থেকে যে এ-সবের ব্যবহার শুরু করেছিলাম, নিজেরই তা খেয়াল ছিল না। দেখতে দেখতে মাথা আমার কাটা যাচ্ছিল যেন।

'হ্যাঁ রে—' অন্তরঙ্গ স্বরে হীরু ডেকেছিল।

মুখ না তুলেই সাড়া দিয়েছিলাম, 'কী ?'

'একটা সত্যি কথা বলবি ?'

বুকের ভেতরটা দুরু দুরু করছিলই। এবার সেটা অসহ্য হয়ে উঠেছিল। বলেছিলাম, 'তোর কাছে কোনদিন মিথ্যে কথা বলেছি ?'

'না, তা নয়।' একটু অপ্রতিভ হয়েছিল হীরু। তারপর সেই ভাবটা সামলে

বলেছিল, 'হঠাৎ এত সাজগোজের বাহার শুরু করেছিস যে ; ব্যাপারটা কী ?'

তৎক্ষণাৎ উত্তরটা খুঁজে পাইনি। খানিক চুপ করে থেকে বলেছিলাম, 'এমনি।'

আমার জবাব যে হীরুর কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে ; তার চোখমুখ দেখে এমন মনে হয়নি। সে বলেছিল, 'এমনি এমনি হঠাৎ কেউ বাবু সাজে! তুই বললি আর আমিও মেনে নিলাম!'

আমি নিশ্চুপ।

হীরু আবার বলেছিল, 'বেশ মেনেই নিলাম, তোর প্রাণে শখটা উথলে উঠেছে। কিন্তু এটা কেন হচ্ছে ; তার কারণটা কী ?'

আমি চকিত হয়ে উঠেছিলাম, 'কিসের কথা বলছিস ? কিসের কারণ ?'

'ক' বছর তোর সঙ্গে পড়ছি বল্ তো ?'

'অনেক বছর, কেন ?'

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আপন মনে হিসেব করেছিল হীরু, 'স্কুলে টু থেকে টেন ; তার মানে ন' বছর। কলেজে এ বছর নিয়ে তিন বছর। তা হলে বারো বছর ; কেমন ?'

'হ্যাঁ।'

'এই বারো বছরে ক'দিন স্কুল আর ক'দিন কলেজ কামাই করেছিস আমি বলতে পারি। সেই তোর বাবা যেবার প্রথম এলেন তখন দিন দুয়েক ; ক্লাস এইটে একবার তোর জ্বর হয়েছিল তখন তিনদিন আর দাদু-দিদিমার অসুখ-টসুখ আর শ্রাদ্ধের জন্যে দিন পনের। মোট কুড়ি-বাইশ দিনের বেশি হবে না।'

হীরু যে এত হিসেব মনে রেখেছে, কে তা জানত। অবাক বিস্ময়ে আমি তার দিকে তাকিয়েছিলাম।

হীরু বলেছিল, 'কি রে, বারো বছরে ঐ ক'দিনই তো কামাই করেছিস ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু—'

আমার মনোভাব যেন টের পেয়েছিল হীরু। বলেছিল, 'তুই কী বলতে চাস বুঝতে পারছি। কেন হঠাৎ কামাইয়ের হিসেব নিয়ে বসেছি, তাই জানতে চাস তো ?'

আমি আস্তে ঘাড় কাত করেছিলাম। অর্থাৎ হ্যাঁ।

হীরু বলেছিল, 'বারো বছরে স্কুল কলেজ কামাই করেছিস কুড়ি বাইশ দিন। অথচ গেল দু-আড়াই সপ্তাহে আট দিনের মত কলেজে যাসনি। কারণটা কী ?'

হকচকিয়ে গিয়েছিলাম, 'কারণ আবার কী ?'

'কারণ না থাকলে কেউ শুধু শুধু কামাই করে ? অন্তত তোমার মত ছেলে ?'

'আমার পেট ব্যথা করছিল।'

'আট দিনই।'

'না, আটদিনই নয়।' অনিশ্চিতভাবে আমি মাথা নেড়েছিলাম, 'মাঝে মাঝে মাথাও খুব ধরছিল।'

'কিন্তু—' হীরু সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকিয়েছিল।

দুর্বল গলায় বলেছিলাম, 'কী ?'

'পেটের অসুখ হলে কি মাথা ধরলে লোকে তো বিছানায় পড়ে থাকে। কিন্তু আমি খবর নিয়ে জেনেছি—'

'কী জেনেছিস ?'

'কলেজ কামাই করে তুই হোস্টেলে ছিলি না।'

আরো কতদূর কী হীরু জেনেছে, সেই মুহূর্তে বুঝতে পারছিলাম না। এ প্রসঙ্গে আর কোন প্রশ্ন করতে সাহস পাইনি। শুধু বলেছিলাম, 'আজকাল গোয়েন্দাগিরি করছিস নাকি ?'

'গোয়েন্দাগিরি আমার স্বভাব নয়।' হীরু অসন্তুষ্ট রাগ রাগ গলায় বলেছিল, 'তবে মনে হচ্ছে, এবার থেকে ওটা করতে হবে।'

আমি ভয় পেয়ে সতর্ক হয়ে গিয়েছিলাম।

কিন্তু ক'দিন আর। আত্মবিস্মৃতির ঘোর আবার আমাকে দুর্গম বেগে ছুটিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করছিল।

প্রথম প্রথম হীরু হয়ত আমাকে সন্দেহ করে থাকবে। কিন্তু কোথায় আমি যেতাম, কেন যেতাম—এ-সব সে জানত না। কিন্তু খুব বেশিদিন তার চোখে ধুলো দিয়ে রাখতে পারিনি।

মনে পড়ে, একদিন রাত্রিবেলা নয়নতারার সভা থেকে হোস্টেলে ফিরে দেখি মুখ গম্ভীর করে হীরু বসে আছে। অন্য সব দিন এই সময়টা তাকে বড় একটা ঘরে পাওয়া যেত না। খেলাধুলো বা অন্যান্য কোন ব্যাপারে সে বাইরে যেতে থাকত। আর ঘরে থাকলেও একা থাকত না। সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে দলবলে হৈ-হৈ করত।

সেদিন কিন্তু সে একেবারে একা। এক মুহূর্ত যে সঙ্গীহীন থাকে না তাকে ওভাবে একা একা বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তার মুখ চোখের চেহারা দেখে আমার হৃৎপিণ্ডে চমক খেলে গিয়েছিল। আবহাওয়াটাকে হাল্কা করবার জন্য বলেছিলাম, 'কি রে মুখখানা হাঁড়ি করে বসে আছিস কেন ?'

'প্রয়োজন হয়েছে, তাই।' রুক্ষ স্বরে হীরু বলেছিল।

তার গলায় এমন কিছু ছিল, এমন একটা নিদারুণ ইঙ্গিত যাতে শিউরে উঠেছিলাম।

হীরু এবার বিছানা থেকে উঠে সোজা আমার কাছে চলে এসেছিল, 'তুই যে এত অধম হয়ে যাবি, কোনোদিন আমি ভাবতেও পারিনি। মানুষ এত জাহান্নমেও যায়।'

'কী বলছিস তুই?' শিথিল গলায় জিজ্ঞেস করেছিলাম।

'যা বলছি তা ঠিকই বুঝতে পারছিস।'

'না, পারছি না।'

হীরুর চোখ এবার জ্বলে উঠেছিল। তীক্ষ্ণ নিষ্ঠুর গলায় সে বলেছিল, 'খারাপ কথাগুলো আমার মুখ থেকে না শুনলেই কি নয়?'

আমার সম্বন্ধে কতটা কি হীরু জানতে পেরেছে বুঝতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল, আমি যদি চুপ করে যাই, হার মেনে নিই, সে পেয়ে বসবে। আমার নীরবতা তার অভিযোগকে সুদৃঢ় করবে। এমন কি তা প্রমাণিত হয়ে যাবারও সম্ভাবনা। অতএব যুদ্ধ ঘোষণাই শ্রেয়। গলা চড়িয়ে চেঁচিয়ে ছিলাম, 'তুই কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস?'

'হ্যাঁ, দেখাচ্ছি।'

'যাকে দেখাচ্ছিস সে ভয়টা পেল কিনা বুঝতে পারছিস?'

'হ্যাঁ, পারছি।'

'প্রমাণ?'

'ঐ যে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছিস, সেটাই প্রমাণ। ভয় না পেলে কেউ এমন করে চেঁচিয়ে সব কিছু অস্বীকার করতে চায় না।'

একবার যখন গলা তুলেছি তখন আর সেটা নামানো অসম্ভব। একইভাবে বলে যাচ্ছিলাম 'আমি ভয় পাইনি।'

'পাস নি?'

'না।'

'বেশ। তোর যখন এতই বুকের পাটা তখন বল ঐ মেয়েটা কে? কী তার পরিচয়? কেন রোজ রোজ তার কাছে যাস?'

আমি চমকে উঠেছিলাম। তবে তো নয়নতারার খবর পেয়ে গেছে হীরু। মুহূর্তে আমার গলা নেমে গিয়েছিল। শিথিল গলায় গোঙানির মত শব্দ করে কি

বলেছিলাম, নিজের কাছেই তা স্পষ্ট ছিল না। আমার হাত-পা ভয়ংকর কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে বরফের মত ঠাণ্ডা একটা স্রোত ওঠানামা করছে।

হীরু সমানে বলে যাচ্ছিল, 'অনেক মিথ্যে তুই আমার কাছে বলেছিস। কেন তোর এত বাবুয়ানা, কেন তোর এত ক্লাস কামাই—সে সব তুই আমার কাছে গোপন করেছিস। কিন্তু চিরকাল অন্যের চোখে ধুলো দিয়ে রাখা যায় না। ছিঃ ছিঃ, শেষ পর্যন্ত একটা বাজে মেয়েমানুষের পায়ে নিজেকে বিকিয়ে দিবি, এ আমি কল্পনাও করতে পারেনি।'

আমি নিরুত্তর।

হীরু বলেছিল, 'একটা বেশ্যার জন্যে নিজের সুনাম, সম্মান, মনুষ্যত্ব—সব পথের ধুলোয় লুটিয়ে দিলি!' একটু চুপ করে দৃঢ় গলায় ফের শুরু করেছিল, 'কিন্তু এ আমি কিছুতেই হতে দেব না। তুই আমার প্রাণের বন্ধু. তা ছাড়া ক'দিন পর আত্মীয় হতে যাচ্ছিস। আমার চোখের সামনে তুই অধঃপাতে যাবি, কিছুতেই তা হবে না। নিজের মন ফেরা বন্ধু, আবার তুই আগের মত হয়ে যা।' হীরু আমার একটা হাত ধরে অনুনয় করেছিল।

হীরু কিভাবে নয়নতারার খবর পেয়েছিল, বলতে পারব না। হয়ত আমাকে অনুসরণ করে নয়নতারাদের বাড়ি সে গিয়ে থাকবে। কিংবা অন্য কোন উপায়ে খবরটা সংগ্রহ করেছিল।

যাই হোক, হীরুর সেদিনের ধিক্কার আমাকে কিছুদিনের জন্য সংযত রেখেছিল। নয়নতারাকে ভুলে গিয়ে পুরনো 'অধ্যয়নং তপঃ'র জীবনে ফিরে আসতে চেষ্টা করেছিলাম।

কিন্তু সেই যাদুকরীকে ভুলে যাওয়া কি এতই সহজ! গথিক স্থাপত্যের সেই বাড়িটির নিভৃতে বসে অবিরাম সে আমার দিকে ডাকিনীমন্ত্র ছুঁড়ে যাচ্ছিল। হীরুকে লুকিয়ে আবার আমি সেখানে যেতে শুরু করেছিলাম।

হীরুও তাকে তাকে থাকত, দু-চারদিন নয়নতারার কাছে যেতে না যেতেই সে আমাকে ধরে ফেলত। আবার শুরু হত অনুনয়, রাগ, অভিমান, ভৎর্সনা। আবার কিছুদিন নয়নতারার কাছে আমি যেতাম না।

দুটো বিরুদ্ধ স্রোত আমাকে নিয়ে টানাটানি করে যাচ্ছিল। একদিকে হীরু, আরেক দিকে নয়নতারা। কিন্তু হীরুর শক্তি আর কতটুকু! তার সাধ্য ছিল না আমাকে ফেরাতে পারে। কয়েক দিন থেমে থাকার পরই আমি আবার নয়নতারার কাছে ছুটেছিলাম।

আবার আমাকে বোঝাতে বসত হীরু, রাগারাগি করত, গালাগাল দিত। এমন

কি' মাঝে মাঝে কথাও বন্ধ করে দিত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হত না।

এভাবে চলতে চলতে হীরুর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা শেষ পর্যন্ত বিপজ্জনক একটা জায়গায় পৌঁছেছিল। সে একদিন আমাকে শাসিয়ে দিয়েছিল, 'ধৈর্যের শেষ সীমায় আমি এসে গেছি। এখনও যদি নিজেকে না সামলাস বাধ্য হয়ে বাবাকে সব বলতে হবে। বলব তোর সঙ্গে ঝুলনের বিয়ে বন্ধ করে দিতে। ঝুলনের দিকটাও আমাকে দেখতে হবে তো।'

তবু আমি নয়নতারার কাছে যাচ্ছিলাম।'

কিন্তু সেখানে গিয়ে লাভ হচ্ছিল কি? বিন্দুমাত্র না। লটারীতে আমার নাম উঠছিল না।

কুড়ি

হীরুর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব যখন সূক্ষ্ম সুতোয় ঝুলছে, যখন মনে হচ্ছিল যে কোন দিন যে কোন মুহূর্তে ওটা ছিঁড়ে যাবে সেই সময় মায়ের একখানা চিঠি এসেছিল।

মা লিখেছিলেন, পত্রখানি টেলিগ্রাম মনে করে অমুক তারিখে অতি অবশ্য আমি যেন বিবিবাজারে আসি। বিশেষ প্রয়োজন।

প্রয়োজনটার কথা বিশদভাবে লেখা ছিল না। চিঠি পেয়ে আর অপেক্ষা করিনি। দুরু দুরু বুকে বিবিবাজারের ট্রেনে গিয়ে উঠেছিলাম। দুরু দুরু বুকে, কেননা, বুঝতে পারছিলাম না, নয়নতারার প্রসঙ্গ জড়িয়ে আমার সম্বন্ধে হীরু কোন কথা লিখেছে কিনা।

বাড়ি এসে আমি অবাক। মা বাড়িতে নেই, আমার এক ছোট ভাই বাদল কঙ্কালসার হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম, দাদু-দিদিমার শ্রাদ্ধ চুকিয়ে জেলা শহরে আমি যেদিন চলে যাই তার সপ্তাহখানেক পর থেকেই ঠাণ্ডা লেগে নিমুনিয়ায় পড়েছে বাদল। দিন পনের ভোগার পর জ্বরটা অবশ্য ছেড়ে গেছে কিন্তু এখনও ভাত পথ্য পায়নি। রোগা, নির্জীব, হাড়সার হয়ে গেছে সে।

বাদলের অসুখের কথা আমাকে মা জানান নি। সে জন্য খুব রাগ হয়েছিল, অভিমান হয়েছিল। ভেবেছিলাম, এর জন্য কৈফিয়ৎ চাইব।

বাদল ছাড়া অন্য ভাইবোনেরা আমার চারপাশে ঘুর ঘুর করছিল আর মুচকি মুচকি দুষ্টুমির হাসি হাসছিল। তাদের হাসি প্রথমটা লক্ষ করেনি। অভিমানে তখন আমি ভরপুর, অবশ্য হীরু নয়নতারার কথা জানিয়ে চিঠি লিখেছে কিনা সে সম্বন্ধে অনিশ্চিত একটা ভয়ও ছিল। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এই, মা কোথায় রে?'

আমার বোন মালতীটার দারুণ বুদ্ধি। ছেলেবেলাতেও এমনি পাকা পাকা কথা বলত। চোখ ঘুরিয়ে সে বলেছিল, 'মা এক জায়গায় গেছে।'

'কোথায় ?'

'এখন বলব না।'

'বল শিগগীর, নইলে মার লাগাব।'

ভয় দেখানোর পর মালতী বলেছিল, 'মা বৌদিদের বাড়ি গেছে।'

'বৌদি আবার কে রে ?' আমি অবাক।

'আহা জানে না যেন ! নিজের সঙ্গে কার বিয়ে হবে ?'

অর্থাৎ ঝুলনের কথা বলেছিল মালতী। আমি চকিত হয়ে উঠেছিলাম মা কেন ঝুলনদের বাড়ি গেছেন ? হীরু কি সব জানিয়ে চিঠি দিয়েছে ? আমি ঘামতে শুরু করেছিলাম।

মালতী আবার বলেছিল, 'জানো বড়দা, বৌদির বাবা ঘোড়ার গাড়ি ক'রে মাকে নিয়ে গেছে।'

ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। সব কেমন যেন অদ্ভুত আর রহস্যময় [illegible] [illegible]। মালতীকে আমি কি বলতে যাচ্ছিলাম, সেই সময় সদরে হীরুদের ফীটন [illegible] থেমেছিল। সেটা থেকে মা নেমে এসেছিলেন। ফীটনে হীরুর বাবাও [illegible] তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলাম না, গলার স্বর শুনে বুঝতে পারছিলাম। তিনি [illegible] বলছিলেন, 'চলুন, আপনাকে বাড়ির ভেতর দিয়ে আসি।'

মা বলেছিলেন, 'না-না, আপনাকে আর কষ্ট করে নামতে হবে না। এই তো দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন।'

'তা হলে অনুমতি করুন, এবার যাই।'

'হ্যাঁ আসুন।'

ঘোড়ার গলায় ঘন্টির শব্দ তুলে ফীটন চলে গিয়েছিল।

গাড়ি থেকে নেমে মা সদরের যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে হীরুর বাবার সঙ্গে কথা বলছিলেন সেখানে তাঁকে সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছিল না। শাড়ির আঁচল, গালের একটা দিক, খানিকটা চুল, একটা হাত—মাত্র এইটুকুই দেখতে পাচ্ছিলাম।

ফীটন চলে গেলে মা সদর থেকে বাড়ির ভেতরে এসেছিলেন। তাঁকে দেখতে দেখতে অপার বিস্ময়ে আমার দৃষ্টি নিষ্পলক হয়ে গিয়েছিল।

সেদিন আজন্মের চেনা সেই দীন যোগিনী বেশটা ছিল না মায়ের। পরনে সেদিন, তাঁর ধবধবে টাঙ্গাইলের শাড়ি আর রঙীন ব্লাউজ। চুলটি পরিপাটি করে বাঁধা, সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর। এতেই তাঁকে অপরূপা মনে হচ্ছিল। মায়ের

দিকে তাকিয়ে চোখ আর ফেরাতে পারছিলাম না।'

বাবা না থাকলে মায়ের এমন বেশ কোনোদিন দেখিনি। হঠাৎ কি ঘটতে পারে যাতে মা এমন করে সেজে হীরুদের বাড়ি গিয়েছিলেন?

উঠানে পা দিয়েই মা আমাকে দেখতে পেয়েছিলেন। খুশি গলায় বলেছিলেন, 'জেলা শহর থেকে কখন এলি বন্ধু?'

পাশ থেকে আমার হয়ে মালতীই উত্তর দিয়েছিল, 'দাদা একটু আগে এসেছে।'

মায়ের কণ্ঠস্বর শুনে, তাঁর চোখমুখ এবং সাজসজ্জা দেখে আশ্বস্ত হয়েছিলাম। হীরু নিশ্চয়ই সব জানিয়ে চিঠি লেখেনি। লিখলে মা অন্য রূপে আমার সামনে এসে দাঁড়াতেন।

আশ্বস্ত হয়েছিলাম কিন্তু বিস্ময় কাটে নি। একদৃষ্টে মায়ের দিকে তাকিয়েই ছিলাম।

মা বোধ হয় আমার মনের কথা টের পেয়েছিলেন। লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে ছুট লাগিয়েছিলেন। যেতে যেতে বলেছিলেন, 'তুই একটু বোস্, আমি আসছি।'

একটু পর যখন তিনি বেরিয়ে এসেছিলেন তখন সর্বাঙ্গে সেই পুরানো দীন বেশ। ঘরের বাইরে এসে সোজা আমার পাশে বসে পড়েছিলেন মা। বলেছিলেন, 'আমি জানতাম আজই তুই আসবি। কখন এসে পৌছুবি তা অবশ্য বুঝতে পারছিলাম না। ভেবেছিলাম সকালের দিকেই আসবি।'

মায়ের কথার জবাব না দিয়ে বলেছিলাম, 'বাদলটার এমন অসুখ, আমাকে জানাও নি কেন?'

'ভেবেছিলাম, জানালেই তো ছুটে আসবি। বাবা-মা'র ব্যাপারে এতদিন এসে রইলি, লেখাপড়ার ক্ষতি হয়ে গেছে। আবার যদি এসে থাকিস আবার ক্ষতি হবে। তাই আর জানাই নি।'

আমি হকচকিয়ে গিয়াছিলাম। জেলা শহরে বসে তখন কি মন প্রাণ সঁপেই না লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছিলাম! সব কথা মা যদি জানতেন! যাই হোক বাদলের অসুখ নিয়ে আর কিছু বলতে সাহস হয়নি। নিদারুণ এক অপরাধবোধ আমাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল।

মা বলেছিলেন, 'আজ সকাল থেকে তোর পথ চেয়ে ছিলাম। তুই আসছিস না দেখে শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল।' একটু চুপ করে থেকে মা আবার বলেছিলেন, 'জানিস বন্ধু আজ আমি বুলন মাজের বাড়ি গিয়েছিলাম। এই মাত্র

সোমেশবাবু আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।'

আগে আর কোনদিন ঝুলনদের বাড়ি যাননি মা। এভাবে আমাকে না জানিয়ে হঠাৎ কেন তিনি সেখানে গিয়েছিলেন, বুঝতে পারছিলাম না। এই অভাবনীয় ব্যাপারে আমি বিমূঢ় হতে পারতাম, বিস্মিত হতে পারতাম। কিন্তু সেই অপরাধ বোধটা তখনও আমার কাটেনি। আস্তে করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'ওখানে গিয়েছিলে কেন?'

আমার গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মা বলেছিলেন, 'না গিয়ে আমার উপায় ছিল না বাবা।'

মা এভাবে কোনদিন আমাকে আদর করেন নি। বাবা থাকলে অবশ্য তাঁর স্নেহের ঢল নামত। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে এমন আদর ছিল অকল্পনীয়।

বলেছিলাম, 'কি এত নিরুপায় হয়ে পড়লে যাতে সোমেশবাবুদের কাছে তোমাকে ছুটতে হল?'

'তুই রাগ করবি না বল।'

মা তবে আমাকেও ভয় পান! বলেছিলাম, 'কি আশ্চর্য, রাগের কি আছে! তুমি বল।'

এক মুহূর্তে চুপ করে ছিলেন মা। তারপর মরিয়ার মত বলেছিলেন, 'ঝুলনকে আশীর্বাদ করে এলাম। আসছে মাসে তোর বিয়ে।'

কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আমার হৃৎপিণ্ডে শাণিত ফলার মতো তীব্র গতিতে কি যেন ঢুকে গিয়েছিল। অনুভব করছিলাম, আমার অস্তিত্বের সকল প্রান্তে একটা আকাশ-ফাটানো কলরোল চলছে। বিভ্রান্তের মত দিশেহারার মত বলেছিলাম, 'আসছে মাসে আমার বিয়ে। এ তুমি কি বলছ!'

'ঠিকই বলছি বকু। এ ব্যবস্থা ছাড়া তোর পড়াশোনা চালানো সম্ভব হত না। বাবার প্রভিডেন্ট ফাণ্ড যা পেয়েছিলাম তা থেকে বাদলের অসুখে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে। তোর কলেজের মাইনেটা অবশ্য ফ্রী। কিন্তু বি. এস-সি. ক্লাসে উঠবার পর থেকে হোস্টেলে অর্ধেক চার্জ দিতে হচ্ছে। তা ছাড়া বইখাতা, হাতখরচ —এ সবও তো লাগে। যা টাকা আছে তা থেকে তোকে যদি মাসে মাসে পনেরটা করে টাকা দিতে হয় তাতে তোর বি. এস-সি. পরীক্ষা পর্যন্ত সংসার চালাতে পারব না। তুই আমার এক মাত্র ভরসা বাবা। আমি জানি তোর লেখাপড়া শেষ হলে আমার কোন দুঃখই থাকবে না। তাই ঝুলনের বাবার কাছে গিয়েছিলাম। একদিন উনি তোর পড়ার দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন। সেদিন তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, আজ নিজের থেকেই তাঁর কাছে যেতে হল। উনি রাজী হয়েছেন আমার

কথায়। অবশ্য বলেছিলেন, 'বিয়ের কি দরকার ? বকুর যা খরচ লাগে আমি চালিয়ে যাচ্ছি।' আমি বলেছি, 'তা হয় না চাটুজ্জে মশায়। খালি হাতে আমি কিছু নিতে পারব না। আমার তো আর কিছুই নেই। ঐ ছেলেই আপনাকে দিলাম। তবে একটা কথা, বিয়েটাই শুধু হবে।' লেখাপড়া শেষ করে বকু যতদিন চাকরি না পাচ্ছে ততদিন মেয়ে কিন্তু আপনার কাছেই থাকবে।' ঝুলনের বাবা বলেছেন, 'আপনার যখন এই ইচ্ছে তার ওপর আমার কথা নেই।' উনি রাজী হতে একজন পুরুত ডাকিয়ে ঝুলনকে আশীর্বাদ করে এলাম। তোর সঙ্গে পরামর্শ না করেই কাজটা করেছি বকু। আমি জানি তুই আমার মুখ রাখবি।'

'এ তুমি কী করেছ মা। এ অবস্থায় কেউ কখনো বিয়ে করে! না না, সে আমি পারব না।'

'এ তোকে পারতেই হবে বাবা। নইলে আমি মুখ দেখাতে পারব না।'

একটু চুপচাপ। তারপর মা-ই আবার বলেছিলেন, 'কাল সকালে সোমেশবাবু তোকে আশীর্বাদ করতে আসবেন।'

বিহ্বলের মত বলেছিলাম, 'এই জন্যেই কি তুমি চিঠি লিখে আমাকে আনিয়েছ ?'

'হ্যাঁ।'

পরের দিন ঝুলনের বাবা আমাকে আশীর্বাদ করে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে টীকুও এসেছিল। এত তাড়াতাড়ি চিঠি লিখে তাকে জেলা শহর থেকে আনানো সম্ভব না। হয়ত লোক পাঠিয়ে তাকে আনিয়েছিলেন সোমেশবাবু।

আশীর্বাদের পর আমাকে আড়ালে ডেকে টীকু বলেছিল, 'কাউকে কিছু বলিনি। আমার ইচ্ছে এবার থেকে ঠিকমত চলবি। তোর ওপর বিশ্বাস এখনও হারাইনি। আশা করি সে বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবি।'

একুশ

মনে আছে আশীর্বাদের পালা চুকবার পর সেদিনই ডিস্ট্রিক্ট টাউনে ফিরে এসেছিলাম।

বাদলের অসুখ, আচমকা বিয়ে ঠিক হওয়া, সোমেশবাবুর হাতে আমার লেখাপড়ার দায়িত্ব চলে যাওয়া ইত্যাদি সব একাকার হয়ে আমার ওপর বিচিত্র প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে দিয়েছিল। তা ছাড়া টীকুর সেই কথাগুলোও অবিরত কানে বেজে যাচ্ছিল। নয়নতারার খবর জেনেও আমার ওপর সে বিশ্বাস হারায় নি, তার ধারণা তখনও আমার মধ্যে ভালত্বের খানিকটা তলানি অবশিষ্ট ছিল। তাই ঝুলনের সঙ্গে আমার বিয়েতে সে বাধা দেয়নি।

এবার থেকে হীরুর বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে হবে, নিজেদের সংসারের দিকে চোখ ফেরাতে হবে। তা ছাড়া ঝুলনের আশৈশব ভালবাসার প্রশ্ন তো ছিলই।

মা তো আমার আজন্মের চেনা। কত দুঃখে, কত বেদনায়, কত নিরুপায় হয়ে তাঁর মত ব্যক্তিত্বময়ী আত্মসম্মানে-ভরা মানুষ যে আমার দায়িত্ব সোমেশবাবুকে তুলে দিয়েছিলেন, বুঝতে পারছিলাম। তখন থেকে আমার স্বত্বের অনেকখানিই চলে গিয়েছিল সোমেশবাবুর হাতে। আমার পক্ষে এমন কিছু করা সম্ভব না বা উচিতও না যাতে সোমেশবাবু অসন্তুষ্ট হন। বিয়েটা আমার হাত পায়ে নানা দিক থেকে অনেকগুলো শেকল যেন পরিয়ে দিয়েছিল। আমার দায়িত্ব এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছিল।

আমিও সব কিছু ভুলে, নয়নতারার চিন্তা নির্বাসনে পাঠিয়ে নতুন উদ্যমে আবার পড়াশোনায় মনোযোগ দিয়েছিলাম। অমার ওপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, যে বিশ্বাস রাখা হয়েছিল, আমাকে তার যোগ্য হতে হবে। আমাকে নিয়ে দুই বিরুদ্ধ পক্ষের টানাটানির যে খেলা তাতে এতকাল নয়নতারাই জিতে এসেছে। এতদিন প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা হচ্ছিল হীরু আর নয়নতারার মধ্যে। তাতে নয়নতারার দিকের টানটা ছিল অনেক বেশি। এবার নেপথ্যে থেকে মা, ঝুলন, সোমেশবাবু, বাদল, ঝুলনের মা এবং সবার ওপর আমাদের সংসারটা বেরিয়ে এসে হীরুর পাশে দাঁড়িয়েছিল। শুধু দাঁড়ায়ই নি, সমস্ত শক্তি একত্র করে নয়নতারার কাছ থেকে আমাকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। টানাটানির খেলায় নয়নতারার বিপরীত দিকেরই এবার জোর বেশি।

মনে আছে দিনকয়েক বেশ ভালই কেটেছিল। আমি আবার আমার পুরানো জীবনের অক্ষরেখায় ফিরে গিয়েছিলাম। লক্ষ্য করেছি, সাময়িক বিভ্রমের পর আমার এই ফিরে আসায় হীরু খুবই খুশি। নয়নতারার ব্যাপারে তার যত ক্ষোভ দুঃখ অসন্তোষ জমা হয়েছিল, সেগুলো দ্রুত বিলীন হয়ে গেছে। নয়নতারার কথা সে বোধ হয় ভুলেই গিয়েছিল। সব তিক্ততা আর মালিন্যের অবসান ঘটিয়ে ঝলমলে স্নিগ্ধতা আবার ফিরে এসেছিল। আমাদের আশৈশব বন্ধুত্বের রথ কিছুদিন থমকে থাকার পর আবার ছুটতে শুরু করছিল।

দিনকয়েক কাটার পর হীরুকে বিবিবাজারে যেতে হয়েছিল। বিবিবাজারই অবশ্য ওর আসল গন্তব্য ছিল না। আসলে যাবে মুর্শিদাবাদ, সেখানে ওদের জমিদারি। কি একটা জরুরী প্রয়োজনে সোমেশবাবু হীরুকে খবর পাঠিয়েছিলেন, বিবিবাজার গিয়ে তাঁর সঙ্গে মুর্শিদাবাদে যেতে হবে। মুর্শিদাবাদে সপ্তাহ তিনেকের মত থাকতে হবে তাকে।

হীরু চলে গিয়েছিল। হোস্টেলের সেই ঘরটিতে আমি তখন একা।

মনে আছে, হীরু যেদিন বিবিবাজার গেল তার পরের দিন বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে নিজের ঘরটিতে বসে ছিলাম। জানালার বাইরে আদিগন্ত নীলাকাশ। ক'টি শঙ্খচিল ডানা মেলে অসীম শূন্যে ভাসছিল। অলস চোখে সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে সেই প্রতিজ্ঞাটার কথা ভাবছিলাম। এবার থেকে আমাকে ঝুলনের কথা ভাবতে হবে, সংসারের কথা ভাবতে হবে, ভাইবোনদের কথা ভাবতে হবে। আমার ওপর অনেক দায়িত্ব, সেটা আমাকে পালন করতে হবে। এখন থেকে এসব ছাড়া আর কোনদিকে আমার মনোযোগ দেওয়া চলবে না। ঝুলন-সংসার-ভাইবোন এবং মা—এঁদের ভাবনা নিয়েই আমাকে মগ্ন থাকতে হবে। যাতে অন্য কিছু অন্য দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে না পারে সেজন্য নিজের চারপাশে উঁচু উঁচু দেওয়াল তুলে রাখতে হবে।

বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যে সন্ধ্যা নেমে এসেছিল, খেয়াল নেই। হঠাৎ মধুর ডাকে চমকে উঠেছিলাম, 'দাদাবাবু—'

মধু আমাদের হোস্টেলের চাকর। চমকে তার দিকে তাকিয়েছিলাম, 'কি রে?'

'বাইরে আপনাকে একজন ডাকছে।'

'কে?'

'কে জানি না। তবে একজন মেইয়েছেলে।'

অর্থাৎ কোন স্ত্রীলোক। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কে আমাকে এই হোস্টেলে ডাকতে আসতে পারে বুঝতে পারছিলাম না। মধুকে বলেছিলাম, 'তাকে এখানে নিয়ে এসো।'

মধু বলেছিল, 'আসতে বলেছিলাম, এলেন না। আপনাকে যেতে কইল।'

বুকের ভেতর কিছু বিস্ময়, কিছু কৌতূহল আর অনেকখানি দুর্ভাবনা পুরে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। রাস্তার ধারে ঝাঁকড়া-মাথা বড় লিচু গাছটার তলায় আবছা অন্ধকারে একটি ফীটন দাঁড়িয়ে ছিল। ওটা আমার চেনা।

ফীটনটার দিকে চোখ পড়তেই ভূকম্পনের মত নিদারুণ কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেন ঘটে গিয়েছিল আমার সত্তার ভেতর। মধু যখন খবর দেয় তখনই আমার বুঝে নেওয়া উচিত ছিল, একজন—মাত্র একজনই এভাবে এখানে এসে আমাকে ডাকতে পারে। এমন দুঃসাহসিকা এ শহরে সে ছাড়া আর কেউ নেই।

ফীটনের জানালায় মুখ বাড়িয়ে নয়নতারা বসে ছিল। চোখাচোখি হতেই সে হাতছানি দিয়েছে। আর পায়ে পায়ে অসাড় অস্তিত্ব নিয়ে আমি কাছে গিয়েছিলাম।

ফিসফিসিয়ে নয়নতারা বলেছিল, 'কি ব্যাপার, আজকাল আর যাচ্ছেন না যে?

আমাকে ভুলে গেছেন নাকি? এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম খোঁজটা নিয়ে যাই—সত্যি ভুলে গেছেন কিনা।'

অবরুদ্ধ গলায় বলেছিলাম, 'না, মানে—'

'আসুন—ফীটনে উঠুন—' দরজা খুলে দিয়েছিল নয়নতারা।

শঙ্কিত গলায় বলেছিলাম, 'কোথায় যাব?'

'যেখানে আমি নিয়ে যাই।'

'কিন্তু—'

'আঃ, উঠে আসুন দিকি—

অনুভব করেছিলাম, যেখানে নিজেকে শৃঙ্খলা করে রাখতে চেয়েছিলাম সেখান থেকে শিকড়গুলি অতি দ্রুত ছিঁড়ে যাচ্ছে। আমার একটু আগের সমস্ত প্রতিজ্ঞা এক ফুৎকারে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। চারিদিকে সযত্নে যে দেওয়াল সাজিয়েছিলাম, নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছিল। আস্তে আস্তে নিজের অজান্তে ফীটনের ভেতর গিয়ে বসেছিলাম। নয়নতারার আহ্বান উপেক্ষা করব, সাধ্য কি।

আমি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ফীটন চলতে শুরু করেছিল।

মনে আছে, সেদিন সোজা আমাকে সেই গথিক স্থাপত্যের সুবিশাল বাড়িটায় নিয়ে গিয়েছিল নয়নতারা। সেখানে, বিরাট হল ঘরটায় ইতিমধ্যেই সবাই হাজির হয়েছিল।

যথারীতি কাব্যপাঠ, ম্যাজিক, গল্প, ইত্যাদির পর চিরদিনের মত লটারীতে শিকারী সোমনাথের নাম উঠেছিল।

এতদিন পর ওখানে গিয়েছিলাম, নিজেও যেতে চাইনি, হোস্টেল থেকে নয়নতারাই ধরে নিয়ে গিয়েছিল। মনের ভেতর সঙ্গোপন একটু আশা হয়ত ছিল, নয়নতারা যখন ডেকে নিয়ে গেছে তখন নিশ্চয় সেদিন আমার নাম লটারীতে উঠবে কিন্তু ওঠেনি। চিরদিন যার নাম ওঠে তাঁরটাই উঠেছিল।

শিকারী সোমনাথ বুঝিবা ভাগ্যের সঙ্গে স্থায়ী একটা চুক্তি করে এসেছিল চিরদিন তাঁর নামই শুধু লটারীতে উঠবে।

প্রথম আসার দিনটি থেকেই এই লোকটিকে মনে মনে ঈর্ষা করে আসছিলাম। সেদিন শুধু ঈর্ষাই নয়, আশাভঙ্গের আঘাতে রাগও হয়েছিল ভয়ানক। একটা লোক প্রতিদিন ভাগ্যকে করায়ত্ত করবে আর আমি পরাভূতের দলে হতাশের দলে নাম লিখিয়ে মাথা নীচু করে চলে যাব—রোজ রোজ এতটা মেনে নিতে মন সায় দেয়নি। কিন্তু যতই উত্তেজনা হোক, ভদ্রতার খাতিরে আর সেই অলিখিত নিয়ম অনুযায়ী সেদিনও বিদায় নিতে হয়েছিল।

আগের দিন সেই যে চারিদিকের দেওয়াল ধূলিসাৎ করে গিয়েছিল নয়নতারা, তারপর আর ঝুলনের কথা মনে পড়ছিল না। সংসার, ভাইবোন, মা—সব কিছু থেকে নয়নতারা আবার আমাকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। পুরনো সেই ঘোরটা, সেই মাতাল উন্মাদনা আমাকে আবার নয়নতারার কাছে ফিরিয়ে এনেছিল।

মনে হচ্ছিল, নয়নতারাকে আমার পেতেই হবে। লটারীতে নাম তুলে বাজি আমাকে জিততেই হবে। চিরকাল সোমনাথ বাজি জিতে যাবেন, এ হতেই পারে না। এ কথা যত ভাবছিলাম ততই জেদটা ক্রমশঃ তীব্র হচ্ছিল।

টাক্ল কাছে থাকলে কী হত, বলা যায় না। সে তার বাবার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ চলে যাওয়াতে আমাকে ঠেকাবার মত কেউ ছিল না। চক্ষুলজ্জা, সঙ্কোচ অথবা ভয়ের কোন প্রশ্নই আর থাকে নি। আমার গতিবিধি হয়ে উঠেছিল একেবারে অবাধ, নিরঙ্কুশ আর দুর্বার। নতুন করে নয়নতারার সভায় আবার আমি হাজিরা দিতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু কে জানত কুহকিনী ঐ মেয়েটা আমাকে ডাকিনীমন্ত্রে আচ্ছন্ন করে সর্বনাশের শেষ প্রান্তে টেনে নিয়ে চলেছে।

প্রতিদিন যেতাম, আর পুরনো সেই পালাটা ঘুরে ঘুরে অভিনীত হয়ে যেত। রোজ আমার ব্যর্থতা, আমার হতাশা আমাকে একটু একটু করে একটা শীর্ষবিন্দুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

মনে আছে এরই ভেতর মায়ের চিঠি এসেছিল, দিন দশেক পর আমি যেন বিবিবাজারে যাই। বিয়ের তারিখ নাকি স্থির হয়ে গেছে।

চিঠিটা পেয়েছিলাম সকালের দিকে। পাওয়ার পর আমার স্নায়ুতে খানিক ঝাঁকুনি লেগেছিল। সারাটা দিন কেমন যেন উন্মনা হয়ে ছিলাম। তারপর সন্ধ্যাবেলা বিবিবাজার, ঝুলন, মা ইত্যাদি ইত্যাদি সবাইকে ভুলে কখন যে সেই ঝাড়-লণ্ঠন-ওলা হল ঘরে চলে এসেছিলাম, মনে নেই।

এবার নতুন করে নয়নতারার সভায় যেতে যেতে অবশেষে সেই দিনটি এসেছিল। সেদিন প্রতিজ্ঞা করে গিয়াছিলাম, লটারীর বাজি আমাকে জিততেই হবে। একটু আগে আগেই গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, সবার আগে গিয়ে নয়নতারাকে জিজ্ঞেস করব, কেন, আমার নাম ওঠে না। নাম যাতে ওঠে সে জন্য তার কাছে দাবি জানাব।

কিন্তু নয়নতারার বাড়ি পৌঁছে দেখেছিলাম, শিকারী সোমনাথ প্রতিদিনের সেই পরিচিত বেশে বন্দুকটি কাঁধে করে আগেই এসে বসে আছেন। তাঁকে দেখামাত্র

বিদ্বেষে বিতৃষ্ণায় আমার সমস্ত অস্তিত্ব নিমেষে যেন জ্বলে উঠেছিল। মনে হয়েছিল দিনের পর দিন এই লোকটা ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করে আসছে।

সোমনাথ ছাড়া অবশ্য তখনও আর কেউ আসেন নি। নয়নতারাও আসে নি, খুব সম্ভব সে বাড়ির ভেতরেই ছিল। অপরিসীম বিরূপতায় সোমনাথের কাছ থেকে সব চাইতে দূরের সোফাটায় গিয়ে আমি বসেছিলাম।

তখনও ভাল করে সন্ধ্যা হয়নি। সূর্যটাকে অবশ্য আকাশের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তবু শীতের বেলাশেষ মলিন একটু আলো বাইরের গাছপালায় মাখিয়ে রেখেছিল। নানারঙের জরির আঁচলের মত জানালার লালনীল কাচগুলি একটু বা ঝিকমিক করছিল।

আমরা বসে ছিলাম কিন্তু কারো মুখে কথা নেই। দেখতে দেখতে লম্বা পায়ে শীতের দিনান্ত পেরিয়ে ছিমেল সন্ধ্যা নেমে এসেছিল।

ঘরটা আবছা অন্ধকারে ডুবে যেতে শুরু করেছিল। তখনও গোবিন্দ এসে ঝাড়-লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিয়ে যায়নি।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর হঠাৎ সোমনাথ আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'আপনি তো শুনেছি, বেশ ভাল ছাত্র।'

ভদ্রোলোক কী বলতে চান বুঝতে না পেরে আমি তাকিয়েছিলাম। আড়ষ্টভাবে বলেছিলাম, 'ভাল আর কি —'

'তবে বয়েসের এমন বদখেয়াল কেন?'

'বদখেয়াল!'

'ইয়েস।' মুরুব্বির ভঙ্গিতে সোমনাথ বলেছিলেন, লেখাপড়া গোল্লায় দিয়ে মেয়েমানুষের পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন?'

ভদ্রলোক ঠিক কথাই বলেছিলেন। অন্য কেউ তা বললে হয়ত মাথা নীচু করেই থাকতাম। কিন্তু সোমনাথ যেহেতু বলেছেন সেই কারণে হয়ত আমার মধ্যে নিদারুণ এক বিপর্যয় ঘটে থাকবে। রুক্ষ স্বরে বলেছিলাম, 'কেন বেড়াচ্ছি সে কৈফিয়ৎ কি আপনাকে দিতে হবে?'

'অন্য মেয়েমানুষ হলে দিতে হত না। তবে—'

'কী?'

'নয়নতারা বলেই দিতে বলছি।'

'কেন নয়নতারা আপনার কেনা বাঁদী নাকি?'

'কেনা বাঁদী কিনা জানি না। তবে ইচ্ছে করলে ওকে কিনে নেবার ক্ষমতা আমার আছে।'

আমি উত্তর দেইনি।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সোমনাথ বলেছিলেন, 'এখানে না এসে বরং পড়াশোনায় মন দিন গিয়ে। নয়নতারার পেছনে ঘুরে কোন লাভ নেই।

'আপনার উপদেশের প্রয়োজন নেই।' আমি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিলাম, 'লাভ লোকসান আমি বুঝব।'

'না, তা বুঝবার শক্তি আপনার নেই।'

'তাই নাকি?' আমি ভেংচে উঠেছিলাম।

'তাই।' সোমনাথ এবার টেনে টেনে বলেছিলেন, 'এখানে তো আসো, নিজের দিকে কখনও তাকিয়ে দেখেছ ছোকরা?'

সোমনাথের কথাগুলি এবং বলার ভঙ্গি অত্যন্ত অপমানজনক। লক্ষ্য করেছিলাম সম্বোধনটাকে 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নামিয়ে দিয়েছেন তিনি। অসহ্য রাগে আমি কিছু বলতে পারিনি, চোখদুটো শুধু ধিকি ধিকি জ্বলছিল।

'প্রথম যেদিন এসেছিলে সেদিন পরনে ছিল সস্তাদামের বাজে ময়লা জামা-কাপড়। তারপর অবশ্য ভোল পাল্টেছিলে। ভাল ধুতি পাঞ্জাবি পরে মন ভোলাতে চেয়েছিলে। আমার ধারণা ঐ একটা ধুতি, একখানা পাঞ্জাবি আর একজোড়া চটিই তোমার সম্বল। ঐ ক'টা ছাড়া তোমার আর কিছুই নেই। তা ছাড়া যা সব খেলো মাল নয়নতারার জন্যে উপহার আনছ তা দেখে হাসি পায়। ঐ সব উপহার নিয়ে এখানে আসা উচিত নয়, বুঝলে চাঁদ!'

সোমনাথ যা বলেছিলেন তার কোনটাই মিথ্যে নয়। তবু তাঁর স্পর্ধায় আমার সর্বাঙ্গ কাঁপতে শুরু করেছিল। ইচ্ছা হচ্ছিল, উঠে গিয়ে লোকটাকে একটা চড় কশাই। দাঁতে দাঁত ঘষে বলেছিলাম, 'উচিত কি অনুচিত সেটা আমি বুঝব আর নয়নতারা বুঝবে। এ ব্যাপারে আপনার মাথা না ঘামালেও চলবে।'

'বেশ ঘামাব না। তবে কিনা—'

'কী?'

'একটা কথা বলছি। রোজ রোজ যাওয়া-আসাই সার হবে। লটারীতে নামটা আর উঠবে না।'

'আমার তো উঠবে না, তবে কার উঠবে?'

'আমার, যতকাল আসব ততকাল উঠবে।'

'তাই নাকি?'

'ইয়েস—'চোখ নাচিয়ে সোমনাথ বলেছিল, 'আমার মত রোজ রোজ নেকলেস, ঘড়ি যদি দিতে পার তোমারও উঠবে।'

আমার মাথার ভেতর একটা শিরা বোধ হয় সেই মুহূর্তে কট করে ছিঁড়ে গিয়েছিল। আমি প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম, 'শাট আপ, শাট আপ, আমাকে ঘড়ি নেকলেস দেখাচ্ছ মর্কট!'

সোমনাথও লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁর চোয়াল যে শক্ত হয়ে উঠেছে, অন্ধকারেও তা বুঝতে পারছিল ম। চোখদুটো যেন দু-টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গার। চাপা গলায় তিনি গর্জন করেছিলেন, 'কী বললি সোয়াইন।'

'কী আবার বলব!' সেই মুহূর্তে আমার মাথার ঠিক ছিল না। চিৎকার করে বলেছিলাম, 'মনে রেখ, তোমার মত জানোয়ারের নাম আর যাতে না ওঠে তার ব্যবস্থা করব।'

'এত বড় সাহস তোর! একটা রাস্তার কুকুর, ভিখিরি! আমাকে জানোয়ার বলিস, মর্কট বলিস! লটারীতে তুই নিজের নাম তুলবি! আই উইল শুট ইউ, কিল ইউ লাইক এ ডগ—'বলেই কাঁধের সেই ঝোলানো বন্দুকটা হাতে তুলে নিয়ে আমাকে তাক করেছিলেন সোমনাথ।

পলকের জন্য আমার মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে ঠাণ্ডা বরফের স্রোত নেমে গিয়েছিল। একটুক্ষণ থমকে ছিলাম। তারপরেই সব নিষ্ক্রিয়তা বিলীন হয়ে শিরায় শিরায় দুরন্ত বেগে আগুনের ঢল নেমে গিয়েছিল বুঝি। লাফ দিয়ে সোমনাথের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম।

সেদিন কোথা থেকে যেন অলৌকিক শক্তি আমার ওপর ভর করেছিল, সেই সঙ্গে নিদারুণ দুঃসাহসও। ঝাঁপিয়ে পড়ে সোমনাথের বন্দুকটা আমি ধরতে পেরেছিলাম। সেটা ধরে দু'জনে কিছুক্ষণ টানাটানি ধস্তাধস্তি চলেছিল। তার পরেই দুম করে গুলি ছোটার আওয়াজ, সঙ্গে সঙ্গে প্রাণফাটানো একটা চিৎকার। আমার চোখের সামনে সোমনাথ মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছিলেন। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে ঘর ভেসে যেতে শুরু করেছিল।

এরপর কিছুক্ষণ আমার দেহ অনুভূতিশূন্য হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত শক্তি কেউ বুঝি নিঃশেষে শুষে চেতনাহীন শরীরটাকে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। কী করেছি, আমার চোখের সামনে কী ঘটে গেছে, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। বিমূঢ়ের মত, বিহ্বলের মত, অভিভূতের মত আমি শুধু রক্তের স্রোতে ভাসমান একটি মানুষকে দেখেছিলাম।

বিহ্বলতা খানিক কাটলে প্রথম যে কথাটা আমার স্নায়ুতে আঘাত হেনেছিল তার নাম পালানো। হ্যাঁ, পালাতে হবে, এই মুহূর্তে এখান থেকে অদৃশ্য হতে হবে। কথাটা মনে আসা মাত্র আর অপেক্ষা করিনি, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করেছিলাম।

ছুটতে ছুটতে কখন স্টেশনে চলে এসেছিলাম, কখন বিবিবাজারের ট্রেন ধরে বাড়ি পৌঁছেছিলাম, এতকাল পর আর মনে করতে পারি না।

শুধু মনে আছে, আচ্ছন্নের মত টলতে টলতে বাড়ি পৌঁছলে মা বলেছিলেন, 'আজ এসে ভালই করেছিস। পরশুদিন বিয়ে, কাল কিছু কেনাকাটা করতে হবে।' মা খুব সম্ভব আমার মুখচোখ বা চেহারার দিকে লক্ষ্য করেন নি। করলে কথাগুলো বলতেন কিনা সন্দেহ।

আমি কী উত্তর দিয়েছিলাম, মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে, মায়ের চোখ এড়িয়ে ভাইবোনদের দৃষ্টি থেকে নিজেকে সরিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিছানায় আশ্রয় নিয়েছিলাম।

বাইশ

পরের দিনটা কিভাবে কেটেছিল, এতকাল পর আর মনে করতে পারি না। স্মৃতির এই জায়গাটা আবার ঝাপসা হয়ে গেছে।

তারপরের দিন বিয়ে। নয়নতারাদের সেই হল ঘর থেকে পালিয়ে আসার পর আমি বোধ হয় সজ্ঞানে কিছু করিনি। যেভাবে আমাকে চালানো হয়েছিল সে-ভাবেই চলেছিলাম, যা বলানো হয়েছিল তা-ই বলেছিলাম। বিচিত্র আচ্ছন্নতার ভেতর বিয়েটা চুকে গিয়েছিল।

বিয়ের পরদিন ঝুলনকে নিয়ে আমাদের বাড়ি এসেছিলাম। ঠিক হয়েছিল বৌভাতের পর ঝুলন তার বাপের বাড়ি চলে যাবে। আমার পড়াশোনার পালা চুকলে এবং চাকরি বাকরি হলে সে স্থায়ীভাবে এ বাড়িতে এসে থাকবে।

মা বধূবরণ করে সবে ঝুলনকে ঘরে তুলছেন, সেই সময় ঘটনাটা ঘটেছিল রক্তের দাগ শুঁকে শুঁকে যেভাবে শ্বাপদ আসে সেভাবে পুলিস এসেছিল।

এসেই আমার খোঁজ করেছিল, 'চিরন্তন গাঙ্গুলী কে ?'

আমার সমস্ত অস্তিত্ব দুলে উঠেছিল। অসহ্য কাঁপা গলায় বলেছিলাম, 'আমি কেন বলুন তো ?'

'আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে।'

আমি আর কিছুই বলতে পারিনি। হাত-পা-সমস্ত শরীর থরথর করছিল সেই থরথরানির বেগ কিছুতেই থামাতে পারছিলাম না। আর ছুটেছিল ঘাম, বিয়ের নতুন জামাকাপড় ভিজে সপসপে হয়ে গিয়েছিল। হৃৎপিণ্ড তখন আমার অসাড়, স্তব্ধ। সমস্ত ইন্দ্রিয় বোবা হয়ে গিয়েছিল। শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়েছিল।

সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তটিতেই আমার মৃত্যু ঘটে গিয়েছিল বুঝি। তার পরেও যে দীর্ঘদিন বেঁচে আছি তা যেন মানুষের বাঁচা নয়। জীবন এবং মৃত্যুর মাঝামাঝি সেটা নিদারুণ এক প্রেতের জীবন।

ও বাড়ি থেকে টীকু ঝুলনের সঙ্গে এসেছিল। সে ছুটে গিয়েছিল পুলিশের দিকে, 'কী—কী ব্যাপার? ওয়ারেন্ট কিসের জন্যে?'

পুলিশ জানিয়েছিল, চিরন্তন গাঙ্গুলীকে এ্যারেস্ট করার জন্যে।'

'এ্যারেস্ট। কেন? কী করেছে ও?'

'ওঁর বিরুদ্ধে মার্ডার চার্জ আছে।'

মনে আছে সেই মুহূর্তে বরণ পিঁড়ি থেকে টলে পড়ে গিয়েছিল ঝুলন। পড়েই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। মায়ের হাত থেকে বরণকুলোটা ছিটকে গিয়ে চাল ছড়িয়ে পড়েছিল। মাটির সরা এবং প্রদীপগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। মা চিৎকার করে উঠেছিলেন, 'কী—কী বলছেন আপনারা?'

মোটা স্বরহীন গলায় পুলিশ বলেছিল, 'ঠিকই বলছি।' বলেই এগিয়ে এসে আমার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছিল।

মা এবার উঠোনে আছাড় খেয়ে পড়েছিলেন। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কেঁদেছিলেন, 'এ কি সর্বনাশ করলি বকু! তুই ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই।'

ভাইবোনগুলোও সমস্বরে কান্না জুড়ে দিয়েছিল।

আর সেই কান্নাকাটির ভেতর পুলিশ আমাকে নিয়ে থানায় চলে গিয়েছিল।

হত্যাপরাধের অভিযুক্ত আসামী আমি। পুলিশ থেকে আমাকে জামিন দেওয়া হয়নি। আমার জামিনের জন্য কেউ আবেদনও করেনি, না আমার মা, না ঝুলনের বাবা।

মনে পড়ে হাজত খাটার পর কেস শুরু হয়েছিল। প্রথমে কেসটার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছিল ছোট আদালতে, পরে সেটা গিয়েছিল সেসনস্ জজের কোর্টে।

আমার ডিফেন্সের জন্য কোন উকিল ছিল না। উকিলের ব্যবস্থা কে-ই বা করবে। উকিলের জন্য আমি লালায়িত ছিলাম না। আমি চাইছিলাম, মৃত্যু আসুক। ফাঁসির দড়িই আমার যোগ্য শাস্তি। জীবনের অবসানটা যত তাড়াতাড়ি আসে ততই মঙ্গল। তা-ই একান্ত কাম্য।

চার মাস ধরে দুই আদালতে কেস চলেছিল। তাতে সাক্ষী দিয়েছিল অনেকেই। নয়নতারা, নয়নতারার মা, কবি পরিজাতকুসুম, অধ্যাপক মল্লিক এবং নয়নতারার সভার অন্যান্যরা। পাবলিক প্রসিকিউটর তাঁদের কী জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী উত্তর তাঁরা দিয়েছিলেন, কিছুই মনে নেই। কিছুই যেন আমার মনে রেখাপাত করে নি।

যে চার মাস ধরে কেস চলেছিল সে সময় ভাইবোনেরা, মা অথবা ঝুলনের বাবা-মা, কেউ কোর্টে আসতেন না। আমার বিরুদ্ধে মার্ডার চার্জের কথা শুনেই ঝুলন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞান ফেরার পরই নাকি তার বাবা এসে তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। মায়ের বধূবরণ আর হয়নি।

কিন্তু না, কেউ কোর্টে আসেনি—এ কথা ঠিক নয়। একদিন মা এসেছিলেন, আরেক দিন এসেছিল হীরু।

কাঠগড়ার সামনে দাঁড়িয়ে অনুচ্চ চাপা গলায় মা বলেছিলেন, 'তুই মর।'

মনে আছে মা-ই আমার নাম দিয়েছিলেন 'চিরন্তন।' নামটার ভেতর অমরত্বের আশীর্বাদ ছিল। জন্মের কুড়ি একুশ বছর পর নিজের আশীর্বাদ ফিরিয়ে নিয়ে মা বলে গিয়েছিলেন, 'তুই মর।'

হীরু এসে বলেছিল, 'বিশ্বাস করেছিলাম, তার মর্যাদা খুব রেখেছ। ঝুলনের সঙ্গে তোমার বিয়ে আমরা মানি না। অন্য জায়গায় আমরা ওর বিয়ে দেব।'

শুনানী এবং সাক্ষীদের জেরার পর জজ সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, স্বপক্ষে কিছু বলবার আছে কিনা। মাথা নেড়ে জানিয়েছিলাম, নেই।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। জুরীদের বিচক্ষণ মতামত নিয়ে জজ সাহেব আমাকে আট বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিলেন।

রায় বেরুবার পর একটা কালো গাড়িতে করে আমাকে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের ঐ জেলার জেলখানায় নয়, সুদূর বীরভূমের সদর জেলে।

তৃতীয় তরঙ্গ

আমি এখানে আসার পর দেখতে দেখতে আটটি বছর কেটে গিয়েছিল। এখানে বলতে বীরভূম জেলার সদর জেলের এই পিঞ্জরটিতে।

আমি খুনের আসামী, আমার হাত মানুষের রক্তে কলঙ্কিত।

মানুষের ইতিহাসে যত দুষ্কৃতি আছে তার মধ্যে হত্যাই বুঝি সব চাইতে নিকৃষ্ট। জঘন্যতম। হত্যার অপরাধে আট বছরের কারাদণ্ড ভোগ করতে একদিন আমি সদর জেলে এসেছিলাম।

কথা বুঝিবা ঠিক হল না। এমন অনেক হত্যা আছে জীবনকে যা গৌরবান্বিত করে, যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু ধ্বংস ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু একটি স্বৈরিণীর জন্য হত্যা, জগতে সে অপরাধের তুলনা নেই।

আট বছর অর্থাৎ একটা যুগের দুই তৃতীয়াংশ। দীর্ঘ মেয়াদের সব ক টি বছরই কেটে গিয়েছিল। আর মাত্র কয়েকটি ঘণ্টা। তারপরেই কারাগারের বাইরে অসীম মুক্তির মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতে পারব। কিন্তু মুক্তির জন্য আমি কি খুব লালায়িত ছিলাম? সেদিন বুঝতে পারিনি!

আমার হাত দিয়ে যে অপরাধ ঘটে গেছে তার যোগ্যতম দণ্ড ছিল মৃত্যু। মৃত্যুই ছিল আমার কাছে সব চাইতে বাঞ্ছিত, প্রার্থিত—পরম কাম্য বস্তু। ফাঁসির দড়িতে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটুক—তা-ই আমি চেয়েছিলাম। কিন্তু ন্যায়ের বিচারক আমার বয়সের কথা ভেবেছেন, আমি যে স্বভাব-অপরাধী নই তা চিন্তা করেছেন। এবং সব দিক বিবেচনা করে অপেক্ষাকৃত লঘু শাস্তিরই ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর হয়ত বিশ্বাস মুক্তির পর আমার চরিত্রের সংশোধন হয়ে যাবে, সৎ এবং সুস্থভাবে আবার আমি জীবন যাপন করতে পারব। কিন্তু আমাদের যে সমাজ তাতে কারাদণ্ডভোগী একটি মানুষের পক্ষে মর্যাদার জীবনে নতুন করে ফিরে আসা কি সম্ভব?

কারাবাসের মেয়াদ ফুরোবার পর সেদিন আমার বয়স আটাশ। আট বছর আগে যেদিন সদর জেলে এসেছিলাম ধারাপাতের নিয়মে তখন কুড়ির দেউড়িতে পা রেখেছি।

আমার যা জীবন তাতে জেলখানায় পৌঁছুবার কথা কোনদিন ভাবাও চলত না। জন্মের পর থার্ড ইয়ারে পড়া পর্যন্ত প্রায় কুড়িটা বছর যে পথে চলেছি তার শেষ প্রান্তে অথবা দু-ধারে, কোথাও কারাগার বলে কিছু থাকার কথা ছিল না। ঐ শব্দটা ছিল আমার কাছে অপরিচিত, অজানা কোন গ্রহান্তরের ভাষা। তবু আমাকে কারাগারেই আসতে হয়েছিল। কে জানত, সদর জেলের ঐ ঠিকানাটাই শেষ পর্যন্ত আমার সব কিছুর ওপর যবনিকা টেনে দেবে!

সদর জেলের জীবনটার কথাই বলা যাক। এখানে আসার পর প্রথম প্রথম

আমাকে ঘানি টানতে পাথর ভাঙতে দেওয়া হয়েছিল। খুনী অপরাধীদের জন্য যে সব শারীরিক পরিশ্রমের বিধান আছে তার কোনটা থেকেই আমাকে বঞ্চিত করা হয়নি। সারাদিন খাটুনির পর ক্লান্তিতে অবসাদে আচ্ছন্ন বোধ করতাম, মনে হ'ত সমস্ত শরীর অনুভূতিশূন্য হয়ে গেছে। খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় গা এলিয়ে দিলেই টের পেতাম চেতনাটা অতি দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ঘুমটা যে কোনদিন ভাঙবে এমন সম্ভাবনা আর থাকত না।

তবু পরের দিন ভোরে ওয়ার্ডারের চিৎকারে ঘুম ভেঙে যেত। শরীরের অবশিষ্ট শক্তিটুকু একত্র করে পাথর ভাঙতে অথবা অন্য কিছু করতে বেরিয়ে পড়তাম।

এমন অমানুষিক পরিশ্রম আগে আর কখনও করিনি কিন্তু প্রতিবাদ করবার উপায়ও ছিল না। আমার মত ঘৃণ্যতম অপরাধীর মুখে প্রতিবাদ সাজে না।

মনে আছে, মাসখানেক যেতে না যেতেই জেল-কর্তৃপক্ষ হঠাৎ আমার ওপর সদয় হয়েছিলেন। আমার সমগোত্রীয় যে সব অপরাধী ছিল তাদের কাছ থেকে সরিয়ে আমাকে লেখাপড়ার কাজ দেওয়া হয়েছিল। লেখাপড়া বলতে কয়েদীরা প্রতিদিন কে কী কাজ করছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিখে রাখা। আমার অপরাধের তুলনায় এ প্রায় স্বর্গসুখ। কর্তৃপক্ষের মহানুভবতার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

মাঝে মাঝে জেলার সাহেব আমাদের অর্থাৎ কারাদণ্ডভোগী জীবগুলিকে দেখতে আসতেন। আমার প্রতি তাঁর অসীম করুণা। অনেক বার তিনি আমাকে পড়াশোনা শুরু করতে বলেছেন। বুঝিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পরীক্ষাগুলি আমার দেওয়া হয়নি সেগুলো একে একে দিয়ে দেওয়া উচিত। ভবিষ্যতের পক্ষে তা প্রয়োজন। সরকারী চাকরি হয়ত হবে না কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা ঐ সনদগুলোর জোরে কিছু করে খেতে পারব। আমি যদি পড়ি তিনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

প্রথম থেকেই জেলার সাহেবের মমতা এবং সহানুভূতি অনুভব করে এসেছি। তিনি যখন বোঝাতেন, সান্ত্বনা দিতেন, অভিভূত হয়ে পড়তাম। কিন্তু কিছুই আমার ভাল লাগত না। নতুন করে যে লেখাপড়া শুরু করব তেমন উদ্যম বা উৎসাহ কোনটাই আমার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না। আমার জীবনীশক্তির সবটুকুই নির্জীব, স্তিমিত এবং বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কারাগারের বাইরে একদা আমার যা জীবন ছিল কারাগারে বসে সেখানে ফিরে যাওয়া অসম্ভব।

একদা নিজেকে নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন ছিল, সেদিন আত্মবিলাসই ছিল একমাত্র ব্যসন। শিক্ষায়, ব্যবহারে এবং ছাত্রজীবনের অপরিমিত সাফল্যে নিজেকে সবার সামনে বরণীয় করে তোলাই ছিল আমার একমাত্র লক্ষ্য। নিজেকে বড় করব, মহৎ করব, সবার আদর্শ হব— অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মত আমার দৃষ্টি ছিল

জীবনের সেই উঁচু চূড়াটিতে।

কিন্তু কে জানত শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছতে পারব না, দু-তিন সিঁড়ি উঠেই আমাকে রসাতলে নেমে আসতে হবে! সে যাই হোক, জেলখানার জীবনটা ফানুসের মত ফেটে গেছে। সে সম্বন্ধে আমার আর বুঝি মোহ ছিল না। কিংবা জগতের সব কিছুই সম্ভবত আমার কাছে বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল। তীব্র-তিক্ত-উগ্র-কষায়, শরীরে এবং মনে যত অনুভূতি আছে তার কোনটাই ঠিকমত অনুভব করতে পারতাম না। অস্তিত্ব তার আস্বাদনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল, আমার হৃৎপিণ্ড একটানা কয়েক বছরের কারাবাসে এতই নির্জীব হয়ে গিয়েছিল যে সেখানে কোন তরঙ্গ উঠত না, হাজার আঘাতে তার তারে ঝঙ্কার বাজত না।

কাজেই একদিন নিজেকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিলাম তার বিন্দুমাত্রও আমার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না। কাজেই জেলে যাবার আগের জীবনে আর প্রয়োজন বোধ করতাম না।

জেলার সাহেব যখন সদয় স্বরে পড়াশোনার কথা বলতেন তখন চুপ করে থাকতাম। কখনও বা সবিনয়ে প্রত্যাখান করতাম। বুঝতাম, তিনি দুঃখ পেতেন, আমার জন্য বেদনা অনুভব করতেন কিন্তু আমি নিরুপায়। কি করে তাঁকে বোঝাব জগতের কোন কিছুর প্রতি আমার আর আকর্ষণ নেই। উজ্জ্বল ছাত্র জীবন, সকলের শ্রদ্ধা, মর্যাদা, সম্মান, সামাজিক প্রতিষ্ঠা—মানুষের ক্ষুদ্র জীবনে যা যা কাম্য সেগুলোর দাম আমার কাছে কানাকড়িও নয়। একদিন এ সবই অমূল্য নিধি বলে মাথায় তুলে নিয়েছিলাম, জেলে ঢোকার পর এগুলোকে অচল পয়সার মত পথের ধুলোয় ছুঁড়ে দিয়েছি।

আমার স্বপ্ন, আত্মবিলাস, আদর্শ—সব কিছু ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। পিছুটান আমার আর ছিল না, পেছন ফেরার ইচ্ছাও বুঝি না।

উঁচু উঁচু আকাশস্পর্শী দেওয়ালের আড়ালে আটটা বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে ভাইবোনেরা, আমার প্রাণের বন্ধু হীরু, ঝুলন, এমন কি যার জন্য আত্মবিস্মৃত হয়ে হত্যা পর্যন্ত করেছি সেই নয়নতারা—বাইরের পৃথিবী থেকে কেউ, কেউ আমাকে চোখের দেখাটা পর্যন্ত দেখতে আসেনি। মা-ই শুধু একদিন এসেছিলেন। মাত্র একটা দিন। এই আট বছরের মধ্যে মাকে ছাড়া বাইরের কাউকে দেখিনি।

কিন্তু সদর জেলের গরাদের ওপারে দাঁড়িয়ে মা বলে গিয়েছিলেন, 'তুই মর, মর।' আদালতে এসেও একদিন ঐ একই কথা বলে গিয়েছিলেন তিনি।

আমি হেসেছিলাম, 'তোমার যোগ্য আশীর্বাদই করেছ মা। আমাকে এ অবস্থায় দেখে তুমি যদি ভেঙে পড়তে আমার পক্ষে তা যে কত বড় গ্লানি হয়ে দাঁড়াত

পর শীত কিন্তু আমার প্রাণে ঋতুবদল নেই। সেখানে একটাই ঋতু, একটাই মাস। প্রতিটি দিন অন্য আরেকটি দিনের পুনরাবৃত্তি মাত্র। স্বাদে-গন্ধে বৈচিত্র্যে একটি দিনের সঙ্গে অন্য একটি দিনের বিন্দুমাত্র পার্থক্য ছিল না। সব দিনই আমার কাছে এক ছাঁচে ঢালাই করা।

আমার জীবনে বর্ষা নেই, শরৎ নেই, বসন্ত নেই। যে একটি ঋতু আমার সমস্ত কিছুর ওপর ব্যাপ্ত হয়ে ছিল তাকে বিষাদের ঋতু বলা যেতে পারে। অসীম বিষণ্ণতা সর্বক্ষণ আমাকে ঘিরে থাকত।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে জেলখানার ঐ আকাশটা কখন যে বায়োস্কোপের পর্দা হয়ে যেত, টের পেতাম না। কখন যে ওখানে দৃশ্যপট বদলে যেতে থাকত, কে বলবে।

মনে মনে প্রতিদিনই তো প্রতিজ্ঞা করতাম, অতীতকে স্মরণ করব না, পেছন ফিরে তাকাব না। তবু কি আশ্চর্য, একটু নিরালা হলেই আকাশের ঐ সুদূর পটে আমার বাবার মুখ ভেসে উঠত। মা ভাইবোন-দাদু-দিদিমা-হীরু-ঝুলন, হীরুর মা-বাবা নয়নতারা, তার মা, আমাদের ছোট্ট নগণ্য বিবিবাজার, ডিস্ট্রিক্ট টাউন ইত্যাদি ইত্যাদি মিছিল করে যেন চলে যেত। কারাগারে আসার আগে আমার কুড়ি বছরের জীবনটাকে প্রতিদিন একবার করে আমি দেখতে পেতাম। হাজার দৃশ্যপটে অতীত যখন সামনে এসে দাঁড়াত তখন হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে যেত, ধমনীতে রক্ত ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকত। ইচ্ছা হত আত্মহত্যা করি।

আমার মা-ও আত্মহত্যার নির্দেশই দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পারিনি, পারিনি। পাটের শক্ত মোটা একটা দড়ি সংগ্রহ করে সবার অগোচরে একদিন গলায় পরে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করার মহড়া দিয়েছিলাম। পরক্ষণেই নিদারুণ আতঙ্কে তা খুলে ফেলেছি। তবে কি মুখে বললেও মৃত্যু আমার বাঞ্ছিত ছিল না? জীবন কি আমার কাছে তার সম্মোহনী শক্তি হারায় নি?

গলায় দড়িটা পরার সময় একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটেছিল। বাবা-মা-দাদু-দিদিমা ঝুলন, সবাইকে মনে করতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কারো মুখই দেখতে পাচ্ছিলাম না। সব কেমন যেন ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। শুধু একজনই স্পষ্ট রেখায় আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। সে নয়নতারা। নয়নতারার ঠোঁট দুটি ছিল টেপা, চোখের তারায় রহস্যময় মদির হাসি ছলকাচ্ছিল। দেখতে দেখতে আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এসেছিল, সর্বাঙ্গে ঘামের স্রোত নেমেছিল।

তবে কি নয়নতারার জন্যই আমি মরতে পারছিলাম না? জেল থেকে বেরিয়ে নতুন করে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াবার স্বপ্ন ছিল কি প্রাণের কোথাও?

প্রতিদিন অতীতটা সামনে এসে যেন ফিসফিসিয়ে বলে যেত কতখানি

জঘন্য দুষ্কৃতি আমি করেছি। কুড়ি বছরের সেই জীবনটা আমার কাছে দুঃসহ পাষাণভারের মত মনে হত। আমি তাকে ভুলতে চাইতাম, ভুলতে চাইতাম।

দিবারাত্রি প্রতিনিয়ত আমি জপ করতাম—ভুলব, ভুলব। স্মৃতি থেকে কুড়িটা বছর মুছে দেব। হে বিস্মৃতির ঈশ্বর, আমার প্রতি সদয় হও। আমাকে সব ভুলিয়ে মুক্তি দাও কিন্তু নিষ্কৃতি মিলত না। আমার স্মৃতি প্রতিদিন মন্ত্র পড়ে অতীতটাকে জাগিয়ে তুলত, তারপর সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিত। সদর জেল আমাকে কতটুকু শাস্তিই বা দিতে পেরেছে! আমার অনুমান, খুব বেশি নয়। কুড়ি বছরের সেই জীবনটা রোজ একবার করে যে মৃত্যু যে গ্লানি বহন করে আনত তার তুলনা নেই।

আমি তো সব কিছুই ভুলতে চেয়েছি। সত্যই কি চেয়েছি? বিস্মরণের তালিকায় নয়নতারার মুখটাও চলে যাক, তাই কি আমার কাম্য ছিল? বোধ হয় না। যে রমণী আমার হাত রক্তে কলঙ্কিত করেছে, আমাকে দিয়ে একটি হত্যার অপরাধ ঘটিয়েছে তা ভুলে যাওয়া এত সহজ নয়।

আমার মনে হত, মা-ভাইবোন-ঝুলন-হীরু—কেউ না আসুক, যদি একবার নয়নতারা আমার সঙ্গে জেলখানায় দেখা করতে আসত, কারাবাস অনেক সহনীয় হতে পারত। নিজের মন সেদিন পুরোপুরি বুঝতে পারতাম না। আধোগোপন চেতনা যেন ফিসফিসিয়ে জানিয়ে দিত নয়নতারা এলে আটটা বছর খুব একটা দীর্ঘ আর ক্লান্তিকর লাগত না, নিমেষে তা কেটে যেত।

আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব—জগতের সবার কাছ থেকেই নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু নয়নতারা? তাকেও কি সকলের সঙ্গে একাকার করে ফেলেছিলাম? ফেলতেই যদি চাইতাম হৃৎপিণ্ডের অশ্রান্ত উত্থান-পতনে ঐ নামটাই কেন বেজে যায়?

নয়নতারা! নয়নতারা! নয়নতারা!

আট বছর পর মুক্তির ঠিক কিছুক্ষণ আগে আমার মনে হয়েছিল, হয়ত একদিন সবাইকে ভুলে যাব কিন্তু অস্তিত্বের গহন কেন্দ্রে যে মোহময়ী অপার রহস্য নিয়ে বসে আছে জলের লেখার মত তাকে মুছে দেওয়া কি সম্ভব?

দুই

অনেক—অনেক দূরে আকাশ যেখানে ধনুরেখায় নেমে গেছে সেটা বীরভূম জেলার সীমান্ত। সূর্যটা খানিক আগে তার ওপারে অদৃশ্য হয়েছিল। আকাশের সীমানা থেকে এত তাড়াতাড়ি তার বিদায় নেবার কথা নয়, তবু নিয়েছিল।

সময়টা শীতের শেষাশেষি। নিয়ম অনুযায়ী সূর্যটা অনায়াসেই আরো কিছুক্ষণ অনায়াসেই থেকে যেতে পারত।

সূর্য নেই। তবু পশ্চিমের ভাসমান মেঘে দিনান্তের বিষণ্ণ একটু রক্তাভা লেগে ছিল। দূরে বীরভূমের সীমান্ত ক্রমশ ছায়াচ্ছন্ন হয়ে আসছিল।

চারিদিক যখন আসন্ন সন্ধ্যার জন্য উন্মুখ সেই সময় ডিস্ট্রিক্ট জেলের লোহার বিশাল ফটকটা ঘড ঘড শব্দে খুলে গিয়েছিল। তার গম্ভীর ধাতব রেশ অনেকক্ষণ বাতাসে মিশে ছিল।

কত কাল?

একটা জন্মান্তরই বুঝি। তবু নির্ভুল মনে করতে পেরেছিলাম—উনিশ শ বাইশ থেকে তিরিশ, মোট আটটা বছর। না, স্মৃতিশক্তি এখনও অটুট আছে।

আটটা বছর—একটা যুগের দুই তৃতীয়াংশ। আট বছর নয়, আমার মনে হয়েছিল, কয়েক শতাব্দী।

শিথিল কাঁপা পায়ে গেটের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল যেন।

সদর জেলটা শহর থেকে অনেকখানি দূরে, বিশাল প্রান্তরের মাঝখানে। সামনের দিকে মসৃণ পীচের রাস্তা ঊর্ধ্বশ্বাসে জেলা শহরের দিকে ছুটে গেছে। রাস্তাটার ওপারে যতদূর চোখ যায়, শুধু মাঠ, মাঠ আর মাঠ। রুক্ষ, রক্তাভ, কর্কশ মাটির কোথাও এক আধটা বাবলা, কোথাও হলুদ রঙের নির্জীব ঘাস, কোথাও ইতস্তত কন্টিকারি। মাটি সেখানে প্রসূতি না, মৃতবৎসা।

মাথার ওপর শীতের অবাধ নীলাকাশ—একেবারে দিগন্ত পর্যন্ত টানা। যে দিকেই চোখ ফেরানো যাক, বাধাবন্ধহীন অফুরন্ত বিস্তার। আট বছর পর পেছনের প্রাচীরে ঘেরা পিঞ্জরটা থেকে বেরিয়ে চারিদিকের অনন্ত মুক্তিকে সহ্য করতে পারছিলাম না। শীতের আকাশে কতটুকুই বা আলো ছিল! তবু দৃষ্টি ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। চোখ আপনা থেকেই বুজে এসেছিল।

আবার যখন চোখ মেলেছিলাম, পেছনের গেটটা আগের মতই গম্ভীর ধাতব শব্দ করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। আর সামনের দিকে একটা ন্যাড়া পিপুল গাছের তলায় অস্পষ্ট রেখায় একটি মেয়ের চেহারা যেন ফুটে বেরিয়েছিল।

আশে পাশে কেউ কোথাও নেই। বিশাল প্রান্তরের নির্জন পটভূমিতে মেয়েটাকে প্রথমটা অবিশ্বাস্যই মনে হয়েছিল। কতক্ষণ নিষ্পলকে তাকিয়ে ছিলাম, মনে পড়ে না। তাকিয়ে থাকতে থাকতে অস্পষ্টতা কেটে গিয়েছিল। আট বছর পরেও তাকে চিনতে পেরেছিলাম—ঝুলন।

চেনার সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃৎপিণ্ডে দুর্বার বেগে ঝড়ের মত, নাকি তাঁর চাইতেও বেগবান অন্য কিছুর মত, কি যেন বয়ে গিয়েছিল। সমস্ত চেতনা নিজের অজ্ঞাতসারে এক অথৈ গভীরে ক্রমশ নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছিল। আর সময় তার গতি হারিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কি এক অলৌকিক ইঙ্গিতে চরাচারের সব কিছু স্তব্ধ অনড় হয়ে গিয়েছিল।

মুক্তির সেই দিনটিতে কেউ যে আমাকে নিতে আসবে না, সে কথা জানতাম। মা-ভাইবোনেরা, হীরু এবং তার মা-বাবা—সবাই যে আমার ওপর বিমুখ, চিরকালের মত তাঁরা যে আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, আমার চাইতে তা আর কে ভাল জানত।

আশ্চর্য, জগতে সব চাইতে বেশি যার ঘৃণা করার কথা সেই ঝুলন কিনা এত-দূরে এসে পিপুল গাছটির তলায় আমার মুক্তির জন্য অপেক্ষা করছিল!

এদিকে পশ্চিম দিগন্তের সেই রক্তাভাটুকু আর ছিল না। লম্বা পায়ে শীতশেষের সন্ধ্যা নেমে এসেছিল। আর কে যেন গাঢ় বিষাদের একটি লম্বা ছায়াকে আকাশের ওপার থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিল।

আকাশে-বাতাসে শীতের সন্ধ্যা দ্রুত সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছিল। সেদিকে আমার লক্ষ্য ছিল না। ঘোরের মধ্যে মত কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম, খেয়াল নেই।

একসময় মৃদু কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলাম, 'আমি এসেছি।'

স্নায়ুগুলোতে তীব্র ধাক্কা লেগেছিল বুঝি। চকিত হয়ে মুখ তুলেছিলাম। পিপুল গাছের তলা থেকে কখন যে ঝুলন পায়ে পায়ে নিঃশব্দে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল বুঝতে পারেনি। বুকের ভেতর শ্বাসটা আটকে ছিল। ধীরে ধীরে সেটাকে মুক্তি দিয়ে অবরুদ্ধ গলায় বলেছিলাম, 'তুমি!'

'হ্যাঁ, আমি। আমি ছাড়া আর কে এ সময় আসতে পারে বল।'

উত্তর দিইনি। পলকহীন ঝুলনের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। বয়সের কিছু ভার পড়া ছাড়া প্রায় আট বছর আগের মতই তাকে দেখাচ্ছিল। তবে কিছু গাম্ভীর্য এসেছিল চোখে মুখে, সর্বাঙ্গ ঘিরে একটা ব্যক্তিত্বও অনুভব করতে পারছিলাম। তবে সব চাইতে যে পরিবর্তনটা বিশেষভাবে চোখে পড়ছিল তা হল ঝুলনের সাজসজ্জা। সোমেশবাবুর শৌখিন আদুরে মেয়ের পরনে সেদিন লাল পাড় মিলের শাড়ি আর হাতায় সুতোর কাজকরা সাদা ব্লাউজ। পায়ে সস্তা একজোড়া চটি। হাতে দু-গাছি করে চুড়ি, গলায় সরু একছড়া গোট হার। কপালে আর সিঁথিতে ডগডগে সিঁদুর। প্রায় নিরলঙ্কারা ঝুলনকে ঐ রূপে ঐ বেশে মহিমময়ী মনে হচ্ছিল।

সিঁথিতে-কপালে সিঁদুর দেখে চমকে গিয়েছিলাম। তবে কি অন্য কোথাও

ঝুলনের বিয়ে হয়ে গেছে? আদালতে এসে তেমন ইঙ্গিতই তো দিয়ে গিয়েছিল হীরু, আবার তারা ঝুলনের বিয়ে দেবে। একদিন আমি তো তার সিঁথিতে সিঁদুর এঁকে দিয়েছিলাম। সে রেখা মুছে অন্য কেউ কি নতুন করে তার সিঁথি চিত্রিত করেছে? যদি করেই থাকে, সে কে যার সিঁদুর ঝুলন বহন করছে?

ঝুলন আবার বলেছিল, 'আট বছর ধরে একটা একটা করে দিন গুনেছি। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, আজ তোমাকে মুক্তি দেওয়া হবে। সেই দুপুর থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছি।'

আমি চকিত হয়ে উঠেছিলাম। কেস চলার সময় ঝুলন আদালতে আসে নি, জেলখানায় এসে আট বছরে একবারও দেখা করে যায়নি, একটা চিঠি পর্যন্ত লেখেনি কোনদিন, অথচ কবে আমি ছাড়া পাব আড়ালে থেকে সে খবরটি ঠিক রেখেছে। তা কি মুক্তির মুহূর্তে এভাবে আমাকে হকচকিয়ে দেবার জন্য?

বলেছিলাম, 'কিন্তু—'

'কী?' উন্মুখ হয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল ঝুলন।

'কেন এলে তুমি? কেন এলে?'

'আমি না এলে কে তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে? একদিন সিঁথিতে সিঁদুরের দাগ এঁকে দিয়ে এসেছিলে। তার মর্যাদা রাখতে হলে আমারই তো আসা উচিত।'

'আমার সত্তার ভেতর প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত কিছু একটা শুরু হয়েছিল। ঝন ঝন করে প্রবল শব্দ তুলে কি যেন অবিরাম ভেঙে যাচ্ছিল। আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম, 'কী বললে, 'কী বললে।'

'আমি তোমার স্ত্রী।' শান্ত গলায় ঝুলন বলেছিল, 'স্ত্রীর কর্তব্য করতে এখানে এসেছি।'

আচ্ছন্নের মত বলেছিলাম, 'কিন্তু—'

'বল—'

'হীরু যে এক দিন আদালতে এসে বলে গিয়েছিল তোমার-আমার বিয়ে—'এই পর্যন্ত বলে থমকে গিয়েছিলাম। কেউ বুঝি ভেতর থেকে সবলে দৃঢ় মুঠিতে আমার কণ্ঠস্বর চেপে ধরেছিল।

ঝুলন বলেছিল, 'দাদা কী বলেছিল, জানি। কিন্তু আমি তো তোমাকে বলিনি, এ বিয়ে অস্বীকার করছি।'

'তবু—'

'না-না, আর কথা নয়। এসো আমার সঙ্গে।'

'তোমার সঙ্গে কোথায় যাব?'

'তোমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়ে আর পারি না। আমি যেখানে নিয়ে যাব, সেখানেই যাবে। এসো।'

নিজের ইচ্ছাশক্তি আমাব মধ্যে আর বোধ হয় অবশিষ্ট ছিল না। ঝুলনের ইচ্ছায় নিজেকে সঁপে দিয়ে বলেছিলাম, 'বেশ, চল।'

যেই বলেছিলাম 'চল' অমনি ফিরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করেছিল ঝুলন। আর আমি স্খলিত ক্লান্ত ভঙ্গিতে এলোমেলো পা ফেলে ফেলে তাকে অনুসরণ করেছিলাম। সজ্ঞানে যেন হাঁটছিলাম না, অশরীরী অলৌকিক কিছু একটা ঠেলে ঠেলে আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল।

একসময় সেই শহরমুখী পীচের রাস্তাটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। খানিক পরেই বাস এসেছিল। আমাকে নিয়ে উঠে পড়েছিল ঝুলন।

আমরা ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাস চলতে শুরু করেছিল। আর একটু পরেই শাহী দুর্গের মত সদর জেলের লাল বাড়িটা তার অন্তহীন গ্লানি আর অন্ধকার বুকে চেপে পেছনে বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

মনে আছে সেই বাসটা আমাদের শহরে পৌঁছে দিয়েছিল। সেখানে একটা রাত কাটিয়ে পরের দিন দুপুরে আমরা ট্রেনে করে কলকাতায় পৌঁছেছিলাম।

ঝুলন আমাকে উত্তর কলকাতায় একখানা একতলা ছোট্ট বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। মাত্র খানতিনেক ঘর সেখানে। দুটি ঘর বড়, অন্যটি ছোট। ছোটটি রান্নাঘর। বড় দুটির একটি বসবার ঘর, একখানি গোল টেবিলকে ঘিরে খানকয়েক চেয়ার সেখানে সাজানো। দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের চারখানা ছবি। দক্ষিণ প্রান্তের শেষ ঘরখানা শোবার ঘর, আসবাবের বিন্দুমাত্র বাহুল্য নেই। দেওয়াল ঘেঁষে একটা বড তক্তাপোশ, তার ওপর নরম নিভাঁজ শুভ্র বিছানা। শিয়রের দিকে একটি টেবিলে আয়না, চিরুনি, সিঁদুর কৌটো ইত্যাদি আর আছে আমার প্রথম যৌবনের একটি ফোটো। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর আমার ঐ ফোটোটা তুলেছিলেন হীরুর বাবা।

এককোণে উঁচু একটা টীপয়ের ওপর মাটির ফুলদানিতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। দিনকয়েক আগে খুব সম্ভব ফুলগুলি রেখে যাওয়া হয়েছিল। শুভ্রতা বা সজীবতা তখন আর সেগুলিতে ছিল না। তবু মলিন পাপড়িগুলি জড়িয়ে নির্জীব বাসি একটু সৌরভ ছিল। টীপয়টার পাশে একটা কাচের আলমারি। রবীন্দ্র রচনাবলী, শেকস্‌পীয়র আর

টলস্টয়ের গ্রন্থাবলীতে সেটা ঠাসা।

দেখতে দেখতে মনে হয়েছিল, এখানে আসার অধিকার আমার নেই। এই শুচিতায়-ঘেরা শুভ্র পরিবেশে আমার শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসছিল।

শিথিল গলায় বলেছিলাম, 'এখানে—'

আমার কথায় অনুচ্চারিত একটা প্রশ্ন ছিল। ঝুলন তা বুঝতে পেরেছিল। সে বলেছিল, 'এখানে কেন নিয়ে এলাম, তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'ব্যস্ত কি, দু-দিন বিশ্রাম কর। আস্তে আস্তে জানতে পারবে।'

দু-দিন ধৈর্য ধরে থাকতে পারিনি। আমার অস্থিরতা দেখে সেদিন রাত্রেই সব কথা বলেছে ঝুলন। সে যা বলেছিল সংক্ষেপে এই রকম।

পুলিশ এসে যখন আমার সম্বন্ধে হত্যাপরাধের কথা বলেছিল, বরণপিঁড়িতে সে তখন অজ্ঞান হয়ে যায়। জ্ঞান হবার পর হীরু আর তার বাবা তাকে তাঁদের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে দাদা এবং বাবা তাঁকে জানিয়েছিলেন, এ বিয়ে অসিদ্ধ। এ বিয়ে তাঁরা মানবেন না। ঝুলন কিছু না বলে দু-হাতে মুখ ঢেকে সমানে কেঁদে গেছে। এ বিয়ে অসিদ্ধ বলে মানতে তার বুক ফেটে যাচ্ছিল।

যখন আমার কেস চলেছিল সে সময় ঝুলন আদালতে আসতে চাইত। হীরুরা আসতে দিত না, একটি ঘরে পুরে রাখা হয়েছিল তাকে। মা-বাবা ঝুলনকে দিনরাত বোঝাতেন, আমাকে যেন সে ভুলে যায়। একটা খুনীকে যদি তাঁদের জামাই বলে মানতে হয় পারিবারিক সম্মান, মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা—সব ধুলোয় মিশে যাবে। লোকে নাকি তাঁদের গায়ে থুতু দেবে। হীরু দিনরাত শাসাত অন্য জায়গায় তারা ঝুলনের বিয়ে দেবে। শুধু শাসাতই না, বিয়ে দেবার জন্য তোড়জোড়ও করছিল। প্রায়ই গোপনে নতুন নতুন পাত্রপক্ষ নিয়ে আসা হত। ব্যবস্থা হয়েছিল ঝুলনকে কারো যদি পছন্দ হয়ে যায় বিবিবাজার থেকে দূরে গিয়ে বিয়েটা চুকিয়ে ফেলা হবে। বিবিবাজারে নতুন করে বিয়ে হওয়া অসুবিধে ছিল। কেন না, আমার সঙ্গে ঝুলনের বিয়ের খবর ঐ শহরে সবাই জানত।

ঝুলন কিন্তু পাত্রপক্ষের সামনে বেরুত না। দরজায় খিল দিয়ে থাকত। মা, বাবা এবং হীরু দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রাগ করত, চিৎকার করত, অনুনয় করত। বলত, সে না গেলে পাত্রপক্ষের কাছে অপমানিত হতে হবে। তবু দরজা খুলত না ঝুলন।

আরেকটা ব্যাপার নিয়েও দাদা-বাবা-মা খুবই বকাবকি করতেন। বিয়ের সময় ঝুলনের সিঁথিতে আমি যে সিঁদুরের রেখা এঁকে দিয়ে এসেছিলাম সেটা তাঁরা

মুছে ফেলতে বলতেন। বলতেন, 'তুমি কুমারী মেয়ে, ঐ ভাবে সিঁদুর বয়ে বেড়ানো অন্যায়।' ঝুলন সিঁদুর মুছত না। এই নিয়ে অত্যাচার আর নিগ্রহের সীমা ছিল না।

কিছুতেই যখন কিছু হচ্ছিল না, সেই সময় বাবা-মা জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের কাছে থাকতে হলে তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী চলতে হবে। ঝুলনের অনেক অন্যায় ব্যবহার তাঁরা সহ্য করেছেন কিন্তু আর নয়, ধৈর্যের একটা সীমা আছে।

বাবা-মা-দাদার সঙ্গে যুদ্ধ করে করে শক্তি নিঃশেষিত হয়ে এসেছিল ঝুলনের। ওদিকে হীরুদের নিগ্রহও ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল। অবশেষে একদিন নিরুপায় ঝুলন কলকাতায় পালিয়ে এসেছিল। ম্যাট্রিকটা আগেই পাশ করা ছিল। এখানে মেয়েদের স্কুলে চাকরি নিয়ে প্রাইভেটে পড়াশোনা চালিয়ে গেছে। একে একে আই. এ. পাশ করেছে, বি. এ. পাশ করেছে। তারপর এম. এ. পাশ করে সেই স্কুলেরই হেড মিস্ট্রেস হয়েছে।

এতকাল স্কুলের হোস্টেলেই থাকত ঝুলন। আমি মুক্তি পাব খবর পেয়ে উত্তর কলকাতায় ঐ বাড়িটা ভাড়া করে মনের মত সাজিয়ে সে আমাকে জেলখানা থেকে আনতে গিয়েছিল।

সব শুনে আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, 'এ তুমি কী করেছ ঝুলন! আমার জন্যে জীবনটা এভাবে নষ্ট করে দিলে?'

'কে বললে নষ্ট করেছি? আমার বিশ্বাস এবার আমি পূর্ণ হয়ে উঠব।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'কার কথায় এ সব করতে গেলে তুমি?'

নিজের বুকে একটি আঙুল দেখিয়ে ঝুলন বলেছিল, 'এর ভেতরে যে থাকে তার কথায়।'

আমি উত্তর দিতে পারিনি।

ঝুলন আবার বলেছিল, 'একটা কথা ভেবে দেখেছ? আমি যদি এভাবে ঘর সাজিয়ে না রাখতাম আট বছর পর জেলখানা থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে?'

আমি নিশ্চুপ। শুধু দু হাতে মুখটা ঢেকে ফেলেছিলাম।

তারপর দেখতে দেখতে কয়েকটা মাস কেটে গিয়েছিল। একদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে বড় সাধ হয়েছিল, মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি, হীরু এবং তার বাবা-মায়ের কাছেও যাই। আমার দুষ্কৃতির জন্য শাস্তি তো কম পাইনি।

হয়ত এবার ওঁরা ক্ষমা করবেন।

ঝুলনকে না জানিয়েই বিবিবাজারে চলে এসেছিলাম। হীরুর সঙ্গে দেখা করতে সে বলেছিল, 'গেট আউট।'

হীরুর বাবা-মা বলেছিলেন, 'এখানে আর কোনদিন আসবে না।'

নিজের মায়ের সঙ্গে দেখা করতে শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, 'কে ?'

বলেছিলাম, 'আমাকে কি তুমি চিনতে পারছ না মা ? আমি বকু।'

'ও নামে কাউকে কোনদিন আমি চিনি না।' বলে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন মা।

বিবিবাজার থেকে ফিরে এসে ঝুলনকে আমার অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলাম শুনে সে বকেছিল, 'কেন, কেন গিয়েছিলে ওখানে ? আমাকে না জানিয়ে কোথাও যাবে না।'

আরেক দিন ঝুলনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে গিয়েছিলাম জেলা শহরে উদ্দেশ্য: বাবার দেওয়া সেই সোনার তাবিজটা উদ্ধাব করা। যে দোকানে বন্ধক দিয়েছিলাম সেখানে গিয়ে খোঁজ করতেই ওটা পাওয়া গিয়েছিল।

তাবিজটা নিয়ে নিশির ডাকের মত বিচিত্র এক আকর্ষণে নয়নতারার সেই বাড়িটায় চলে গিয়েছিলাম। নয়নতারারা ছিল না, এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক বাড়িট কিনে নিয়েছেন। তিনি নয়নতারার কোন সন্ধান দিতে পারেন নি।

ফিরে এসে বাবার স্মৃতিচিহ্ন সেই তাবিজটা ঝুলনকে দিয়েছিলাম। নয়নতারার কথা অবশ্য বলিনি, ওটুকু গোপন রেখেছিলাম। আট বছর জেলে কাটিয়ে আসার পরও ঝুলনের সঙ্গে প্রতারণার খেলা খেলতে বাধে নি। জগতে আমার মত শঠ দ্বিতীয়টি বোধ হয় ছিল না।

*   *   *

তারপর ঝুলনের আশ্রয়ে বছরের পর বছর কেটে গেছে। ইদানীং আমার মাথাটা সাদায় কালোয় দাবার ছক। ঝুলনের চুলের ফাঁকে ফাঁকে রুপোর তার দেখা দিতে শুরু করেছে। দুজনের দেহেই বয়েস তার নির্ভুল ছাপ মেরে দিয়েছে। অদৃশ্য মাকড়সা মুখময় জাল বুনে যাচ্ছে। আমরা প্রৌঢ়ত্বের দেউড়িতে এসে পড়েছি।

প্রাচীর-ঘেরা সদর জেলের পিঞ্জরে বসে একদা মনে হয়েছিল জীবন শূন্য হয়ে গেছে। কিন্তু বাইরে আসার পর সকল শূন্যতা অপার মমতায় ভরে দিয়েছে ঝুলন।

আমার দগ্ধ, তাপিত, ক্ষত-বিক্ষত জীবনে সঞ্জীবনীর মত সে নেমে এসেছে।

আমি শঠ, প্রতারক, প্রবঞ্চক। প্রেমকে আমি তার যোগ্য মর্যাদা দিতে পারিনি। ঝুলন কিন্তু পেরেছে। গ্লানি, অন্ধকার, অসম্মান—সব কিছু উত্তীর্ণ হয়ে আমার জন্য সে সুধার পাত্র পূর্ণ করে রেখেছে। সমস্ত জীবন দিয়ে প্রেমকে সে সম্রাটের সিংহাসনে বসিয়েছে।